হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

কর্ণসুবর্ণর কড়ি

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণসুবর্ণর কড়ি

boierpathshala.blogspot.com

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

কর্ণসুবর্ণর কড়ি

ছয়টি প্রাপ্তমনস্ক ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস

পত্রভারতী

boierpathshala.blogspot.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ রঞ্জন দত্ত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশ
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

KORNOSUBORNOR KORI
Collection of Historical Fiction
by Himadrikishore Dasgupta
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

ISBN 978-81-8374-604-5

boierpathshala.blogspot.com

অবিরাম কথা বলা
আমার দুই ভালোবাসার বন্ধু—
চন্দ্রাণী মুখার্জি
ও
ঈশানী সেনশর্মা গাঙ্গুলী-কে

boierpathshala.blogspot.com

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

অ্যাডভেন ৪

জীবন্ত উপবীত

রাক্ষুসে নেকড়ে

অপরাজেয়

প্রথম সূর্য শশাঙ্ক

বন্দর সুন্দরী

খাজুরাহ সুন্দরী

চন্দ্রভাগার চাঁদ

ফিরিঙ্গি ঠগি

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণসুবর্ণর কড়ি। ঐতিহাসিক পটভূমি বা ইতিহাসের তরঙ্গপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে রচিত কাহিনি সংকলন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময় ও ঘটনা ধরা আছে এই কাহিনিগুলিতে।

লক্ষ্মণ সেনের প্রাচীন বাংলা থেকে শুরু করে মোগল ভারত, মধ্যযুগের মধ্য ভারত থেকে বিস্তৃত প্রাচীন কাশ্মীর রাজ্য, এই কাহিনিমালার পটভূমি। কিছু সত্য, কিছু কল্পনা! ইতিহাস নির্ভর কাহিনিতে যা হয়ে থাকে। এই বইটিকে ইতিহাসের প্রেম কাহিনির সংকলনও বলা যেতে পারে। প্রেম কোনওকালে সময়ের বেড়াজাল মানেনি, ইতিহাসের গতিপথকেও বহু সময় নিয়ন্ত্রণ করেছে সে। আত্মত্যাগ, যৌনতা, ঘৃণা, প্রতিশোধ, নানা রূপে প্রেমের স্ফুরণ দেখা যায় ইতিহাসের পাতায়। কখনও তারা উজ্জ্বলতায় চিরভাস্বর, কখনও আবার প্রাচীন পুঁথির মতোই কালের অন্তরালে নিঃশব্দে সমাহিত।

তাই এই বইয়ের চরিত্ররা কখনও খুব চেনা, আবার কখনও একেবারেই অচেনা। গল্পগুলোর অনেক চরিত্রই এমন, ইতিহাসে যাদের কথা লেখা হয় না, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, অথচ তারাই ইতিহাসের প্রকৃত চালিকাশক্তি।

দীর্ঘদিন ধরেই ইচ্ছা ছিল প্রাপ্তমনস্ক পাঠকদের হাতে ইতিহাস আশ্রিত কাহিনি সংকলন তুলে দেবার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আমার প্রিয় ঐতিহাসিক কাহিনিগুলোকে একত্রিত করে তাই পাঠক-পাঠিকদের হাতে তুলে দিলাম এই কর্ণসুবর্ণর কড়ি।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

১লা ডিসেম্বর ২০১৯

boierpathshala.blogspot.com

সূচিপত্র

বীর্যবান

রম্ভা

প্রস্তর ঘাতক

বিম্ববতী

মালিনী মঞ্জরী

কর্ণসুবর্ণর কড়ি

boierpathshala.blogspot.com

বীর্যবান

boierpathshala.blogspot.com

সোনার থালায় গরম ভাত আর পঞ্চব্যঞ্জন-মিষ্টান্ন সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে বসেছিলেন বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন। ভাত মেখে সবে তিনি মুখে তুলতে যাবেন, ঠিক সেই সময় মহামন্ত্রী, সেনাপতিসহ কয়েকজন ব্রাহ্মণ হুড়মুড় করে প্রবেশ করলেন ভোজনকক্ষে। মহামন্ত্রী বঙ্গেশ্বরকে বললেন, 'চলুন, মহারাজ চলুন। মিনারের মাথার প্রহরীরা ওদের দেখতে পেয়েছে। ওরা দ্রুত প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে! ঘোড়সওয়ার তুর্কিবাহিনী, বক্তিয়ারের যবনবাহিনী...।'

ব্রাহ্মণ আর গুপ্তচরের দল আগেই তুর্কি হানার খবরটা বঙ্গেশ্বরকে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কথাটা বিশ্বাস হয়নি মহারাজের। কোথায় সেই পাহাড়-মরুভূমির দেশ তুর্কিস্তান। আর কোথায় এই আম-কাঁঠালের ছায়া ঘেরা বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ। অতদূর থেকে এখানে আসা সম্ভব নাকি?'

মহামন্ত্রীর কথা শুনে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন বললেন, 'ঠিক বলছ? কতজন লোক তারা?'

মহামন্ত্রী বললেন, 'সংখ্যায় তারা সতেরো জন অশ্বারোহী। নগরীর উপকণ্ঠে গতকাল রাতে তারা অশ্বব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে রাত কাটিয়েছিল।'

কথাটা শুনে লক্ষ্মণ সেন বললেন, 'মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহীর ভয়ে আমাকে প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে? মাত্র সতেরো জন তুর্কি বঙ্গ জয় করবে? ওই সতেরো জন তুর্কিকে পরাস্ত করার মতো সেনা কি নেই আমার?'

সেনাপতি বললেন, 'ওই সতেরো জন তুর্কিকে আমরা পরাস্ত করতে পারি ঠিকই, কিন্তু ওটা কেবল তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী। অমনি বহু ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছুটে আসছে চারদিক থেকে। একের পর এক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে তারা আছড়ে পড়বে রাজধানীতে, এই প্রাসাদে। তাদের প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা আমার নেই।'

কথাটা শুনে ভাতের গ্রাম ধরা মহারাজার স্বর্ণাঙ্গুরীয় শোভিত শীর্ণ আঙুলগুলো ধীরে ধীরে তার মুখ থেকে নেমে এল। ফ্যাল ফ্যাল করে মহামন্ত্রী আর সেনাপতির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

মহামন্ত্রী তাগাদা দিলেন, 'চলুন মহারাজ চলুন!'

বাংলার রাজা অস্পষ্ট ভাবে বললেন, 'সত্যিই যেতে হবে? কিন্তু আমার রানিরা, নতুন যাদের রানি করার কথা তারা সবাই সঙ্গে যাবে তো?'

সেনাপতি বললেন, 'অত লোক নৌকায় ধরবে না। তাদের সঙ্গে নেবার আয়োজন করার মতো সময়ও হাতে নেই। ওই তুর্কি অশ্বগুলো শয়তানের চেয়ে দ্রুতগামী।'

বাংলার রাজা হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় খোলা গবাক্ষ বেয়ে বাইরে থেকে নজর-মিনারে দাঁড়ানো সৈনিকের চিৎকার ভেসে এল, 'তুর্কিরা এসে গেছে! এসে গেছে! পরিখা ডিঙোচ্ছে ওরা!'

আর দেরি করা যাবে না। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে প্রায় পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে মহামন্ত্রী, সেনাপতি আরও কয়েকজন প্রাসাদ ছেড়ে সুড়ঙ্গ পথে এগোলেন গঙ্গাবক্ষের দিকে। পড়ে রইল তার সাধের রাজধানী, অগুনতি পত্নী-উপপত্নী।

কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক ছিলেন পিতা বল্লাল সেন। পিতৃধর্ম শিরোধার্য করে 'আপনি আচরি ধর্ম' অন্যকে শেখাতে ব্রতী হয়েছিলেন লক্ষ্মণ সেনও। নইলে এই সত্তর বছর

boierpathshala.blogspot.com

বয়সে আবার তার দার পরিগ্রহণের বাসনা হয়? যে কারণে নগরীতে এক উদ্যান শোভিত প্রমোদ প্রাসাদে ইরাবতীও রয়ে গেল।

প্রথম যখন ইরাবতীর কানে খবরটা পৌঁছেছিল তখন ইরাবতী তা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে এবার তার মুক্তি আসন্ন। সে মিলিত হবে চিত্রসেনের সঙ্গে। চিত্রসেন অবশ্য তাকে কথা দিয়েছিল যে মহারাজের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হবার পূর্বেই তাকে মুক্ত করে দূরদেশে চলে যাবে। তাকে আর সেই অপহরণের দায় মাথায় নিতে হবে না।

কিন্তু ইরাবতীর জানা ছিল না যে সিংহাসন বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজার তোষাখানার ধন-সম্পদ-রত্নরাজির মতো নারী রত্নেরও হাতবদল হয় নতুন শাসকের হাতে। ইরাবতী এখন তুর্কিদের সম্পত্তি।

লক্ষ্মণ সেনের এই উদ্যানপ্রাসাদে রক্ষীর প্রহরা থাকলেও সে প্রহরীরা ছিল চিত্রসেনের অনুগত। চিত্রসেনকে বেগ পেতে হত না তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। কিন্তু এখন তুর্কিদের প্রহরা বসেছে এই উদ্যানবাটিতে। তাদের চোখ এড়িয়ে একটা মাছিরও অন্তঃপুরে প্রবেশ করার ক্ষমতা নেই। কেউ কেউ বলছে যে বক্তিয়ার নাকি ইরাবতীদের মতো নারীদের নিয়ে যাবে সুদূর তুর্কি মুলুকে।

খবরটা কি জানে চিত্রসেন? ইরাবতীর জানা নেই সে কথা।

মাসাধিক কাল আগে তুর্কিরা যখন রাজধানীর দখল নিল তারপর থেকে এই উদ্যানবাটির দ্বিতল অলিন্দ থেকে নীচে তাকিয়ে আর কোনওদিন সে দেখতে পায়নি সৈন্যাধক্ষ চিত্রসেনকে। বীর্যবান চিত্রসেনের অধীনস্থ রক্ষীরাই প্রাসাদের রক্ষী ছিল। তাদের কেউ আজ নেই একজন ছাড়া। সেই সৈনিক শুধু প্রাসাদের বাইরে প্রহরার কাজে নিযুক্ত।

ইরাবতী এক-একবার ভাবে সে অলিন্দে দাঁড়িয়ে ডাকবে সেই যুবক সৈনিককে। হয়তো সে সৈনিক ইরাবতীকে খোঁজ দিতে পারে চিত্রসেনের! ইরাবতী প্রাসাদের ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়ালেই সে তাকিয়ে থাকে ইরাবতীর দিকে। এক-একসময় ইরাবতীর মনে হয় ওই যুবক সৈনিক বন্দিনীর দিকে ওভাবে চেয়ে থাকে কেন? সে কি ইরাবতীর প্রেমে পড়েছে?—এ প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই ইরাবতীর।

আর ওই যুবক তো সামান্য সৈনিক মাত্র। স্বয়ং বাংলার অধিপতি যেখানে রাজধানী ত্যাগ করেছেন তুর্কিদের ভয়ে, চিত্রসেনের মতো বীর্যবানেরও কোনও খোঁজ নেই, সেখানে কি ওই সামান্য সৈনিক মুক্ত করতে পারবে তাকে তার এই বন্দীদশা থেকে?

সেদিন দ্বিপ্রহরে ঝুলবারান্দা সংলগ্ন দ্বিতল কক্ষে বসে ইরাবতী ভাবছিল তার ভবিষ্যতের কথা। কী আছে তার কপালে? তাকে কি শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হবে তুর্কিস্থানের কোনও হারেমে? এ জীবনে কি তার মুক্তি নেই? তার কি আর কোনওদিন দেখা হবে না চিত্রসেনের সঙ্গে? সে কি মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারবে না তার প্রেমিকাকে? তুর্কি হারেমের বন্দিনী হবার চেয়ে তো তার ভালো ছিল বৃদ্ধ রাজার মহিষী হওয়া। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখ বেয়ে জল নামতে শুরু করল।

নিভৃত কক্ষে বসে কাঁদছিল ইরাবতী। তার কক্ষে একটা ছোট গবাক্ষ আছে। তা দিয়ে নীচের বাগিচার কিয়দংশ দেখা যায়। কাঁদতে কাঁদতে সেদিকে চোখ পড়তেই ইরাবতী দেখতে পেল সেই সৈনিক বাগিচায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে কক্ষ সংলগ্ন বারান্দার দিকে। হয়তো সে তাকিয়ে আছে ইরাবতীকে দর্শনের প্রত্যাশাতেই।

boierpathshala.blogspot.com

তাকে দেখেই ইরাবতীর হঠাৎ মনে হল, 'আচ্ছা যদি ওই রক্ষীর সত্যি খোঁজ জানা থাকে চিত্রসেনের? যদি চিত্রসেনকে তার মাধ্যমে কোনও পত্র পাঠানো যায়?

বাঁচার একটা শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। একটা ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। হ্যাঁ, সে একটা পত্র পাঠাবার চেষ্টা করবে চিত্রসেনকে ওই রক্ষীর মাধ্যমে। কিন্তু কীভাবে সে পত্র লিখবে? তার কাছে তো কাগজকলম নেই।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পত্র লেখার একটা উপায় বার করে নিল ইরাবতী। তার কাজল আছে। তার সাদা কাঁচুলির একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে কাজল দিয়ে পত্র লিখতে বসল ইরাবতী।

২

অন্য দিনের মতো এদিনও দ্বিপ্রহরে উদ্যান প্রাসাদে প্রহরার কাজে নিযুক্ত হল সৈনিক অভিমন্যু। নির্জন দুপুর। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বাগানে যে ময়ূরকুল ছিল তাদের মেরে খেয়েছে তুর্কি সেনারা। শ্বেত পাথরের ফোয়ারাগুলোও এখন শুষ্ক। আশেপাশের গাছগুলোতেও পরিচর্যার অভাবে আর ফুল ফোটে না। রুক্ষদেশের মানুষ ওই তুর্কিগুলো, প্রকৃতিগতভাবে তারাও রুক্ষ। চারপাশের রুক্ষতা-বিষণ্ণতার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ আর ওই ঝুলবারান্দাটা।

ওই অলিন্দটার জন্যই এ প্রাসাদ ছেড়ে যেতে পারেনি অভিমন্যু। অভিমন্যু প্রথমে ও-প্রাসাদে প্রহরার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল রক্ষীপতি চিত্রসেনের যে ক্ষুদ্র সেনাদল ছিল তার সদস্য হিসাবে। তারপর রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন নগরী ছেড়ে পালালেন তখন তাঁর সেনাদল ভেঙে গেল। কেউ লক্ষ্মণ সেনের পথ অনুসরণ করল, কেউ বা আবার আত্মগোপন করল গঙ্গার অপর প্রান্তে। চিত্রসেনও আত্মগোপন করে আছেন সেখানে। কিন্তু অভিমন্যু ত্যাগ করতে পারেনি নবদ্বীপ। পারেনি ওই অলিন্দের জন্যই। প্রতিদিন যে সে সূর্যাস্তের সময় ওই অলিন্দে এসে দাঁড়ায়।

অভিমন্যুর কোনওদিন তার সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি। কিন্তু তাকে দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছে সৈনিক অভিমন্যু। সে জন্যই তো নবদ্বীপ ত্যাগ করা হল না তার।

তুর্কিরা বাংলা রাজধানী দখল ক'রার পর কদিন ভয়ংকর ছিল নবদ্বীপের পরিস্থিতি। লুঠপাট চলল, আগুন লাগানো হল কিছু জায়গায়, মারাও পড়ল কিছু লোকজন। তারপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হল। সামান্য কিছু লোকজন দিয়ে তো আর এতবড় নগরী শাসন করা যাবে না। তাই তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ারের লোকেরা নগরীতে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানাল যে স্থানীয় কিছু লোকজনকে নেওয়া হবে তাদের কাজে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই অভিমন্যু নাম লেখায় তুর্কি রক্ষীদলে। আবার সে নিযুক্ত হল এই উদ্যান প্রাসাদে প্রহরীর কাজে।

তবে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি তার নেই। রাজাপ্রাসাদসহ লক্ষ্মণ সেনের কোনও প্রাসাদেই প্রবেশ করার অনুমতি নেই স্থানীয় লোকদের। তাদের কাজে নিলেও তুর্কিরা অবিশ্বাস করে স্থানীয় বাঙালিদের। প্রাসাদের দ্বার আগলে তলোয়ার হাতে দণ্ডায়মান থাকে তুর্কিরাই।

boierpathshala.blogspot.com

কোনও এক প্রাসাদে তাদের অজান্তে নাকি প্রবেশ করেছিল এক বাঙালি। ধরা পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। এই শাস্তিবিধানের নির্দেশই দিয়ে রেখেছেন সেনাপতি বক্তিয়ার।

বাগিচায় দাঁড়িয়ে অন্যদিনের মতো সেই বারান্দার দিকে তাকিয়ে ছিল অভিমন্যু। কখন ইরাবতী বাইরে বেরোবে তার প্রতীক্ষায়। এক সময় ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। তারপর সূর্যাস্তের ঠিক প্রাকমুহূর্তে সেই ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াল ইরাবতী। দিনের শেষ আলো এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে ইরাবতীর মুখ। অপরূপ সৌন্দর্য যেন ঝরে পড়ছে তার অঙ্গ বেয়ে। এক এক সময় অভিমন্যুর মনে হয় ইরাবতী কি সত্যি কোনও মানবী? নাকি অপ্সরা। কোনও নারীর অঙ্গে এত রূপ হতে পারে?

শুধু একটা জিনিসেই ধরা পড়ে ইরাবতী মানবী। সেটা তার মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতা, বিপন্নতা। সেটা ধরা পড়ে অভিমন্যুর চোখেও। তার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। অভিমন্যু ভাবে, সে যদি পারত এই নারীকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে...

ইরাবতী ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াতেই নীচে কিছুটা তফাত থেকে অন্যদিনের মতো তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল অভিমন্যু। এই সময়টার জন্যই তো সারা দিনরাত অপেক্ষা করে থাকে সে। সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পরই সে ছটফট করে দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। রক্ষীবদল হয় সে সময়। যতক্ষণ না অন্ধকার নামে ততক্ষণ এই বাগিচায় প্রহরার কাজে নিযুক্ত থাকে অভিমন্যু।

হঠাৎ অভিমন্যুর যেন মনে হল তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোলে হাসি ফুটে উঠেছে সেই নারীর! সত্যি নাকি? হ্যাঁ, এই প্রথম তার দিকে তাকিয়ে হাসছে ইরাবতী! রক্ত ছলকে উঠল অভিমন্যুর বুকে। তাহলে কি ইরাবতী এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে কেন তার দিকে তাকিয়ে থাকে অভিমন্যু? আর এরপর তাকে আরও বিস্মিত করে, ওপর থেকে চারপাশে কোনও তুর্কি আছে কিনা দেখে নিয়ে অভিমন্যুকে ইশারায় কাছে ডাকল সেই সুন্দরী। চারপাশে অন্য কেউ আছে নাকি দেখে নিয়ে অভিমন্যুও এগোলে তার দিকে।

সেই ঝুলবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল অভিমন্যু। মুখ তুলে সে তাকাল ইরাবতীর দিকে। ইরাবতীও তাকিয়ে তার দিকে। তার ঠোঁটের কোণে হাসি থাকলেও বিদায়ী সূর্যালোকে একটা বিষণ্ণতাও ফুটে উঠেছে তার মুখে। সেদিকে তাকিয়ে রইল অভিমন্যু।

হঠাৎ তার বাহুতে জলের ফোঁটা এসে পড়ল। বৃষ্টি নেই, তবে? কাঁদছে ইরাবতী। অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে করুণ এক আর্তি ফুটে উঠেছে তার চোখে। আর এর পরই হাতের মুঠি থেকে সে কী যেন একটা ছুড়ে দিল নীচে দাঁড়ানো অভিমন্যুকে লক্ষ্য করে। ভাঁজ করা রেশম বস্ত্রের একটা টুকরো! অভিমন্যু মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল সেটা।

আরও কিছু বলার ছিল ইরাবতীর অভিমন্যুর উদ্দেশে, কিন্তু ওপর থেকে সে খেয়াল করল একজন তুর্কি সেদিকে আসছে। অভিমন্যুও দেখতে পেল তাকে। ইরাবতী পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝুলবারান্দা থেকে। রেশম খণ্ডটা তাড়াতাড়ি তার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল অভিমন্যু। সেই তুর্কি রক্ষীও পৌঁছে গেল অভিমনুর কাছে। সন্দিগ্ধ ভাবে সে একবার ঝুল বারান্দায় দিকে তাকিয়ে নিয়ে অভিমন্যুকে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কী করছ?'

অভিমন্যু জবাব দিল, 'কিছু না। টহল দিতে দিতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।'

তুর্কি বলল, 'তবে তোমাদের আর এখানে বেশিদিন কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

অভিমন্যু বলল, 'কেন?'

তুর্কি বলল, 'কিছুদিন পর থেকেই এই জেনেনা মহলগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হবে খোজা ও বৃহন্নলাদের। তোমাদের তো আর এ মহলের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যায় না। আরও কিছু জেনেনাকে এনে রাখা হবে এখানে। খোজা বা বৃহন্নলাদের এখানে আনলে তারা মহলের ভিতরে যেতে পারবে। মাস তিনেকের মধ্যেই সেনাপতি বক্তিয়ার রওনা হবেন মুলুকের দিকে। তার কাফেলার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে জেনেনাদের। ততদিনে খোজাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে ওরা। খোজারা তো বীর্যহীন। তাই তাদের দিক থেকে অন্য কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই!'—কথাগুলো বলে অন্যদিকে চলে গেল সেই তুর্কি প্রহরী।

অভিমন্যুও সরে গেল সে জায়গা থেকে। তারপর ঝোপের আড়ালে গিয়ে পোশাকের নীচ থেকে সেই রেশম খণ্ডটা বার করে কাঁপা কাঁপা হাতে তার ভাঁজ খুলল। কাজলে লেখা কয়েকটা শব্দের একটা চিঠি। তাতে শুধু লেখা; 'চিত্রসেন প্রিয়তম মুক্ত করো আমাকে।'

চিঠিটা পড়ে বিস্মিত হয়ে গেল অভিমন্যু। তার মানে সৈন্যধ্যক্ষ চিত্রসেনের প্রেয়সী ওই নারী! এই চিঠি চিত্রসেনকে পাঠাবার জন্যই তাকে দেওয়া হল! অন্যের প্রেয়সী ইরাবতী!

কয়েক মুহূর্তের জন্য আশাভঙ্গের বিষণ্ণতা ঘিরে ধরল অভিমন্যুকে। কিন্তু তারপরই সে হতভাগ্য নারীর সজল চোখের আকুতি ভেসে উঠল অভিমন্যুর চোখে। কিছুক্ষণ ভাবল অভিমন্যু। তারপর সিদ্ধান্ত নিল যে চিঠিটা পৌঁছে দেবে চিত্রসেনের কাছে।

গুটিকয় সৈনিক নিয়ে নদীর ওপাড়ে জঙ্গলের ভিতর যেখানে চিত্রসেন আত্মগোপন করে আছেন, সে জায়গার খোঁজ জানা আছে সৈনিক অভিমন্যুর। হতে পারে ইরাবতী অন্যের প্রেয়সী। কিন্তু সে তো ভালোবেসে ফেলেছে ইরাবতীকে। তার ভালো চাওয়াটাই তো তার একমাত্র কাম্য। হয়তো বা প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে তাকে কোনও ভাবে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারবে বীর্যবান সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন।

৩

সূর্য ডোবার কিছু সময় পর নতুন রক্ষী এল প্রহরার কাজে। তাকে দায়িত্ব সঁপে দিয়ে অভিমন্যু বেরিয়ে পড়ল সেই প্রাসাদকানন থেকে। এক সময় সন্ধ্যা নামলেই তুলসী মঞ্চ থেকে শাঁখের শব্দ ভেসে আসত নগরীর নানা মহল্লা থেকে, মন্দিরগুলো থেকে আসত সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি বা কীর্তনের শব্দ। লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের তোরণের মাথা থেকে সারা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ত ইমনের সুরমূর্ছনা। ধনীর অট্টালিকা থেকে দরিদ্র মানুষের কুটিরে জ্বলে উঠত দীপশিখা। আলোক মালায় শোভিত হত সারা নগরী। ফুল সাজে সজ্জিত নটী আর নাগরিকরা গঙ্গা থেকে ভেসে আসা মনোরম বাতাসে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য কলহাস্যে মেতে উঠত নগরীর প্রধান সড়ক। কিন্তু তুর্কিরা নবদ্বীপের দখল নেবার পর সে সব কিছু থেমে গেছে। অন্ধকার নামলেই আতঙ্কিত নগরবাসী ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে। কোথাও কোনও বাতি জ্বলে না। নিঝুম হয়ে যায় নগরী। শুধু মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে শোনা যায় তুর্কিদের ঘোড়ার খুরের শব্দ অথবা তাদের কর্কশ চিৎকার।

সেই উদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে অন্ধকার পথে অভিমন্যু এগোল নগর ত্যাগ করে নদীর দিকে। এক সময় গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে গেল সে। জায়গাটা নির্জন। তুর্কিরা সাধারণত বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে নদীর কাছে আসে না। মূল

boierpathshala.blogspot.com

নগরীতেই তারা থাকে। চাঁদের আলোতে ঘাটে বাঁধা আছে জেলে ডিঙিগুলো। একটা ছিপ নৌকা নিয়ে অভিমন্যু ভেসে পড়ল উজানের দিকে।

বেশ অনেকটা সময় পর সে তার নৌকা ভেড়াল নদীর অপর পারে এক জায়গাতে। জঙ্গুলে জায়গা। হিংস্র শ্বাপদ হানার ভয় আছে। বর্শাটা ভালো করে বাগিয়ে ধরে জঙ্গলে প্রবেশ করল সে। কিছুটা এগোবার পরই তার চারপাশে এক সঙ্গে দপ করে বেশ ক'টা মশাল জ্বলে উঠল। তাকে ঘিরে ধরল বেশ কয়েকজন লোক। তাদের হাতের উদ্যত অস্ত্র তাক করা আছে অভিমন্যুর দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পরস্পরকে চিনতে পারল তারা।

লোকগুলো লক্ষ্মণ সেনের প্রাক্তন বাহিনীর লোক। চিত্রসেনের সেই ক্ষুদ্র সেনাদল। তবে ঠিক জায়গাতেই উপস্থিত হয়েছে অভিমন্যু। সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনও এরপর একটা গাছের আড়াল থেকে এসে দাঁড়ালেন অভিমন্যুর সামনে। তারপর বিস্মিতভাবে বললেন, 'তুমি এখানে? তুমি তো তুর্কি বাহিনীতে যোগ দিয়েছ?'

অভিমন্যু আসল কারণটা বলল, 'তুর্কিরা যখন নগরী আক্রমণ করল তখন আমি সেই উদ্যানবাটিতেই ছিলাম। অতর্কিতে হানা দিল তুর্কিরা। আমি পালাতে পরিনি। ওদের সঙ্গে যোগ না দিলে আমি প্রাণে বাঁচতাম না।'

চিত্রসেন হয়তো অন্য কিছু আরও বলতে যাচ্ছিলেন অভিমন্যুকে। কিন্তু 'উদ্যানবাটি' শব্দটা শুনেই প্রথমে থেমে গেলেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'সেই উদ্যানবাটি এখনও আছে? নাকি তা জ্বালিয়ে দিয়েছে যবন সেনাপতি? সেখানে যারা ছিল তারা কি এখনও জীবিত?'

অভিমন্যু উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আছে। আমিও সেখানেই প্রহরার কাজে নিযুক্ত আছি।'

উত্তরটা শুনে সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বললেন, 'ইরাবতী? সে কি সেখানেই আছে?'

অভিমন্যু মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সে সেখানেই বন্দিনী এখনও। তবে সম্ভবত আর বেশি দিনের জন্য নয়। আর কিছুদিনের মধ্যে তুর্কি সেনাপতি ফেরার পথ ধরবে। নারীদের সে সঙ্গে নিয়ে যাবে তুর্কি মুলুকে। সেই নারী আপনাকে একটা পত্র পাঠিয়েছেন। সেটা দিতেই আমি এসেছি।' এই বলে অভিমন্যু সেই রেশম খণ্ডটা এগিয়ে দিলেন সেনাধ্যক্ষের দিকে।

চিত্রসেন চিঠিটা পড়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তার সঙ্গে কথা হয় তোমার?'

অভিমন্যু বলল, 'আমার সে সুযোগ নেই। প্রাসাদের ভিতর প্রবেশাধিকার নেই আমার। সে ঝুলবারান্দা থেকে সবার অলক্ষে এই পত্র ছুড়ে দিয়েছে আমাকে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে আমি নীচ থেকে দেখতে পাই তাকে। কিন্তু হয়তো আর তাও পাব না। খোজা আর বৃহন্নলারা তুর্কিদের সঙ্গে সেখানে শীঘ্রই প্রহরার কাজে নিযুক্ত হতে চলেছে। আপনি সাহসী বীর্যবান পুরুষ। আপনি যদি গিয়ে সেই নারীকে মুক্ত করতে পারেন...

অভিমন্যুর কথা শুনে আবারও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন চিত্রসেন। তারপর হতাশ ভাবে বললেন, 'সে আমার এই ক্ষুদ্র বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বয়ং বাংলার রাজাই যখন তুর্কিদের প্রতিহত করতে পারলেন না। তখন আমি পারব কীভাবে? নবদ্বীপে প্রবেশ করার মানেই তো তুর্কিদের মুখোমুখি হওয়া। তাদের কবল থেকে ইরাবতীকে মুক্ত করার ক্ষমতা এখন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনেরও নেই।

boierpathshala.blogspot.com

‘তবে?’ জানতে চাইল অভিমন্যু।

চিত্রসেন বললেন, ‘তুমি এখনও নগরীতে আছ। তুমি যদি কোনও ভাবে ইরাবতীকে মুক্ত করে আনতে পারো তবে আমি গ্রহণ করব তাকে। এ কাজের জন্য তোমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রাও পুরস্কার দেব। আমি আগামী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত এখানে আছি। সে এলে আমি তাকে নিয়ে বাংলা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাব। তাকে আমি বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের হাতে তুলে দেব না।’

অভিমন্যু বেশ হতাশ হল চিত্রসেনের কথা শুনে। চিত্রসেন তবে তাকে মুক্ত করতে পারবেন না। সে সামান্য সৈনিক, সে কেমন করে মুক্ত করবে সেই নারীকে? তবু সে চিত্রসেনকে বলল, ‘ঠিক আছে যদি আমি তাকে মুক্ত করতে পারি, আর সে যদি আসতে রাজি হয় তবে আমি তাকে পৌঁছে দেব এখানে।’ একথা বলে অভিমন্যু জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরোবার পথ ধরল।

অভিমন্যু জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে যখন নদীর পাড়ে এল ঠিক তখনই আর একটা নৌকা এসে ভিড়েছে সেখানে। জনা চারেক লোক নৌকা থেকে নেমে এগোচ্ছে জঙ্গলে ঢোকার জন্য। অভিমন্যু মুখোমুখি হয়ে গেল তাদের।

দুজন টিকিধারী ব্রাহ্মণ আর তাদের সঙ্গে দুজন সৈনিক। এক ব্রাহ্মণকে চিনতে পারল অভিমন্যু। সে ব্রাহ্মণের নাম পুণ্ডরীক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণরাই তো নবদ্বীপ শাসন করত রাজা লক্ষ্মণ সেনের হয়ে।

পুণ্ডরীক নামের এই ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন। রাজার সঙ্গে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তুর্কিদের এড়িয়ে নগরী ত্যাগ করতে সক্ষম হন এই ব্রাহ্মণ তাদের মধ্যে অন্যতম। মাঝে মাঝে এই ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ সেনের সেই উদ্যান প্রাসাদে যেতেন সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য। সেই সূত্রে বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হয়েছে অভিমন্যুর। কে যেন একবার অভিমন্যুকে বলেছিল যে ইরাবতীর সঙ্গে রাজার বিবাহে এই ব্রাহ্মণেরই নাকি পৌরহিত্য করার কথা।

এরা চারজন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করতে এসেছে চিত্রসেনের সঙ্গে। চাঁদের আলোতে অভিমন্যু আর ব্রাহ্মণ চিনতে পারল পরস্পরকে। ব্রাহ্মণ সম্ভবত অনুমান করলেন যে, এই সৈনিকও চিত্রসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোথাও যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন নিশ্চয়ই এখানে আছেন? সৈনিক এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

অভিমন্যু তাঁকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, ‘আজ্ঞে, তিনি অরণ্যেই আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নগরীতে ফিরছি। আমি সেই উদ্যানবাটিতে আগের মতোই প্রহরীর কাজ করি তুর্কিদের অধীনে। তুর্কিরা যখন হানা দিল তখন আমি পালাতে পারিনি। প্রাণ বাঁচাতে কাজ নিয়েছি তাদের অধীনেই।’

সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনের মতোই সেই উদ্যানবাটির কথা শুনে বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, ‘ইরাবতী নাম্নী সেই কন্যা কি এখনও সেখানে আছে? যবনরা কলঙ্ক লেপন করেনি তো তার শরীরে?’

অভিমন্যু জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, সে সেখানেই আছে? তুর্কিরা এখনও তাকে স্পর্শ করেনি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে তুর্কিদেশে। হয়তো আর কয়েক মাস পরই। মহারাজ কি মুক্ত করতে পারবেন তাকে?’

boierpathshala.blogspot.com

সে নারী সেই প্রাসাদেই আছেন আর যবনরা এখনও তার চরিত্র হনন করতে পারেনি শুনে উৎফুল্ল ভাব ফুটে উঠল ব্রাহ্মণ আর তার সঙ্গীদের মুখে। নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন তারা। ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক এরপর বললেন, 'তাকে উদ্ধার করার জন্যই তো সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আমরা। সে যদি তাকে মুক্ত করে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে সে জন্য। মহারাজের পক্ষে এখানে এসে ইরাবতীকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।'

সৈনিক অভিমন্যু বুঝতে পারল যে সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনের সঙ্গে ইরাবতীর গোপন সম্পর্কের কথা জানা নেই ব্রাহ্মণদের। চিত্রসেন ইরাবতীকে পেলে রাজার হাতে তুলে দেবে না। ইরাবতী নিজেও চায় চিত্রসেনকেই।

ব্রাহ্মণের কাছে অবশ্য ব্যাপারটা ভাঙল না অভিমন্যু। সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনের অক্ষমতা সম্বন্ধেও বলল না কিছু। সে শুধু জানতে চাইল, 'ওই কন্যাকে নিয়ে আপনারা কী করবেন?'

ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি হয়তো জানো সৈনিক যে, ওই কন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহের কথা ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তুর্কিরা এসে পড়ায় মহারাজকে শূণ্য হাতে নগরী ত্যাগ করতে হয়। বর্তমানে মহারাজ নিরাপদ স্থানেই আছেন। রাজধানী নবদ্বীপ ত্যাগ করতে হলেও তিনি এখনও এই বাংলাদেশের বিশাল ভূখণ্ডের রাজা। রাঢ় বাংলা-সমতট এখনও তার শাসনাধীন। তাঁর ফেলে যাওয়া ধনরত্ন-নগরীর শোক ভুলতে পারলেও কিছুতেই সেই নারীর শোক ভুলতে পারছেন না। ইরাবতীর জন্য আকুল তিনি। তাকে বিবাহ করতে চান মহারাজ লক্ষ্মণ সেন।'

রাজধানী গেছে যাক। কিন্তু যুবতী নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা যে এখনও কৌলীন্য ব্যবস্থার অনুসারী মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বৃদ্ধাবস্থাতেও যায়নি তা বুঝতে পারল অভিমন্যু। এরপর ব্রাহ্মণ বললেন, 'শোনো সৈনিক। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমরা সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনের সাক্ষাৎ প্রার্থী ঠিকই। কিন্তু তুমিও যদি সেই নারীকে কোনও ভাবে মুক্ত করে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারো তবে মহারাজ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। সৈনিকের সামান্য জীবন আর তোমাকে বহন করতে হবে না। আগামী পূর্ণিমা তিথিতে আমরা সূর্যাস্তের পর এখানে আবার আসব।' এই বলে সঙ্গীদের নিয়ে ব্রাহ্মণ এগোলেন অরণ্যে প্রবেশ করার জন্য।

নৌকায় উঠে অভিমন্যু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবল, 'তাহলে মহারাজও মুক্ত করতে পারবে না সেই হতভাগিনী নারীকে! ভবিষ্যতে কি লেখা আছে সেই নারীর ভাগ্যে?' ইরাবতীর প্রতি ভালোবাসায়, সমবেদনায় ভরে উঠল তার মন।

শেষ রাতে নগরীতে ফিরে তার ছোট্ট কুটিরে এসে শুয়ে পড়ল হতাশ অভিমন্যু। ঘুম নেমে এল তার চোখে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে অভিমন্যুর স্বপ্নে বারে বারে ভেসে উঠতে লাগল শেষবেলার আলোতে দেখা ইরাবতীর করুণ মুখচ্ছবি।

সে যেন বার বার অভিমন্যুকে বলতে লাগল, 'আমার প্রেমিক চিত্রসেন না পারুক, বিবাহ প্রত্যাশী রাজা লক্ষ্মণ সেন না পারুক তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পারো না সৈনিক? তুমিও তো আমাকে ভালোবাসো—আমি বুঝেছি। তুমি আমাকে রক্ষা করবে না তুর্কিদের থেকে?' ইরাবতীর কাতর আর্তনাদ বার বার যেন পাক খেতে লাগল অভিমন্যুর স্বপ্নে।

এক সময় সেই করুণ আর্তনাদ আর সহ্য করতে পারল না সৈনিক। সে চিৎকার করে উঠল, 'আমি তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব ইরাবতী। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তবুও

boierpathshala.blogspot.com

আমি চেষ্টা করব। তোমার কান্না, আর্তনাদ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

চিৎকার করে কথাগুলো বলার পরই ঘুম ভেঙে উঠে বসল অভিমন্যু। বাইরে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। তার কক্ষ সংলগ্ন রাজপথে লোক সমাগম শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ঘুম ভাঙার পরও স্বপ্নের মতোই অভিমন্যুকে আচ্ছন্ন করে থাকল ইরাবতীর সেই করুণ দৃষ্টি, তার কাতর অর্তনাদ।

বিড়বিড় করে অভিমন্যু বলল, 'আমি যদি তোমাকে সত্যিই ভালোবেসে থাকি তবে আমি তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করব। তুমি সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনকে ভালোবাসো তা জেনেও, অথবা অদূর ভবিষ্যতে কোনওদিন তুমি বৃদ্ধ রাজার মহিষী হবে তা জেনেও। আমি সামান্য সৈনিক মাত্র। তবু চেষ্টা করব। কিন্তু কী ভাবে? কী ভাবে?'

নিজের ছোট্ট কক্ষে বসে তাকে কী করে মুক্ত করা যায় তার উপায় খোঁজার চেষ্টা করছিল অভিমন্যু। হঠাৎ তার কানে এল ঢেঁড়া পেটাবার শব্দ। কী ঘোষণা করা হচ্ছে ঢেঁড়া পিটিয়ে? ঘোষণাটাও তার কানে এল।

তুর্কি সেনাপতি তার কাজে খোজা, বৃহন্নলা, ভৃত্য ইত্যাদি নিয়োগ করতে চান। তারই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে ঢেঁড়া পিটিয়ে। খোজা-বৃহন্নলাদের নিশ্চয়ই নিয়োগ করা হবে প্রমোদ প্রাসাদ প্রহরার কাজে। গতকাল তো সেই তুর্কি এ কথাই বলেছিল অভিমন্যুকে।

একথাটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ইরাবতীকে মুক্ত করার একটা উপায় যেন দেখা দিল সৈনিক অভিমন্যুর মনে। কিছু সময়ের মধ্যেই ঘর ছেড়ে রাজপথে নামল অভিমন্যু। সে রওনা হল নবদ্বীপ নগরীর প্রান্ত সীমায় যেখানে খোজা-বৃহন্নলারা বাস করে সে মহল্লায়।

৪

দিন কাটে। সেদিনের পর সেই সৈনিককে আর দেখতে পায়নি ইরাবতী। সেই সৈনিক কি তার প্রেমিকের কাছে পত্রটা পৌঁছে দিতে পেরেছিল? তা জানা নেই ইরাবতীর। ইতিমধ্যে আরও বেশ কিছু নারীকে আনা হয়েছে এই প্রাসাদে। কিছু নিম্ন শ্রেণির স্ত্রীলোককে নিয়োজিত করা হয়েছে বন্দিনীদের পরিচর্যার কাজে। আর তাদের প্রহরার কাজে নিযুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকজন খোজা ও বৃহন্নলা। আর তুর্কি প্রহরীরা তো অবশ্যই আছে।

খোজা অথবা বৃহন্নলাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাইরে যায় দাসীরা। বন্দিনীদের রূপচর্চার সামগ্রী জোগাড় করার জন্য। সেনাপতি বক্তিয়ার নাকি বলেছেন যে সুন্দরীদের রূপচর্চার যেন কোনও সমস্যা না হয়। তাদের তুর্কিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর যেন সেখানে লোকজন মোহিত হয় এই বাঙালি সুন্দরী নারীদের দেখে। তুর্কি হারেমগুলোর শোভাবর্ধন করবে এই নারীর দল।

যারা খোজাদের সঙ্গে প্রাসাদের বাইরে যায় তারা মাঝে মাঝে কিছু খবর নিয়ে প্রাসাদে ফেরে। তারা কেউ কোনও সংবাদ দিতে পারে না সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেনের বা সেই সৈনিকের। তবে তাদের মুখ থেকে ইরাবতী শুনেছে যে সেনাপতি বক্তিয়ার নাকি তার মুলুকে ফিরে যাবার তোড়জোড় শুরু করেছেন। তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন ইরাবতী সহ অন্য নারীদের।

সেদিনও সূর্য ডোবার প্রাকমুহূর্তে সেই অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছিল ইরাবতী। সে দেখার চেষ্টা করছিল সেই সৈনিককে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু তার দেখা আজও

boierpathshala.blogspot.com

পেল না সে। সূর্য ডুবে গেল এক সময়। আঁধার নেমে এল। বিষণ্ণ চিত্তে ইরাবতী ফিরে এল নিজের কক্ষে। অন্ধকার কক্ষে বসে সে ভাবতে লাগল তার ভাগ্যের পরিহাসের কথা।

মাতৃহীন ইরাবতী এক সামান্য কৃষকের সন্তান। রূপটাই হয়তো তার জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। কীভাবে যেন তার রূপের খবর পৌঁছেছিল বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের কানে। তিনি ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে ইরাবতীর পিতাকে অনুরোধ জানালেন ইরাবতীকে রাজধানীতে পাঠাবার জন্য। মহারাজ তাকে অন্যতম ভার্যা রূপে গ্রহণ করতে চান। রাজ অনুরোধ মানে তো রাজনির্দেশ! তাকে অমান্য করার ক্ষমতা সেই ক্ষুদ্র কৃষকের ছিল না। সে ইরাবতীকে পাঠিয়ে দিল রাজধানী নবদ্বীপে।

এই উদ্যান প্রাসাদে ঠাঁই হল ইরাবতীর। এখানেই তার সঙ্গে আলাপ ও প্রেম সৈন্যধ্যক্ষ চিত্রসেনের। সে তাকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাল। চিত্রসেন তাকে বলল যে বৃদ্ধ মহারাজের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হবার পূর্বেই সে পালাবে ইরাবতীকে নিয়ে। ইরাবতী তাকে মন দিল।

তারপর একদিন হঠাৎই সব গন্ডগোল হয়ে গেল। তুর্কিরা এসে উপস্থিত হল। মহারাজ পালালেন, চিত্রসেনেরও আর দেখা মেলেনি। পত্রবাহী সেই সৈনিকও আর ফিরল না। তবে কি এবার সত্যিই তুর্কিদের সঙ্গে তাদের দেশে চলে যেতে হবে ইরাবতীকে। বাকি জীবনটা তাকে কাটাতে হবে এই বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরের কোনও অচেনা মুলুকে? যবনদের হারেমে অত্যাচার সহ্য করতে হবে আমৃত্যু?

তার চেয়ে তো বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের ভার্যা হওয়া অনেক ভালো ছিল। সুখ না পেলেও জীবনে বৈভবের কোনও অভাব হত না তার। রাজমহিষীর সম্মানটা অন্তত সে লাভ করত। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে শুধু সেই কক্ষে নয়, অন্ধকার নেমে আসতে লাগল ইরাবতীর মনেও। আশঙ্কা-আশাহীনতার জমাট বাঁধা অন্ধকার।

ঘর আর মনের অন্ধকারেই ডুবে ছিল ইরাবতী। একটা মৃদু শব্দে দ্বারের দিকে তাকাল সে। দরজা খুলে গেল। প্রতিদিনের মতো একজন নপুংসক-খোজা প্রদীপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ঘরে। ইরাবতী ভেবেছিল অন্য দিনের মতোই প্রদীপটা ঘরে রেখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে প্রদীপ হাতে তার দিকে তাকিয়ে রইল সেই খোজা।

লোকটাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইরাবতী বিব্রত হয়ে ভালো করে তাকাল তার মুখের দিকে। লোকটার পরনে খোজাদের মতো ঢোলা পাজামা, হাতে-কানে-গলায় অলঙ্কার ও মাথার কেশরাশি পেছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। এ যে সেই সৈনিক! খোজার ছদ্মবেশে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে সে।

তাকে চিনতে পেরে ইরাবতী বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সৈনিক! তুমি?' অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল তার মুখেও। সে বলল, 'আমি অভিমন্যু। সেই সৈনিক। তোমাকে দাসীর ছদ্মবেশে এই প্রাসাদ থেকে বার করে নিয়ে যেতে এসেছি। শুধুমাত্র দুজন দ্বাররক্ষী ছাড়া অন্য কোনও তুর্কি এখন প্রাসাদে নেই। সেনাপতি বক্তিয়ারের দরবারে গেছে তারা। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। এই পুটুলিতে দাসীদের পোশাক আছে, দ্রুত পরে নাও এগুলো।' এই বলে সে একটা ছোট কাপড়ের পুটুলি এগিয়ে দিল ইরাবতীর দিকে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে ইরাবতী আর সময় নষ্ট না করে পরে নিল দাসীদের পোশাক। তারপর ঘোমটায় মুখ ঢেকে সৈনিকের সঙ্গে সেই কক্ষ ত্যাগ করল। প্রাসাদ থেকে বেরোবার দরজার মুখে পৌঁছে গেল দুজনে। সেখানে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে

boierpathshala.blogspot.com

দুজন তুর্কি। তারা বাধা দিল না। মাঝে-মাঝেই তো খোজাদের সঙ্গে বাইরে যায় দাসীরা, সুন্দরীদের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনতে। আবার খোজাদের সঙ্গেই তারা ফিরে আসে প্রাসাদে। একজন তুর্কি মজা করে অভিমন্যুর উদ্দেশে বলল, 'এই সন্ধ্যায় তোমরা দুজন ইশক-মুহব্বত করতে যাচ্ছ নাকি?'

কথাটা শুনে খোজাদের মতোই মুখ বেঁকিয়ে তালি দিল সৈনিক। তাই দেখে হেসে উঠল তুর্কি সৈনিকরা। ইরাবতী মনে মনে ভাবল, 'চমৎকার অভিনয় জানে খোজাবেশী সৈনিক!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান ত্যাগ করে পথে নামল তারা। তারপর অন্ধকার পথ বেয়ে দ্রুত এগোল নদীর দিকে। একসময় নদী তীরে উপস্থিত হল দুজনে। ইরাবতীকে নিয়ে একটা নৌকায় উঠে বসল অভিমন্যু। নদীর স্রোতে ভেসে চলল নৌকা। মাঝ গঙ্গায় উপস্থিত হবার পর ইরাবতী একটু ধাতস্থ হয়ে প্রশ্ন করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

সৈনিক জবাব দিল, 'যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন আছেন। আজ পূর্ণিমা। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পার্শ্বচর ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীকেরও সেখানে থাকার কথা। তাদের যে-কোনও একজনের সঙ্গী হলে তুমি নিরাপদ। ইচ্ছামতো যে-কোনও একজনের সঙ্গে তুমি চলে যেও।'

ইরাবতী জানতে চাইল, 'তারা কি তোমাকে আমায় উদ্ধার করতে পাঠিয়েছেন?'

বৈঠা টানতে টানতে অভিমন্যু বলল, 'ঠিক তা নয়। তোমাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তাদের ছিল। তারা আলাদা-আলাদা ভাবে আমাকে বলেছে যদি আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি তবে তারা পুরস্কার দেবে আমাকে। তবে পুরস্কারের লোভে আমি এ কাজ করিনি।'

'তাহলে এত বিপদ মাথায় নিয়ে তুমি এ কাজ করলে কেন?' প্রশ্ন করল ইরাবতী।

চাঁদের আলোতে ইরাবতীর দিকে মুখ তুলে তাকাল সৈনিক। ইরাবতী দেখল অদ্ভুত এক বিষণ্ণ হাসি ফুটে আছে সৈনিকের ঠোঁটের কোণে।

অভিমন্যু আর কোনও কথা বলল না। দাঁড় টানতে লাগল। ইরাবতীও কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। চাঁদের আলোতে বয়ে চলল নৌকা। জলে দাঁড় টানার মৃদু ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ নদীতটে এসে ভিড়ল অভিমন্যুর নৌকা।

চাঁদের আলোতে হয়তো নৌকাটাকে দূর থেকেই আসতে দেখেছিল চিত্রসেন আর ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক দু-পক্ষই। অভিমন্যু আর ইরাবতী নৌকা থেকে নামতেই দু-পক্ষ এগিয়ে এল। চিত্রসেনকে দেখতে পেয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইরাবতীর চোখ। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক প্রথমে বলে উঠলেন, 'চলো ইরাবতী আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর্যবান মহারাজ তোমাকে পাবার জন্য ব্যাকুল। এখনও বাংলার রাজা তিনি। রানি হবে তুমি।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই চিত্রসেন তলোয়ার কোষ মুক্ত করে বলে উঠল, 'না, ইরাবতী ওই বৃদ্ধের ভার্যা হবে না। সে আমার সঙ্গে যাবে। আমি ওর প্রেমিক।'

ব্রাহ্মণ বলে উঠলে, 'না, এ হতে পারে না। আমরা ওকে নিয়ে যাব। তুমি রাজ নির্দেশ অমান্য করছ।'

boierpathshala.blogspot.com

‘রাজ নির্দেশ! আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমি এখনই দেখিয়ে দেব যে আপনার রাজা, আপনারা, নাকি আমি প্রকৃত পুরুষ। ইরাবতী আমার সঙ্গেই যাবে। চিৎকার করে কথাগুলো বলে উঠলেন সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন।

ক্ষুদ্র হলেও চিত্রসেনের সঙ্গে সেনাদল আছে। তার সঙ্গে যুঝে ওঠা সম্ভব নয় বলে তাকে আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না ব্রাহ্মণ আর তার অনুচরেরা। অসহায় ভাবে কিছুটা তফাতে গিয়ে দাঁড়াল তারা।

বিজয়ী পুরুষ চিত্রসেন এবার হেসে ইরাবতীকে বললেন, ‘আমার কাছে এসো ইরাবতী। বীর্যবান পুরুষের জয় সর্বত্র।’

ইরাবতীর মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে। সে সেই বলদর্পী পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন এরপর অভিমন্যুর উদ্দেশে বললেন, ‘তোমাকে কী পুরস্কার দেব বলো?’

সৈনিক অভিমন্যু জবাব দিল, ‘কিছু চাই না। পুরস্কারের প্রত্যাশায় এ কাজ করিনি আমি। আপনারা দুজন সুখী থাকবেন।’ এই বলে অভিমন্যু পিছু ফিরে নৌকায় নামার জন্য পা বাড়াল।

চিত্রসেন বলে উঠলেন, ‘অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। খোজার পোশাকটা কিন্তু জব্বর মানিয়েছে তোমাকে। তাই তুমি কৌশলে ধোঁকা দিতে পারলে তুর্কিদের।’

নদীতে নেমে যাবার আগে কথাটা শুনে আবার ঘুরে দাঁড়াল সৈনিক অভিমন্যু। তারপর বলে উঠল, ‘এ শুধু পোশাক নয়।’

‘তার মানে?’

অভিমন্যু বলল, ‘আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম শুধু খোজার পোশাক পরেই ধোঁকা দেওয়া যায় তুর্কিদের। কিন্তু পরে জানলাম যে প্রাসাদের তুর্কি দ্বাররক্ষীরা পরীক্ষা করে দেখে, যে খোজা প্রাসাদে ঢুকছে সে সত্যিই খোজা কিনা...।

চিত্রসেন প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি কি তবে খোজার পোশাকে তুর্কিদের উৎকোচ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলে?’

চাঁদের আলো এসে পড়েছে সৈনিক অভিমন্যুর মুখে। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত হাসি। চিত্রসেনকে অবাক করে দিয়ে অভিমন্যু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, ‘আমি সত্যিই খোজা হয়ে গেছি।’ কথাগুলো বলে সে জলে নামল নৌকায় ওঠার জন্য। অনেক দূরে চলে যেতে হবে তাকে।

ইরাবতীর কয়েকমুহূর্ত লাগল কথাটা শোনার পর সম্বিত ফিরতে। তার মনে হল, ‘কে প্রকৃত পুরুষ? সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন? রাজা লক্ষ্মণ সেন, নাকি এই সৈনিক? যে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিল তার জন্য? না, ওই সৈনিক খোজা নয়। খোজা হলেন রাজা লক্ষ্মণ সেন, তার পাশে দাঁড়ানো সেনাধ্যক্ষ চিত্রসেন। ওই সৈনিকের মতো বীর্যবান-পুরুষ আর কেউ নয়, কেউ নয়...

অজানার উদ্দেশে সৈনিক অভিমন্যু তখন দাঁড় টানতে শুরু করেছে। আর সময় নষ্ট না করে ইরাবতী তিরের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল জলে। তারপর সাঁতরে গিয়ে উঠে পড়ল সৈনিকের নৌকাতে।

boierpathshala.blogspot.com

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে চিত্রসেন এগোতে যাচ্ছিলেন নদীর দিকে। এত সহজে তিনি যেতে দেবেন না ইরাবতীকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ওই দেখুন তুর্কিরা পিছু ধাওয়া করেছে। তারা জেনে গেছে ব্যাপারটা। জঙ্গলের ভিতরে এখনই পালাতে হবে!

সত্যিই গঙ্গাবক্ষে ভাটির দিক থেকে বিন্দু বিন্দু আলো ধেয়ে আসছে! হ্যাঁ, ওগুলি তুর্কিদের নৌকা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর কালক্ষেপ না করে চিত্রসেন পাড়ে দাঁড়ানো সবাই আত্মগোপন করার জন্য ছুটল জঙ্গলের দিকে।

কিছু সময়ের মধ্যেই তুর্কিরা এসে ঘিরে ফেলল সেই ছোট নৌকাটাকে। গঙ্গাবক্ষে সেই নৌকাটার চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল তুর্কি নৌকাগুলোর মশালের আলোতে। পালাবার আর কোনও উপায় না থাকলেও অভিমন্যু বা ইরাবতীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। অভিমন্যুর হাত ধরে উঠে দাঁড়াল ইরাবতী। তারপর অভিমন্যুর গলা জড়িয়ে প্রথম কোনও বীর্যবান পুরুষের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল সে।

আর তার পরমুহূর্তে তুর্কি তির ছুটে এসে একই সঙ্গে বিদ্ধ করল তাদের দেহ দুটোকে। অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হল অভিমন্যু-ইরাবতীর দেহ-মন। নৌকা থেকে একটাই দেহ-মন যেন ছিটকে পড়ল নদীর জলে। ইতিহাসের পাতায় জেগে রইলেন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন, তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের কাহিনি। আর অভিমন্যু-ইরাবতীর প্রেম কাহিনি সবার অলক্ষে বয়ে চলল নদীর গভীরে।

boierpathshala.blogspot.com

রম্ভা

boierpathshala.blogspot.com

শ্রীনগররাজ চক্রবর্মণ তাঁর প্রাসাদের ছাদ থেকে তাকিয়ে ছিলেন দূরের গিরিবর্ত্মের দিকে। পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত এই প্রাসাদ থেকে নীচ থেকে ওপরে উঠে আসা গিরিপথটা স্পষ্ট দেখা যায় মেঘ আর কুয়াশামুক্ত গ্রীষ্মের সকালে। এই শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম অতি মনোরম। প্রাসাদসংলগ্ন বাগিচায় থরে থরে গোলাপ ফুটে আছে, আর তার সুবাস এসে পৌঁছচ্ছে এই সুউচ্চ প্রাসাদের ছাদ পর্যন্ত। মধ্যবয়সি চক্রবর্মণের ঠিক পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মহামন্ত্রী ভিক্ষচর। বার্ধক্যের সীমানায় উপনীত তিনি। চক্রবর্মণের পিতার আমল থেকেই শ্রীনগর-কাশ্মীর রাজের মহামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। শ্রীনগররাজ চক্রবর্মণ দমর গোত্রের দুই নর্তকীকে যেদিন হারেমে এনে রাজমহিষীর আসনে বসালেন সেদিন থেকেই পতন শুরু হয়েছে এ রাজ্যের। কামুক রাজা চক্রবর্মণের প্রশ্রয়ে হারেম থেকেই হংসী ও সোমলতা নামের দুই ডোম বারবনিতা রাজ্যের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। ভিক্ষচর এখন নামেই মহামন্ত্রী। বিশেষত হংসীর কাছে, বলা ভালো তার যৌনতার কাছে যেন আত্মসমর্পণ করেছেন রাজা চক্রবর্মণ। আর সে জন্যই ঔদ্ধত্য, শালীনতার সব সীমাকে যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে নীচস্বভাবা হংসী। হ্যাঁ, সে নীচস্বভাবা। নইলে কেউ ঋতুস্রাবের রক্তমাখা কাপড় পাগড়ি বানাবার জন্য উপহার দিতে পারে মহামন্ত্রী ভিক্ষচরের সহকর্মী আর এক মন্ত্রী শঙ্ককে?

রাজাদের হারেম থাকবে এ ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। রাজসভার মহিমাবর্ধনকারী দ্বাদশ রত্নের মধ্যে তিন রত্ন তিন নারী। মহিষী বা প্রধান রানি, ববতা বা প্রিয় পত্নী, পরিবৃক্তি বা পরিত্যক্ত স্ত্রী। যাকে রাজা পত্নী হিসাবে পরিত্যাগ করলেও বিশেষ কোনো গুণাবলীর জন্য রাজদরবারে স্থান দেন। এছাড়া সম্ভোগের জন্য থাকে হারেম। রাজার ক্ষমতা ও ইচ্ছা অনুসারে নারীদের সংখ্যা নির্ণীত হয়। যেমন বারাণসীরাজ তম্ব-র অতীব রূপসী মহিষী সুযোন্দী থাকা সত্ত্বেও তাঁর হারেমে ষোল হাজার নারী ছিল। এ প্রথা তো প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু রাজাদের মধ্যে চলে আসছে। এই শ্রীনগর রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এ রাজ্যে এমন কখনও হয়নি যে হারেমের জন্য রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়তে চলেছে। যা ঘটছে এই চক্রবর্মণের রাজত্বে।

গিরিবর্ত্মের দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাজা চক্রবর্মণ। পাহাড়ের ফাঁক গলে সকালের সূর্যকিরণ এসে পড়েছে তাঁর মুখে। কোটরগত কামাতুর চোখ, উন্মুক্ত ঝুলে পড়া রক্তিম ওষ্ঠ, প্রকট হয়ে ওঠা হনু, লাম্পট্যের স্পষ্ট চিহ্ন যেন দিনের আলোতেও ধরা দিচ্ছে শ্রীনগর নৃপতির মুখমণ্ডলে। তিনি অপেক্ষা করছেন এক নারীর দর্শন পাবার জন্য। অনন্ত সম্ভোগের প্রতীক সেই নারী। যার জন্য ইতিমধ্যেই বিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন রাজা চক্রবর্মণ। যার ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রাকারবেষ্টিত স্বর্ণখচিত সম্ভোগ মঞ্চ। যেখানে তার সঙ্গে যৌনক্রীড়া করবেন শ্রীনগররাজ। সব আয়োজনই সম্পন্ন। এখন শুধু তার আসার প্রতীক্ষা। চক্রবর্মণ সংবাদ পেয়েছেন যে গতকালই সেই নারী এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীনগরের উপকণ্ঠে। ওই গিরিবর্ত্ম দিয়েই তাঁর নগরীতে প্রবেশ করার কথা। বিরাট এক শিবিকাতে বহন করে আনা হচ্ছে তাকে। শিবিকা না বলে অবশ্য তাকে কক্ষ বলাই ভালো। চল্লিশজন বেহারা তাকে বহন করে আনছে। কক্ষের মধ্যেই সে নারীর স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাকে শিবিকা ত্যাগ না করতে হয়, যাতে কোনো পুরুষের দৃষ্টি সেই যুবতীর ওপর না পড়ে। চক্রবর্মণের আর তর সইছে না কখন সে আসবে বলে।

গিরিবর্ত্মের দিকে তাকিয়ে রাজা চক্রবর্মণ বললেন, 'মহামন্ত্রী, ওই যুবতী কেমন দেখতে তুমি জানো?'

boierpathshala.blogspot.com

ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'যা শুনেছি তাতে সে দীর্ঘাঙ্গী, গাত্রবর্ণ শুভ্র, দীর্ঘ অক্ষিপল্লব, স্ফীত বক্ষ, ক্ষীণ কটিদেশ, গুরু নিতম্ব।'

জবাব শুনে রাজা বললেন, 'চান্দেলরাজাদের মন্দিরগাত্রে এ জাতের নারীর যে ছবি খোদিত দেখেছিলাম ঠিক তেমনই তো?' কিছুকাল আগে রাজা চক্রবর্মণ সপার্ষদ ভ্রমণ করতে গেছিলেন চান্দেলরাজদের রাজ্যে। সেখানে যাবার পিছনে অবশ্য এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে বেশ কয়েকটা প্রাচীন মন্দিরগাত্রে সম্ভোগের বিভিন্ন চিত্রাবলী, মিথুন ভাস্কর্য খোদিত আছে। যৌনতাই চক্রবর্মণের জীবনের সব কিছু। যদি সেই মন্দিরগাত্রের যৌন শিল্পকলা দেখে নতুন কোনো রতি-ক্রীড়া-সম্ভোগ পদ্ধতি জানা যায় সে জন্যই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, জেনেছেন কাশ্মীররাজ। মন্দিরগাত্রে খোদিত এক অদ্ভুত যৌন দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেছিলেন রাজা চক্রবর্মণ। এমন মিথুন দৃশ্য আগে কোনওদিন দেখেননি তিনি। বিশেষ জাতের নারীর সঙ্গে বিশেষ পদ্ধতিতে যৌনক্রীড়া। আর তা দেখে ও এই মিথুনক্রীড়ার উপযোগিতা শুনে রাজা চক্রবর্মণের মনে হয়েছিল ঠিক এমন নারী তাঁর চাই। তাই ফেরার আগে তিনি চান্দেলরাজ মহীতপকে অনুরোধ করেছিলেন যে কোনও মূল্যে এমন এক নারী সংগ্রহ করে যেন শ্রীনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কথা রেখেছেন মহীতপ। সেই নারীকে তিনি পাঠাচ্ছেন। চান্দেলরাজার মন্দিরে দেখা সেই নারীমূর্তির কথাই মহামন্ত্রীকে বোঝাতে চাইলেন রাজা। ঠিক তেমনই হবে তো এই নারী?

ভিক্ষচর জবাব দিলে, 'নিশ্চয়ই তেমনই হবে। আপনি তো নিজের চোখেই মন্দিরগাত্রে দেখেছেন সে জাতীয় নারীর ছবি। চান্দেলরাজ আপনাকে ফাঁকি দেবেন কীভাবে?'

শ্রীনগররাজ বললেন, 'তা বটে। তাছাড়া আমি শ্রীনগর-কাশ্মীরের রাজা। সত্যিকারের নৃপতি। মহীতপকে স্থানীয় লোকেরা রাজা বললেও সে তো আসলে ওই জঙ্গলপ্রদেশের ভূ-স্বামী মাত্র। আমার মতো সত্যিকারের রাজার সঙ্গে তার মতো ভূ-স্বামীর সম্পর্ক স্থাপন নিশ্চয়ই তার কাছে গৌরবের ব্যাপার।'

মহামন্ত্রী মৃদু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'তা তো নিশ্চয়ই। আপনি এই বিশাল উপত্যকার সত্যিই অধীশ্বর। আর মহীতপ সেই রুক্ষ-জঙ্গুলে রাজ্যের ভূ-স্বামী মাত্র। কৃষ্ণবর্ণের বুনো লোকদের দলপতি ছাড়া সে কিছুই নয়। আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পেরে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হয়েছে।'

রাজা চক্রবর্মণ বললেন, 'তা তো বটেই। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, সে সেই নারীকে পাঠাবে। তবে যারা তাকে নিয়ে আসছে সেই বেহারার দল আর মহীতপের দূত হয়ে যদি কেউ এসে থাকে তবে তাদের পর্যাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। আর মহীতপের জন্য উপহারস্বরূপ তুলে দেবেন সোনার সুতোর কারুকাজ করা পশুলোমের শাল। যাতে খুশি হয় তারা।'

মহামন্ত্রী বললেন, 'আপনার নির্দেশ পালিত হবে, মহারাজ।'

রাজা চক্রবর্মণ মুখে মহামন্ত্রীকে যদিও বললেন, যে তিনি নিশ্চিত ছিলেন মহীতপ সে নারীকে পাঠাবে। কিন্তু গতকাল মহীতপের উপহার শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পৌঁছেছে এ খবর কানে না আসা পর্যন্ত চক্রবর্মণ ব্যাপারটা নিয়ে একটু সন্দিহান ছিলেন। কারণ, চক্রবর্মণ সবার অলক্ষে একটা ব্যাপার ঘটিয়ে এসেছিলেন সেখানে। অন্য কেউ হয়তো জানে না তবে চক্রবর্মণ নিজে সেটা জানেন।

একথা সত্যি রাজা চক্রবর্মণের মতো নগরীর নানা প্রান্তে উদ্যানশোভিত হর্ম্যপ্রাসাদ-অতিথিশালা বা প্রমোদ-প্রাসাদ মহীতপের নেই। নদীতীরে অনুচ্চ এক পাহাড়ের গায়ে ছিরিছাঁদহীন এক পাথুরে দুর্গের মধ্যেই তার সবকিছু। চক্রবর্মণেরও স্থান হয়েছিল

boierpathshala.blogspot.com

সেখানেই। চন্দ্রালোকিত এক রাত্রে চক্রবর্মণ গবাক্ষ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে এক রূপসী নারী একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে দুর্গের পশ্চাতভাগে যে ক্ষুদ্র কানন আছে তার বৃক্ষরাজির নীচে। সঙ্গে সঙ্গে কামজ্বালা জেগে উঠেছিল চক্রবর্মণের মনে। যে রাজা নিজের রাজ্যে প্রতিদিন অন্তত তিনজন নারীকে সম্ভোগ করেন, তিনি এই জঙ্গলপ্রদেশে সুদূর শ্রীনগর থেকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কারণে নারীদেহ থেকে বঞ্চিত, তাঁর দেহে কামনার আগুন জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। চক্রবর্মণ তাকে দেখামাত্রই কক্ষ ত্যাগ করে মার্জারের মতো উপস্থিত হয়েছিলেন সেই নির্জন বাগিচায়। তারপর পিছন থেকে জাপ্টে ধরে সে রমণীকে টেনে নিয়ে গেছিলেন এক প্রাচীন বৃক্ষের আড়ালে। প্রাথমিক অবস্থায় চক্রবর্মণকে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সেই নারী। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেছিল সেই অসহায়া। হয়তো সে শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিল রাজ-অতিথি শ্রীনগররাজ চক্রবর্মণকে। নিজের কামেচ্ছা-সম্ভোগ চরিতার্থ করে সে রাতে আবার নিজ কক্ষে ফিরে এসেছিলেন চক্রবর্মণ। আর এর পরদিনই শ্রীনগরে ফেরার জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি।

জঙ্গলপ্রদেশের রাজা মহীতপ দুর্গের প্রধান তোরণ পর্যন্ত এসে বিদায় জানিয়েছিল তাঁকে। মহীতপের আচরণে কোনও উষ্মা প্রকাশ পায়নি। তবু রাজা চক্রবর্মণের মনে একটা আশঙ্কা থেকেই গেছিল যে হয়তো পরবর্তীকালে সে রাতের ঘটনাটা গোচরে এল মহীতপের, ক্ষুব্ধ হয়ে হয়তো মহীতপ রাজা চক্রবর্মণের অভীষ্ট সেই নারীকে শ্রীনগরে পাঠালেন না। গতকাল শিবিকা আসার খবর পেয়ে চক্রবর্মণ এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছেন যে সেই ধর্ষণের খবরটা তবে মহীতপের কানে পৌঁছয়নি। অথবা যদি পৌঁছিয়েও থাকে তবে ব্যাপারটাতে তেমন আমল দেয়নি মহীতপ। ছাদে দাঁড়িয়ে মহামন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় সে ঘটনার কথা আরও একবার স্মরণে এল রাজা চক্রবর্মণের। এরপর তিনি মহামন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, সত্যিই কি ওই নারী পুরুষের যৌন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়? যে ওই নারীকে তৃপ্ত করতে পারে সে সত্যি কি এক রাতে সাতজন নারীকে সম্ভোগ করতে পারে? তৃপ্ত করতে পারে? সে কারণেই কিন্তু এ নারীকে পাবার জন্য আমার এত বাসনা।'

গা-ঘিনঘিনে সেই রতিক্রীড়ার কথা কল্পনা করে মনে মনে শিউরে উঠলেন মহামন্ত্রী ভিক্ষচর। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'তাই তো বলেছিল চান্দেলরাজ। আপনার মনে নেই তার বলা সেই কাহিনি? বারাণসীরাজ এভাবেই তো তাঁর যৌনক্ষমতা বাড়াতেন। তম্বর ষোল হাজার সম্ভোগা ছিল। তিনি কোনও নারীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিলিত হতেন না ঠিকই কিন্তু প্রতিদিন অন্তত দশজন নারীকে তৃপ্ত করতে পারতেন। এ ধরনের বিশেষ নারীর সঙ্গে মিলনের কারণে যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। তাছাড়া ব্যাপারটা যদি সত্যি না হয় তবে মন্দিরগাত্রে ও ধরনের নারীর সঙ্গে সম্ভোগ দৃশ্য কেন আঁকতে যাবে প্রাচীন ভাস্করের দল; যদি তার কোনও ভিত্তি না থাকে? বাৎসায়ন নির্দেশিত কামশাস্ত্র অনুযায়ী ওই মন্দিরের বহিঃগাত্রের ভাস্কর্য রচনা করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই এই মিথুনক্রীড়া যৌনাচারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ব্যাপারটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। আমার ধারণা আপনি হতাশ হবেন না।'

মহামন্ত্রী ভিক্ষচরের কথা শুনে বেশ খুশি হলেন শ্রীনগররাজ চক্রবর্মণ। তিনি এরপর হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গিরিবর্ত্মে চক্রবর্মণের দৃষ্টিগোচর হল সেই শিবিকা। তাকে নিয়ে ওপরে উঠে আসছে বাহকের দল। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিশাল সেই শিবিকা। যেন আস্ত একটা গৃহকেই বহন করে আনছে বাহকরা। সে দৃশ্যের দিকে বেশ কিছুক্ষণ উল্লসিত ভাবে চেয়ে রইলেন রাজা। ওই শিবিকার মধ্যেই

boierpathshala.blogspot.com

আছে সেই অভীষ্ট নারী। যার সঙ্গে মিলনের ফলে তিনি লাভ করবেন প্রতিদিন বহু নারীকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা। অনন্ত পৌরুষের অধিকারী হবেন কাশ্মীর অধিপতি চক্রবর্মণ।

ক্রমশ নগরীর দিকে উঠে আসছে সেই শিবিকা। কামাতুর রাজা বেশ কিছুক্ষণ সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অবশেষে সম্বিত ফিরে পেয়ে ভিক্ষচরকে বললেন, 'আপনি আর কালক্ষেপ করবেন না। শীঘ্র ওদের কাছে পৌঁছে শিবিকা নবনির্মিত হারেমের পথে নিয়ে যান। খেয়াল রাখবেন, আমি-আপনি আর হারেমের খোজা রক্ষী যারা নবাগত নারীর পরিচর্যা ও প্রহরার দায়িত্বে থাকবে তারা ছাড়া সে নারীর দর্শন যেন কেউ না পায়। অন্য কেউ যদি তার দর্শনলাভ করে তবে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। এমনকী তাকে কেমন দেখতে সে ব্যাপারেও যেন হারেমের বাইরে কোনও খবর না পৌঁছয় সে ব্যাপারে আমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছি খোজা প্রহরীদের। শুধু তাকে দর্শনই নয় তাকে নিয়ে কোনও আলোচনা হলেও মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। এই নবনির্মিত হারেমে কাকে স্থান দেওয়া হতে চলেছে তা জানতে আমার বৃহৎ হারেমের নারীরা অত্যন্ত আগ্রহী। তারা যেন এই নবাগতার ব্যাপারে কিছু জানতে না পারে। হারেমে আপনি সেই নবাগতা নারীকে পৌঁছে দিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রাসাদে আসবেন। প্রতীক্ষায় রইলাম।'

ভিক্ষচর এবার একটু শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'যদি নটী হংসী অথবা নটী সোমলতা কিছু জানতে চান? আপনি তো তাঁদের নির্দেশ পালন করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন আমাকে?'

নাম দুটো শুনেই হাসি ফুটে উঠল কাশ্মীররাজের ওষ্ঠে। তিনি বলে উঠলেন, 'তারা দুজন আমার কাছে মহিষীর থেকেও প্রিয়। বিশেষত হংসীকে অদেয় কিছু আমার নেই। তবু তাদের কাছেও ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলবেন না আপনি। তারা তো বুঝবে না যে তাদের তৃপ্ত করার জন্যই এ নারীর আগমন ঘটছে। ব্যাপারটা তারা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে নাও পারে।'

ভিক্ষচর বললেন, 'যথা আজ্ঞা মহারাজ।' তারপর তিনি স্থানত্যাগ করলেন, সম্রাটের আদেশ পালনের জন্য।

২

বিশাল পালকি নিয়ে বেহারার দল নগরীতে প্রবেশ করতেই অশ্বারূঢ় ভিক্ষচর উপস্থিত হলেন তাদের সামনে। বেহারারা ছাড়া আরও একজন লোক আছে পালকির সমুখে। সুঠাম কৃষ্ণবর্ণের রুক্ষ চেহারা তার। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথায় বিড়ে বাঁধা নোংরা পাগড়ি, পরনে ধূলিমলিন বিবর্ণ পোশাক, উন্মুক্ত পদযুগল। অলঙ্কার বলতে হাতে ও পায়ে মোটা মোটা মিশ্র ধাতুর বালা, আর ধাতুর কর্ণকুণ্ডল। স্পষ্টই লোকটাকে দেখে বোঝা যায় সে জঙ্গল অধ্যুষিত মধ্য ভারতের বন্য উপজাতির লোক। পালকি বেহারাদের চেহারাও অনেকটা একইরকম। এ লোকগুলোর অধিপতিই হলেন মহীতপ। ঘোড়া থেকে নেমে অগ্রবর্তী লোকটার উদ্দেশে মহামন্ত্রী ভিক্ষচর বললেন, 'আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

অগ্রবর্তী লোকটা প্রশ্ন করল, 'রাজপ্রাসাদে?'

মহামন্ত্রী জবাব দিলেন, 'না, হারেমে।'

boierpathshala.blogspot.com

বিদেশি কথাটা শুনে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে, 'অন্য রমণীদের সঙ্গে একই হারেমে রাখা হবে নাকি? এ নারী কিন্তু বরাবরই একলা থাকতেই অভ্যস্ত।'

ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'না, অন্য নারীদের সঙ্গে তিনি থাকবেন না। তাঁর জন্য নতুন হারেম নির্মাণ করেছেন শ্রীনগরপতি। সেখানে একা থাকবেন এই নারী।'

জঙ্গলবাসী বলল, 'চলুন, তবে সেখানে যাওয়া যাক।'

ঘোড়া থেকে নেমে লোকটাকে নিয়ে এগোলেন হারেমের দিকে। সে দিকে যেতে যেতে ভিক্ষচর লোকটাকে কৌতূহলবশত জিগ্যেস করলেন, 'নবাগতা এই সুন্দরীর নাম কী?'

লোকটা জবাব দিল, 'রম্ভা। স্বর্গের অপ্সরা রম্ভার মতোই অনন্ত যৌবনের প্রতীক এই নারী।'

বিদেশি লোকটা জানতে চাইল, 'আপনাদের হারেম সুরক্ষিত তো?'

ভিক্ষচর বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। বাগিচা সুরভিত শ্বেতমর্মর হারেমের চারপাশে আছে সুউচ্চ প্রাকারের বেষ্টনী। খোজা রক্ষীরা পাহারা দেয় সেই হারেম। নারী ছাড়া কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষেধ সেখানে। রাজ-আজ্ঞা পেলে আমি বা প্রধান সেনাপতির মতো দু-একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সেখানে প্রবেশের অনুমতি পাই। তাছাড়া হারেমে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি রাখেন না রাজারা। জানোই তো এদেশে বহু রাজাকে হত্যা করা হয়েছে, অথবা হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে হারেমের ভিতর। সে জন্য হারেমের সুরক্ষায় সর্বদা সজাগ থাকেন রাজারা।'

কথাটা শুনে বনচারী রাজা মহীতপের প্রতিনিধি বলল, 'হারেমেও রাজহত্যা হয় নাকি?'

ভিক্ষচর বললেন, 'হ্যাঁ, হয় তো, এ ঘটনার নজির এ দেশে বহু আছে। বিশেষত বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনা। কাশীরাজকে খৈ-মুড়ির সঙ্গে বিষপ্রয়োগ করে হারেমের এক নারী হত্যা করেছিল। যাকে কাশীরাজ পত্নীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাজা রৈবন্তককে একজোড়া বিষ নূপুরের সাহায্যে হত্যা করেছিল হারেম নর্তকী। কামার্ত রৈবন্তক নর্তকীর পদচুম্বন করতে গিয়ে মারা যান। হারেম সুন্দরী তার গোপনাঙ্গে বিষ-পাথর লুকিয়ে রেখে হত্যা করে রাজা সৌবীরকে। রাজা করুষকে তাঁর পুত্র হত্যা করেছিল হারেমের ভিতর তার পিতা-মাতা সম্ভোগ চলাকালীন দর্পণের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে। বিদূরথকে এক কামিনী হত্যা করেছিল হারেমের ভিতর তার কেশগুচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি তীক্ষ্ন কিরিচ লুকিয়ে রেখে। যে কারণে হারেমে নারীসঙ্গের সময় সবসময় সতর্ক থাকেন রাজা চক্রবর্মণ। ফুলের যে মালা পরে তিনি রতিক্রিয়া করেন সে মালা তিনি গলায় পরার আগে তাঁর চোখের সামনে স্পর্শ করানো হয় নগ্ন যুবতীদের দেহে। যাতে রাজা নিশ্চিত হতে পারেন যে ওই ফুলমালা কণ্ঠে ধারণ করলে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই সে ব্যাপারে। একই কারণে অনেক সময় রাজ সম্ভোগের আগে নারীর যৌনাঙ্গ লেহন করানো হয় খোজা প্রহরীদের দ্বারা। বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে এ কাজটা করা হয়, যাদের প্রথমবার হারেমে আনা হয় অথবা যাকে প্রথমবার সম্ভোগ করতে চলেছেন রাজা।'

লোকটা বলল, 'শিবিকায় যাকে নিয়ে এলাম, তার ক্ষেত্রেও এ সব পরীক্ষা করা হবে নাকি?'

ভিক্ষচর বললেন, 'হতেও পারে। যতটুকু জানি মহারাজ আজ রাতেই মিলিত হবেন এই নবাগতার সঙ্গে।'

boierpathshala.blogspot.com

লোকটা বলল, 'তাতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। এ যুবতী এ সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।'

তার জবাব শুনে মহামন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললেন, 'এমন যদি হত তবে ভালোই হত। কেউ যদি চক্রবর্মণকে হত্যা করতে পারত তাহলে দেশটা অন্তত বেঁচে যেত ওই দুই কামার্ত ব্যভিচারিণী হংসী আর সোমলতার হাত থেকে। রাজমহিষী যশোবতীর দ্বাদশবর্ষীয় বালক পুত্র আছে। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমাতা আর মন্ত্রীপরিষদ রাজ্য চালনা করতে পারতেন।'

শিবিকা নিয়ে ভিক্ষচর একসময় হারেমের প্রবেশ তোরণে পৌঁছে গেলেন। খড়গধারী আর ধনুর্ধর খোজারা ঘিরে রেখেছে প্রবেশ তোরণ। শিবিকা যে আসছে সে খবর তাদের কাছে আগেই পৌঁছে গেছিল। কাজেই তোরণ খুলে দেওয়া হল। খোজা প্রহরীরা সতর্কভাবে নিয়ে চলল, প্রাকারবেষ্টিত স্থাপত্যের কেন্দ্রস্থলের দিকে। বিরাট একটা মর্মর প্রাসাদ অবস্থান করছে বাগিচার কেন্দ্রস্থলে। আর তাকে ঘিরে আরও ছোট ছোট নানান গৃহ। ফোয়ারা আর ছোট ছোট জলাধার শোভিত সুরম্য বাগিচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃগ-ময়ূরের দল। নানান সুগন্ধী ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা চারপাশ। হারেম প্রাকারের ভিতর প্রবেশ করে সেই মধ্য ভারতীয় ব্যক্তি চারপাশে তাকিয়ে বিস্মিত ভাবে বলল, 'এই এত বড় অট্টালিকা, আর সংলগ্ন এই সুরম্য বাগিচা—এ সবই কি রম্ভার জন্যই?'

ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এ সবই তাঁর জন্য নির্মিত। মূল অট্টালিকাতে থাকবেন পালকির ভিতরে থাকা যুবতী। আর বাগিচার নানান জায়গাতে মূল হারেম প্রাসাদকে ঘিরে যে সব গৃহ আছে সেখানে থাকবে মালিনী, চন্দনলেপিনী, ভূষণবাহিকা, পরিচ্ছদবাহিকা থেকে শুরু করে পাচিকা সহ দাসী-বাঁদির দল। যারা শ্রীনগরপতি ও নবাগতা যুবতী রম্ভার পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকবে। পার্বত্য উপজাতির ধনুর্ধর কিছু নারীকেও শুনেছি নিয়োগ করা হতে চলেছে হারেমের অভ্যন্তরে। সম্ভবত আগামীকাল থেকেই তাদের নিয়োজিত করা হবে।'

বনচারী বলল, 'এখানে উপস্থিত নারীর দল তো বাইরের পৃথিবীর কাছে ব্যক্ত করে দিতে পারে রম্ভার সৌন্দর্যের কথা? তাকে পাবার জন্য কোনও রাজা তো আক্রমণ করতে পারে এই রাজ্য?'

ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'না, তার সম্ভাবনা নেই। ভোগ্যা নারী হোক বা দাসী, একবার হারেমে প্রবেশ করলে কেউ আর জীবন্ত বাইরে বেরোতে পারে না। দু-একজন নারীকে হয়তো মহানুভব শ্রীনগরাধীপ কোনও কোনও সময় মুক্তি দেন ঠিকই, কিন্তু মুক্তিদানের পূর্বে তাদের জিহ্বা কর্তন করা হয় যাতে তারা হারেমের খবর বাইরে প্রকাশ না করতে পারে।'

প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করল শিবিকা। ভিক্ষচর তাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন সম্ভোগ মণ্ডপ সংলগ্ন ছাদঅলা এক প্রাঙ্গণে। পালকি নামাল বেহারারা। পালকির দরজা উন্মুক্ত করা হল। তার ভিতর উঁকি দিল খোজা রক্ষীরা। শিবিকার ভিতর এক কোণে হাঁটু মুড়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে বসে আছে সেই নারী, রম্ভা। সামান্য বস্ত্রখণ্ডও নেই সেই যুবতীর দেহে। যৌবন যেন চুঁইয়ে পড়ছে তার অঙ্গ বেয়ে। পুরুষ্ট বুক, ক্ষীণ কটি আর মৃদঙ্গের মতো ভারী নিতম্বে অনন্ত সম্ভোগের হাতছানি। খোজা রক্ষীরাও অবাক হয়ে গেল তার সৌন্দর্য দেখে। ভিক্ষচর একবার শিবিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবছা হাসি ফুটে উঠল সেই মধ্য ভারতীয়র ঠোঁটে। সে প্রশ্ন করল, 'কেমন দেখলেন?'

boierpathshala.blogspot.com

ভিক্ষচর বললেন, 'অতীব সুন্দরী ঠিকই। কিন্তু কোনও ধরনের নারীদেহের প্রতিই আকর্ষণ নেই আমার। আমি কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। উপবীত ধারণ করার পর আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে আমি শুধু এই শ্রীনগর রাজ্যের হিতার্থেই মন দেব, অন্য কোনও কাজে মন দেব না। যে কারণে আমি নিজে দারপরিগ্রহ করিনি। পরনারী সম্ভোগ তো অনেক দূরের ব্যাপার।'

এ কথা বলার পর মহামন্ত্রী বললেন, 'এবার আপনাকে ও আপনার লোকজনকে হারেম ত্যাগ করতে হবে। এখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশানুমতি আর আপনারা পাবেন না। অতিথিশালায় আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হবে। শ্রীনগর ত্যাগের আগে অবশ্য ভালো পারিতোষিক পাবেন আপনারা কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। তাছাড়া চান্দেলরাজের জন্য শ্রীনগর নরেশের পক্ষ থেকে একটি মহার্ঘ শালও উপহারস্বরূপ নিয়ে যেতে হবে আপনাদের। এমনই রাজনির্দেশ।'

কথাটা শুনে মহীতপের প্রতিনিধি বলল, 'কিন্তু আমাকে অন্তত আজকের রাতটা এই হারেমে থাকতে হবে। বেহারার দল না হয় অতিথিশালাতেই রইল। আমি না থাকলে রতিক্রিয়ার সেই বিশেষ পদ্ধতি সুচারুভাবে নাও বুঝতে পারেন রাজা। সমস্যা হতে পারে।'

কথাটা শুনে ভিক্ষচর বললেন, 'কিন্তু এখানে থাকার জন্য রাজ-অনুমতি লাগবে। দেখি কাশ্মীর নরেশ কী বলেন?' বেহারার দল আর তাদের সর্দারকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হারেম প্রাকারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন মহামন্ত্রী ভিক্ষচর। তারপর লোকগুলোকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন অতিথিশালার দিকে। বেহারাদের সেখানে বিশ্রাম ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে সর্দার লোকটাকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

৩

পাথর, ইষ্টক আর দারু নির্মিত শ্রীনগররাজের প্রাসাদ। বিশাল তার চৌহদ্দি। ফলফুলের বাগিচা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, প্রমোদ মণ্ডপ, অতিথিশালা, দেবদেউল, সৈনিক আবাস, পশুশালা কী নেই সেখানে। প্রচুর লোকজন চারদিকে। প্রাসাদ চত্বরটাকে শ্রীনগর নগরীর অভ্যন্তরে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নগরী বললেও অত্যুক্তি হয় না। মূল প্রাসাদে অবশ্য সাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হলেও মহামন্ত্রী বলে এ প্রাসাদে প্রবেশের কোনও বাধা নেই ভিক্ষচরের। শতাধিক কক্ষযুক্ত এই রাজপুরীর যে-কোনও জায়গাতেই প্রবেশাধিকার আছে মহামন্ত্রীর ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের। এমনকী রাজার শয়নকক্ষেও উপস্থিত হতে পারেন তাঁরা দুজন। সম্প্রতি অবশ্য আরও দুজন রাজনির্দেশে এ অধিকার পেয়েছে। সেই হংসী আর সোমলতা। ভিক্ষচর মৃদু সন্দিহান ছিলেন যে চক্রবর্মণ সত্যিই তাঁর জন্য এ প্রাসাদে অপেক্ষা করে আছেন, নাকি হংসীর আহ্বানে প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন? আজকাল প্রায় সময়ই তো দিনের বেলা তিনি চলে যান হারেমে। আদিম রিপুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন শ্রীনগররাজ। দিন-রাতের পার্থক্য এখন তাঁর কাছে গৌণ। কামই তাঁর জীবনের সবকিছু। অন্য কোনও কীর্তি বা খ্যাতির অভিলাষী তিনি নন। মহারাজের প্রধান ভৃত্যের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করার পর দেখা হয়ে গেল ভিক্ষচরের। খাস ভৃত্য জানাল যে মহারাজ অন্তঃপুরেই আছেন। স্নানাগারে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অর্থাৎ প্রথম তলেই আছেন তিনি।

boierpathshala.blogspot.com

লোকটাকে নিয়ে বারমহল অতিক্রম করে ভিক্ষচর প্রথমে উপস্থিত হলেন শ্বেতপাথর বসানো একটা চকে। চকটাই বারমহল আর অন্দরমহলকে আলাদা করে রেখেছে। অন্দরমহলে সবাই প্রবেশ করতে পারে না। বিদেশিকে সেখানে দাঁড় করিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন ভিক্ষচর। স্নানাগার সংলগ্ন এক বিশাল কক্ষ আছে। যেখানে স্নানের পূর্বে রাজার দেহে সুগন্ধি তৈল মর্দন করা হয়। পরিচ্ছদ, আভূষণ সে কক্ষে পরিত্যাগ করে রাজা কক্ষ সংলগ্ন স্নানগৃহে যান।

ভিক্ষচর প্রবেশ করলেন সেই কক্ষে। দীপদানে বড় বড় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের ভিতর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী পরিচারিকারা। তাদের কারো হাতে রুপোর থালায় মখমলের আচ্ছাদনের ওপর রাখা সুগন্ধির পাত্র, কারো হাতে থালায় রাখা অলঙ্কার বা রেশমবস্ত্র অথবা নানা ধরনের উপাচার। কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটা চন্দন কাঠের বেদির ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন রাজা। সম্পূর্ণ নিরাবরণ তাঁর দেহ। উন্মুক্ত বক্ষ তিনজন সুন্দরী দামি তৈল-সুগন্ধি মর্দন করছে তাঁর অঙ্গে। লজ্জাহীন রাজা। ভিক্ষচর কক্ষে উপস্থিত হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন রাজা। তারপর ব্যগ্রভাবে জানতে চাইলেন, 'কেমন দেখলেন তাকে?'

মহামন্ত্রী মাথা নীচু করে প্রথমে জবাব দিলেন, 'অতীব সুন্দরী।' তারপর বললেন, 'এ ব্যাপারে একান্তে কিছু বলার ছিল।'

রাজ-নির্দেশে সুন্দরী নারীর দল কক্ষ থেকে প্রস্থান করল। ভিক্ষচর এবার ব্যক্ত করলেন শিবিকার সঙ্গে আসা লোকটার বক্তব্য।

কথাটা শুনে রাজা বললেন, 'ব্যাপারটা যখন আবশ্যক তখন তো লোকটাকে সেখানে থাকতে দিতেই হয়। ঠিক আছে, আমি হারেমের দ্বাররক্ষী প্রধান খোজাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি।'

শ্রীনগররাজ এরপর আবার ডেকে নিলেন দাসীদের। তারা আবার তৈল মর্দন শুরু করল। রাতের প্রস্তুতির জন্য এবার তাঁর বিশেষ এক অঙ্গ মর্দন শুরু করালেন উলঙ্গ রাজা।

কক্ষ ত্যাগ করলেন মহামন্ত্রী। অলিন্দ পেরিয়ে যখন তিনি প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন ঠিক তখনই সেখানে এসে থামল এক শিবিকা। তার ভিতর থেকে যে নামল তাকে দেখেই অন্যদিকে বাঁক নিলেন ভিক্ষচর। কিন্তু সে দেখে ফেলেছে ভিক্ষচরকে। সে হাঁক দিল, 'মহামন্ত্রী, কোথায় যাচ্ছেন? এদিকে আসুন।'

যদিও তার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি নেই মহামন্ত্রীর, তবু এই মুহূর্তে তার ডাক অস্বীকার করার ক্ষমতা এ রাজ্যে বর্তমানে কারো নেই। কারণ, তার নাম হংসী।

ভিক্ষচর এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে একবার তার দিকে তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিলেন। বলা ভালো যে চোখ নামিয়ে নিয়ে বাধ্য হলেন। সালঙ্কারা সেই নারীর বসন এতটাই স্বচ্ছ যে তার স্তনযুগল তো বটেই, স্তনবৃন্ত, নাভিকূপ, এমনকী নিম্ন উদরও দৃশ্যমান। বিধাতা তার শরীরে রূপ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় যে তা অত্যন্ত কুটিল ছলাকলাপূর্ণ। পুরুষ, বিশেষত সে পুরুষ যদি কামুক হয় তবে তাকে প্রলুব্ধ করাই তার একমাত্র কাজ। তার স্বচ্ছ পোশাকের কারণও ওই একই।

হংসী তাঁর উদ্দেশে বলল, 'আমার দিকে তাকাচ্ছেন না যে? আমাকে কি আপনার ভালো লাগে না?'

boierpathshala.blogspot.com

ভিক্ষচর এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'কার্যোপলক্ষে আমাকে শীঘ্র অন্যত্র গমন করতে হবে।'

হংসী চটুল হেসে বলল, 'নারীসঙ্গ করতে নাকি?'

জবাব দিলেন না মন্ত্রীবর।

হংসী এরপর প্রশ্ন করল, 'শুনলাম মহারাজ নাকি ভিনদেশ থেকে এক নারীকে এনে নতুন হারেমে স্থান দিলেন? আপনার তত্ত্বাবধানে নাকি তাকে হারেমের অন্তঃপুরে রাখা হয়েছে?'

হংসীর অনেক চর আছে। তারাই নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে হংসীর কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই। কাজেই ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

হংসী বলল, 'যার জন্য এত আয়োজন, এমনকী নতুন হারেম পর্যন্ত নির্মাণ করা হল, তাকে দেখতে কেমন? হংসিনী, পদ্মিনী নাকি হস্তিনী নারী সে? তার স্তনযুগল কি বিম্বের মতো বর্তুলাকার, নাকি শঙ্খের মতো উন্নত? কটিদেশ কি খর্জুরপত্রর মতো ভাঁজযুক্ত নাকি ক্ষীণ? যোনিদেশ কি...।'

আরও কিছু কদর্য বাক্য হয়তো তাঁকে শোনাতে উদ্যত হয়েছিলেন সেই কদর্য নারী কিন্তু তার আগেই ভিক্ষচর বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে কোনও তথ্যই আমি বলব না।'

হংসী বললেন, 'বলবেন না কেন?'

ভিক্ষচর সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'রাজ-নির্দেশ।'

ইতিপূর্বে হংসী নানাভাবে রাজার কাছে জানতে চেয়েছে যে নতুন হারেম কার জন্য নির্মিত হচ্ছে? সে নারী কে? কোথা থেকে তাকে আনা হচ্ছে? কিন্তু এই একটা মাত্র ব্যাপার যেখানে রাজা নিশ্চুপ থেকেছেন। আর এর ফলে একটা শঙ্কা জেগেছে হংসীর মনে। সে নারী কি, তবে হংসী বা সোমলতার থেকেও বেশি সুন্দরী? সে কি তাদের থেকেও বেশি ছলাকলা জানে? তার যৌনতায় রাজা আকৃষ্ট হয়ে যদি হংসীকে আর আগের মতো গুরুত্ব না দেন, যদি খর্ব করেন হংসীর ক্ষমতা, তখন? এমন তো ঘটতেই পারে।

ভিক্ষচরের কথা শুনে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল হংসীর। সে বলল, 'আপনি তবে বলবেন না? মনে আছে তো আমার আদেশ পালন না করায় কীভাবে অপমান করেছিলাম মন্ত্রী শঙ্ককে? রজস্রাবের বস্ত্র উপহার দিয়েছিলাম তাকে।'

কথাটা কানে যেতেই মহামন্ত্রী ভিক্ষচরের মনে হল সে তরবারি কোষমুক্ত করে এখনই এই পাপিষ্ঠার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল নয়। কোনও দিন সুযোগ এলে নিশ্চয়ই তিনি কাজটা করবেন এই ভেবে নিয়ে ক্রোধ দমন করে ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'বললাম তো, রাজ-আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

হংসী সাপের মতো হিসহিস করে বলে উঠল, 'শোনো মহামন্ত্রী। যে নারী যত অপরূপাই হোক না কেন, আমার জায়গা আমি কাউকে নিতে দেব না। তার জন্য আমি যা ব্যবস্থা করার তাই করব। আর এদিকটা সামলে ওঠার পর তোমারও যথাযথ ব্যবস্থা আমি করব।'

হিংস্রভাবে কথাগুলোর পর খিলখিল করে হেসে সেই পাপিষ্ঠা বলল, 'শুনেছি তুমি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। ফলাহার করো, যৌনাচার করো না, এমনকী যৌন দৃশ্যও দেখা পাপ মনে

boierpathshala.blogspot.com

করো। তবে আজ রাতে যাতে তুমি সে দৃশ্য দেখতে বাধ্য হও সে ব্যবস্থা আমি করছি। আমি রাজাকে বলব যে আমি স্বপ্নাদেশ পেয়েছি আজ পূর্ণিমা তিথিতে মহামন্ত্রী যদি রাজার যৌনাচার প্রত্যক্ষ না করেন তবে কামশক্তি রহিত হবে মহারাজের। তুমি তো জানো এসব স্বপ্নাদেশ ইত্যাদিতে প্রচণ্ড বিশ্বাস রাখেন শ্রীনগর নরেশ। নিশ্চয়ই তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। বিশেষত যখন এই স্বপ্নাদেশ যৌনাচারের সঙ্গে জড়িত। কামদেবের নির্দেশ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। তখন চোখের সামনে যা ঘটবে তা আগামীকাল প্রত্যুষে আমাকে অবগত করবে তুমি। এটা আমার নির্দেশ।'—এই বলে সেই খল রমণী হাসতে হাসতে এগোল অন্দরমহলের দিকে।

লজ্জায়, অপমানে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে মহামন্ত্রী ভিক্ষচর ভাবতে লাগলেন, 'আর কত অপমান সহ্য করতে হবে আমাকে? এই পাপিষ্ঠাদের হাত থেকে মুক্তি নেই এ রাজ্যের?'

আর এর পরই মহামন্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল তাঁর সঙ্গে আসা লোকটা। সে প্রশ্ন করল, 'এই লজ্জাহীনা নারী কে? রাজমহিষী নাকি?'

মহামন্ত্রী জবাব দিলেন, 'না, না, এ নারী রানিমা নন। রানিমা অত্যন্ত বিদুষী ও লজ্জাশীলা। তিনি অন্তঃপুরের বাইরে আসে না। স্বামী আর সন্তান ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষকে দর্শন দেন না। আমরা চিকের আড়াল থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনি মাত্র। যে নারীকে দেখলে তার নাম হংসী। হারেমের এক নীচ প্রকৃতির নারী।'

ভিক্ষচরের কথা শুনে লোকটা বিস্মিত ভাবে বলল, 'হারেমের নারী! আপনি তো এ রাজ্যের মহামন্ত্রী তাই না? তবে সামান্য এক হারেমবনিতা আপনাকে এমন অপমান করার সাহস পায় কীভাবে? আমাদের দেশে তো একমাত্র রাজা ছাড়া অন্য কেউ মহামন্ত্রী বা প্রধান সৈন্যাধক্ষের মুখের ওপর কথাই বলতে পারে না। এমনকী রাজমহিষীও নন।'

ভিক্ষচর এবার বুঝতে পারলেন যে, হংসীকে শুধু দর্শনই নয়, তার কথাবার্তাও প্রত্যক্ষ করেছে এই আগন্তুক। অপমানের জ্বালাটা এবার তীব্র হয়ে উঠল মহামন্ত্রীর মনে। এই বিদেশি নিশ্চয়ই তার দেশে ফিরে গিয়ে জানাবে যে শ্রীনগর রাজ্যের মহামন্ত্রীর কোনও সম্মান নেই। হারেমের গণিকারাও তাঁকে প্রকাশ্য অপমানের স্পর্ধা রাখে। তাই বিদেশির প্রশ্ন শুনে নিজের মনের ক্ষোভ এবার আর চেপে রাখতে পারলেন না ভিক্ষচর। তিনি বলে উঠলেন, 'কামুক রাজা চক্রবর্মণ আত্মসমর্পণ করেছেন এই নীচ নারীর দেহ আর ছলাকলার কাছে। আরও একজন আছে, তার নাম সোমলতা। এই দুই ডোমরি নারীই এখন এ রাজ্যের সব কিছু পরিচালনা করে। বিশেষত এই হংসী। তার নির্দেশেই এখন রাজ-নির্দেশের সমতুল্য। সারা দেশে অন্ধকার নেমে এসেছে। ভয়ংকর জীবনযাপন করছে নাগরিকরা।'

লোকটা শুনে বলল, 'যে দেশে মহামন্ত্রীর এমন অবস্থা সেখানে দেশের বা সাধারণ নাগরিকদের জীবন যে দুর্বিষহ তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এর প্রতিবাদে বিদ্রোহ হয় না? নতুন কেউ সিংহাসন দখল করে না কেন?'

কথাটা শুনে মহামন্ত্রী বললেন, 'রাজাহত্যা না করে সিংহাসন দখল সম্ভব নয়। কিন্তু রাজা যত অন্যায়ই করুন না কেন রাজার হত্যাকারীকে কেউ মেনে নেবে না এ রাজ্যে। রাজহত্যা আমাদের রাজ্যের রীতিবিরোধী। এক যদি রাজা কোনও অসুখে বা দুর্ঘটনায় মারা যান তবে হয়তো বেঁচে যেতে পারে এ রাজ্য।'

boierpathshala.blogspot.com

বিদেশির কাছে কথাগুলো ক্ষোভে তিনি বলে ফেললেন ঠিকই, কিন্তু এরপরই তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। এ প্রসঙ্গে আর কোনও কথা না বলে লোকটাকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন ভিক্ষচর। তারপর তাকে নতুন হারেমের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিজের গৃহে ফিরে এলেন।

স্বপাক আহার গ্রহণ করেন ভিক্ষচর। তিনি রন্ধনের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। এমন সময় অশ্বখুরের শব্দ এসে থামল তাঁর দরজাতে। মহামন্ত্রী কক্ষের বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেলেন এক পরিচিত বার্তাবহককে। লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে মাথা ঝুঁকিয়ে মহামন্ত্রীকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'মহারাজ আপনাকে আজ সূর্যাস্তের পর নতুন হারেমে উপস্থিত থাকতে বলেছেন।'

সংক্ষিপ্ত বার্তা দিয়ে প্রস্থান করল লোকটা। মহামন্ত্রী বুঝতে পারলেন সেই নীচ নারী হংসীর মিথ্যা ভাষণে প্রভাবিত হয়েছেন মহারাজ।

৪

বার্তাবাহক চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন ভিক্ষচর। তারপর পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করলেন। তবে রন্ধন বা আহার করার প্রবৃত্তি আর তাঁর রইল না। লজ্জায়, অপমানে, ক্রোধে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। বংশপরম্পরায় তাঁরা এই শ্রীনগর রাজ্যের মন্ত্রী বা মহামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ভিক্ষচরের কয়েকজন পূর্বপুরুষ কখনও রাজার জীবনরক্ষায় অথবা দেশরক্ষার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর ভিক্ষচরও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীনগর রাজ্যের হিতার্থে দীর্ঘদিন ধরে কর্তব্য পালন করে আসছেন। তিনি দারপরিগ্রহণও করেননি এই জন্য যে, সংসার প্রতিপালনে যে সময় ব্যয় হয় তা তিনি রাজ্যের মঙ্গল সাধনায় ব্যয় করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া স্ত্রী-সন্তানের জন্য পিছুটান থাকলে অনেক সময় দেশের জন্য আত্মবলিদান সম্ভব হয় না। কোনওদিন নারীসঙ্গ করেননি পাছে নারীদেহের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে নিজ ভাবনা ও কর্তব্যচ্যুত হন। আর তাঁকেই কিনা হারেম গণিকার জঘন্য নির্দেশ মেনে চলতে হবে? রাজার রমণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হবে এক নীচ নারীকে? ভিক্ষচর ভাবতে লাগলেন, 'আমি কী পাপ করেছি যার জন্য বিধাতাপুরুষ এই নিষ্ঠুর পরিহাস করছেন আমার সঙ্গে?'

সময় এগিয়ে চলল। ভিক্ষচর যখন সেই বিদেশি বনচারীকে হারেমে পৌঁছে দিয়ে গৃহে ফিরেছিলেন তখন দ্বিপ্রহর। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল, সূর্যও একসময় ঢলতে শুরু করল পাহাড়ের আড়ালে। আলো কমে আসতে লাগল ভিক্ষচরের কক্ষে। সময় এগিয়ে আসছে। একসময় ভিক্ষচর প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন যে, না, তিনি সেই অনাচারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবেন না। তাতে যা হয় হবে। দরকার হলে আজ গভীর রাত্রেই তিনি শ্রীনগর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। কক্ষে প্রদীপ জ্বাললেন না মহামন্ত্রী। অন্ধকার কক্ষে বসে তিনি নিজের আর এ রাজ্যের দুর্দশার কথা ভাবতে লাগলেন।

উপত্যকা কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে গেল নিকষ কালো অন্ধকারে। তারপর ভিক্ষচর একসময় খেয়াল করলেন ঘরের অন্ধকার যেন মৃদু ফিকে হয়ে আসছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, পাহাড়ের মাথার ওপর চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক এই সময় একদল অশ্বারোহী ভিক্ষচরের দরজায় উপস্থিত হল। ভিক্ষচর কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলেন প্রধান সেনাপতি ভালুক

boierpathshala.blogspot.com

একদল সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি ভিক্ষচরকে দেখে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ হারেমে পৌঁছে গেছেন। আপনাকে সেখানে না দেখতে পেয়ে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য। মহারাজ যে হারেমে আপনাকে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন সে সংবাদ কি আপনি পাননি?'

মহামন্ত্রী বললেন, 'সংবাদ যথাসময় পেয়েছি। কিন্তু আমি যদি সেখানে না যাই তবে কী করবেন?'

প্রশ্ন শুনে একটু ইতস্তত করে প্রধান সেনাধ্যক্ষ ভালুক বললেন, 'রাজ-নির্দেশ অমান্য কীভাবে করি বলুন? আমি, আপনি সবাই তো তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আমাদের আপনাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে সেখানে।'

ভালুকের কথা শুনেও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন মহামন্ত্রী ভিক্ষচর।

ভালুক তাঁর সেনাদের তফাতে রেখে ঘোড়া থেকে নেমে ভিক্ষচরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভিক্ষচর বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'এবার আমাকে রজ্জুবদ্ধ করবেন তো? করুন। তবে আমি আপনাকে বলি যে কেন আমাকে রাজা হারেমে উপস্থিত হতে বলেছেন। আমাকে তাঁর যৌন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং তার বিবরণ দিতে হবে হংসীকে। সেই পাপিষ্ঠার প্ররোচনাতেই মহারাজ সেই জঘন্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাতে চাইছেন।'

তাঁর কথা শুনে প্রধান সেনাধ্যক্ষ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ব্যাপারটা যে এ ধরনের কিছু তা আমিও অনুমান করেছিলাম।' তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'ওই পাপিষ্ঠার দ্বারা আমরা কেউই কম অপমানিত হইনি। আমাকে ঘোড়ার পিঠে তার পাদুকা বহন করতে হয়েছে। অপমানবোধ আমারও কম নেই। কিন্তু আমি সুযোগের প্রত্যাশাতে আছি। আপনি প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ। একবার শুধু ভেবে দেখুন। কোনওদিন সে সুযোগ উপস্থিত হতে পারে। তখন আপনার মতো বিচক্ষণ, এ রাজ্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিকেই আমাদের অভিভাবক হিসাবে প্রয়োজন হবে এ রাজ্যে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য। দোহাই আপনার, ক্রোধের বশে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না যার জন্য সে সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। আপনার মৃত্যুদণ্ড হলে বা আপনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে শয়তানী হংসীর ক্ষমতা আরও বাড়বে। ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে শ্রীনগর রাজ্যে। নরককুণ্ডে পরিণত হবে এ রাজ্য।'

মহামন্ত্রী বললেন, 'এ রাজ্যে অন্ধকার কি কোনওদিন সত্যি কাটবে? আমাকে কি আর প্রয়োজন হবে?'

ভালুক বললেন, 'কে বলতে পারে প্রয়োজন হবে না? রাজপুত্র এখনও সিংহাসন সামলানোর পক্ষে অনুপযুক্ত। সে সিংহাসনে বসলেও এই রাজ্যের দায়িত্ব আপনাকেই সামলাতে হবে। আমি আর আমার সেনাদল আপনার পাশে থেকে এ রাজ্য থেকে অন্যায় ব্যভিচার উৎখাত করব। কে বলতে পারে তেমন দিন আসবে না। একটু আগেই তো চারপাশে অন্ধকার ছিল, আর এখন কেমন সুন্দর চাঁদের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটা ঘটনার প্রতীক্ষা তো মাত্র। রাজা যেমন ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছেন তাতে যে-কোনওদিন তিনি প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁর মুখমণ্ডল, চেহারা যে বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে তা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন? প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, বজ্রপাত হতে পারে, ঘোড়া পাগল হয়ে তাঁকে নিয়ে খাদে ঝাঁপ দিতে পারে, আরও কতরকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। এমনকী আর কিছুদিন পর হয়তো রাজপুত্র সাবালক হয়ে পিতার অন্যায়ের প্রতিকার করলেন। সে

boierpathshala.blogspot.com

দিনের জন্য আমরা কি অপেক্ষা করব না? সেদিন আমরাই যদি না থাকি তবে এ রাজ্যের কী হবে? আমরা কি শুধু বর্তমান নিয়েই ভাবব? ভবিষ্যতের প্রতি কি আমাদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই?'

সেনাধ্যক্ষ ভালুকের বলা কথাগুলো, বিশেষত শেষ কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন ভিক্ষচর। হ্যাঁ, ভবিষ্যতের প্রতিও তো তাঁর দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। এই শেষ ব্যাপারটাই তাঁর মত পরিবর্তন ঘটাল। ভিক্ষচর বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন তবে।'

ভালুক হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে কথা দিলাম, যদি তেমন কোনও মুহূর্ত উপস্থিত হয় তবে সর্বতভাবে আমি আপনার পাশে থাকব।'

ভিক্ষচর এরপর ভালুক আর তাঁর সেনাদলের সঙ্গে চাঁদের আলোতে রওনা হয়ে গেলেন হারেমের দিকে।

একসময় সেখানে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাথার ওপর উঠে গেছে। হারেমের প্রবেশ তোরণ মশালের আলোতে আলোকিত। খোজা দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মহারাজের একদল দেহরক্ষীও স্বর্ণ শিবিকা নিয়ে তোরণের একপাশে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ হারমে প্রাকারের অন্তরালে রয়েছেন রাজা চক্রবর্মণ। সেনাপতি ভালুক মহামন্ত্রী ভিক্ষচরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেও হারেম প্রাকারের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার তাঁরও নেই। হারেমের তোরণে তাঁরা দুজন ঘোড়া থেকে নামার পর ভালুক বললেন, 'আমি এখানেই রইলাম। মধ্যরাত বা প্রত্যুষ যাই হোক না কেন, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। একত্রে ফেরা যাবে।'

ভিক্ষচর জবাব দিলেন, 'ধন্যবাদ। তাই হবে।'

ভিক্ষচর তোরণের সামনে পৌঁছতেই তাঁকে দেখে তোরণ উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। তারপর কয়েকজন খোজা তাঁকে নিয়ে চলল নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। সে লোকগুলো ভিক্ষচরকে কিছু না বললেও তাদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে ভিক্ষচরের মনে হল তারা যেন বেশ আমোদ পাচ্ছে এ স্থানে ভিক্ষচরের উপস্থিতির কারণে। এ রাজ্যের অন্য আরও অনেকের মতো এ লোকগুলোও সম্ভবত জানে যে মহামন্ত্রী সারা জীবন নারীসঙ্গ করেননি। সন্ন্যাসীই বলা যায় মহামন্ত্রীকে। আর তিনিই কিনা আজ হারেমে এসে উপস্থিত হয়েছেন যৌন দৃশ্য দেখার জন্য।

থরে থরে গোলাপ ফুটে আছে বাগিচাতে। তার সুবাসে মাতোয়ারা বাতাস। আকাশে গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছে। তার আলো যেন চুঁইয়ে পড়ছে উপত্যকায়, পর্বতশৃঙ্গ বেয়ে। এত সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ এর আগে কোনওদিন দেখেননি মহামন্ত্রী। মনে মনে তিনি বললেন, 'কী সুন্দর এই প্রকৃতি! কী সুন্দর এই দেশ! কিন্তু এর আড়ালে সামনের ওই বিশাল মহলের অন্তঃপুরে কী কদর্য ঘটনা ঘটে চলেছে কে জানে?'

খোজাদের সঙ্গে হারেমে প্রবেশ করলেন ভিক্ষচর। বেশ কয়েকটা মহল, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি উপস্থিত হলেন স্বর্ণখচিত সেই সম্ভোগ মণ্ডপের সামনে। তার চারপাশ বর্তমানে রেশমের পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। তার ভিতরে অন্য কিছু বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও উজ্জ্বল প্রদীপের অবস্থান স্পষ্ট। মৃদু একটা শব্দও যেন ভেসে আসছে আচ্ছাদনের ওপাশ থেকে। পর্দার সমানে এসে দাঁড়ালেন ভিক্ষচর। ভিতরে ঢোকার আগে তিনি মুহূর্তের জন্য হয়তো ইতস্তত বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁকে আর কোনও চিন্তার অবকাশ না দিয়ে একজন খোজা পিছন থেকে ধাক্কা দিল। পর্দার গায়ে একটা ফাঁক গলে মণ্ডপের ভিতর প্রবেশ করলেন ভিক্ষচর।

boierpathshala.blogspot.com

মণ্ডপের ভিতর প্রদীপদানে বেশ কয়েকটা বড় বড় ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। তার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে মণ্ডপের স্বর্ণখচিত স্তম্ভে, ছাদে। ঝলমল করছে চারপাশ। মণ্ডপের ঠিক কেন্দ্রস্থলেই অনুচ্চ রমণবেদি। মহামন্ত্রী ভিক্ষচর সেখানেই দেখতে পেলেন সেই নারী ও রাজা চক্রবর্ণমকে। দুজনের দেহই সম্পূর্ণ নিরাবরণ, একটা সুতোও কারও গায়ে নেই। মিথুনবেদিতে দণ্ডায়মান দুজনেই। সামনে নারী, পিছনে উলঙ্গ রাজা। যুবতীর নিতম্ব আঁকড়ে ধরে পশ্চাৎভাগে মিথুনরত রাজা চক্রবর্মণ। যৌন উত্তেজনাতে নারী-পুরুষ দুজনেই কাঁপছে। সুন্দর দৃশ্যের মতো কুৎসিত দৃশ্যেরও নাকি মানুষকে মোহাবিষ্ট করার ক্ষমতা থাকে। তাই হয়তো বা ভিক্ষচর সে দৃশ্য থেকে চোখ সরাতে গিয়েও পারলেন না। তিনি চেয়ে রইলেন সেই সঙ্গম দৃশ্যের দিকে।

উলঙ্গ রাজার অবশ্য কোনও হুঁশ নেই, তিনি রমণক্রিয়ায় ব্যস্ত। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে তাঁর। কাম তাঁর সব সত্তাকে গ্রাস করেছে। ভিক্ষচরও যেন অনেকটা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েই দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। ক্রমশ যৌন উত্তেজনায় যেন শরীরের কম্পন বেড়েই চলেছে তাদের। এমন রমণদৃশ্য এর আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা তা জানা নেই মহামন্ত্রী ভিক্ষচরের। তাঁর মনে হতে লাগল অনন্তকাল ধরে যেন এই মিথুন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে চলেছেন তিনি। এ দৃশ্যের কোনও শুরু নেই, শেষ নেই।

কিন্তু এ দৃশ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটল এক সময়। এবং তা অদ্ভুত ভাবেই। হঠাৎই যেন উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে প্রচণ্ড কেঁপে উঠল সঙ্গমরত সেই নারী-পুরুষ দুজনের শরীরই। আর তারপরই রাজা চক্রবর্মণের দেহটা প্রচণ্ড গতিতে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে আছড়ে পড়ল একটা স্তম্ভের গায়ে!

মহামন্ত্রী ভিক্ষচরের সম্বিত ফিরতে কিছুটা সময় লাগল। তারপরই তিনি ছুটে গেলেন মাটিতে পড়ে থাকা রাজার কাছে। তখন আর প্রাণ নেই শ্রীনগর নরেশ চক্রবর্মণের শরীরে। স্তম্ভের গায়ে আছড়ে পড়ার সময় সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর মাথা। মস্তিষ্ক ছড়িয়ে আছে চারপাশে রক্তের স্রোত বইছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কাশ্মীর নরেশ চক্রবর্মণের। ভিক্ষচর তাকিয়ে রইলেন সেই ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে।

মহামন্ত্রীর হুঁশ ফিরল একটা কণ্ঠস্বর শুনে—'স্তম্ভে আঘাত না লাগলেও মৃত্যু ঘটত রাজার। কারণ তাঁর বক্ষপিঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে না হলেও রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মৃত্যু হত তাঁর। অথবা খুব বেশি হলে আর একটা দিন মাত্র তিনি জীবিত থাকতেন।'

কথাটা শুনে মহামন্ত্রী ভিক্ষচর তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেই বিদেশি। তার ঠোঁটের কোণে জেগে আছে আবছা হাসির রেশ!

মহামন্ত্রী ভিক্ষচর তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি জানতেন যে এই দুর্ঘটনা ঘটবে?'

শিবিকার সঙ্গে আসা সেই লোকটা জবাব দিল, 'সম্ভবত।'

ভিক্ষচর জিগ্যেস করলেন, 'তবে, আপনার দেশের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদিত যে চিত্র আমরা দেখেছিলাম তা কি মিথ্যা ছিল? তার মধ্যে কি লুকিয়ে ছিল মৃত্যুর ইঙ্গিত? সে চিত্র কি তবে মিথ্যা ছিল?'

লোকটা জবাব দিল, 'না, ঠিক তা নয়। তবে শিল্পী শুধু সেই মিথুন দৃশ্যই খোদিত করেছিলেন মন্দিরে। সতর্কবার্তা সেই চিত্রে খোদিত ছিল না। তবে আমি তা জানতাম। এ নারী যখন যৌন আনন্দের চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছয় তখন উত্তেজনায় পদাঘাত করে। আপনাদের রাজাকে তার সঙ্গে সঙ্গম প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলেও এই শেষ কথাটা তাঁকে

boierpathshala.blogspot.com

জানাইনি আমি। জানাইনি যে চূড়ান্ত উত্তেজনার পূর্বমুহূর্তে এই নারীর কাছ থেকে দূরে সরে আসতে হয়। কারণ এ নারী চূড়ান্ত উত্তেজিত হলে পাদঘাত করে।'

মহামন্ত্রী ভিক্ষচর জানতে চাইলেন, 'তবে সে কথা আপনি রাজাকে জানাননি কেন?'

ভিক্ষচরের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সেই বিদেশি জবাব দিল, 'জানাইনি, কারণ, আমি এটা চেয়েছিলাম। শ্রীনগর নরেশকে অতিথি হিসাবে বিশ্বাস করে অতিথিরূপে বরণ করেছিলাম আমি। কিন্তু তিনি তার মর্যাদা রক্ষা করেননি। গভীর রাতে পুষ্পচয়নরত রাজ-মহিষীকে একলা পেয়ে কামুক নৃপতি তাঁকে ধর্ষণ করেন। মহিষীর সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই আমি এখানে ছুটে এসেছিলাম। মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে আমার। আজ রাতেই আমি সঙ্গীদের নিয়ে নিজের দেশে ফেরার জন্য যাত্রারম্ভ করব।'

বিস্মিত ভিক্ষচর এবার জানতে চাইলেন, 'আপনার পরিচয় কী?'

সেই বিদেশি জবাব দিল, 'আমি চান্দেলরাজ মহীতপ।'

হতভম্ভ ভিক্ষচর বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

চান্দেলরাজ মহীতপ এরপর মৃদু হেসে বললেন, 'যে কেউ মানবেন এটা হত্যা নয় দুর্ঘটনা। এমনই কোনও দুর্ঘটনার প্রতীক্ষাতে তো আপনারাও ছিলেন। শ্রীনগরনরেশ মৃত। আপনি এখন তাঁর অবর্তমানে এই রাজ্যের অভিভাবক। আজ রাত থেকেই নিজের কার্য সম্পাদন করুন।'

কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে বুঝতে পেরে খোজা প্রহরীরা এরপর প্রবেশ করল মণ্ডপে। রাজার মৃতদেহ দেখে ব্যাপারটা যে হত্যা নয়, দুর্ঘটনা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল তারা। মহামন্ত্রী ভিক্ষচরই রাজার অবর্তমানে তাদের মালিক। চান্দেলরাজকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হারেম প্রাকারের বাইরে বেরিয়ে এলেন ভিক্ষচর। চান্দেলরাজ বিদায় নিলেন ভিক্ষচরের কাছ থেকে। বহু দূর দেশে তাঁকে ফিরতে হবে। তিনি চাঁদের আলোতে মিলিয়ে যাবার পর ভিক্ষচর সেনাপতি ভালুককে নিয়ে ছুটলেন তাঁর প্রথম কর্তব্য সম্পাদনের জন্য, হংসী আর সোমলতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে।

মহা সমারোহে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হল শ্রীনগররাজ চক্রবর্মণের। তাঁর নাবালক পুত্রকে বসানো হল সিংহাসনে। তাকে সামনে রেখে মহামন্ত্রী ভিক্ষচরের নেতৃত্বে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীনগর রাজ্যে। সেদিন রাতে নতুন হারেমের অভ্যন্তরে পূর্ব পরিকল্পিত যে ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিল তার সম্বন্ধে জানল না বাইরের পৃথিবীর কেউ।

রাজদরবারে নানা লোক নানা কাজে আসে। তেমনই একবার একটা লোক এসেছিল। পেশায় শিকারি সে লোকটা পার্বত্য উপত্যকায় শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কী একটা কথা প্রসঙ্গে সে একবার ভিক্ষচরকে গল্প করেছিল যে নির্জন পাহাড়ি উপত্যকায় চাঁদের আলোতে সে নাকি একটা বিরাট ঘোড়াকে একলা ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল। জ্যোৎস্না নাকি চুঁইয়ে পড়েছিল তার সাদা অঙ্গ বেয়ে। থুড়ি সে ঘোড়া নয়, ঘোটকী।

boierpathshala.blogspot.com

প্রস্তর ঘাতক

boierpathshala.blogspot.com

দিবাকরদা যে ঘরে বসে আছেন ঈশান সে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একদম সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছেন দিবাকরদা। ডান হাতে স্কচের গ্লাস, বাঁ-হাতের মুঠোর মধ্যে বেশ কায়দা করে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট। চারপাশে আট-দশজন আয়োজক। তাদের মুখ থেকে নিজের স্তুতি শুনছেন দিবাকরদা। এক ভদ্রলোক তাঁর উদ্দেশে বললেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আপনি যে এতদূর ছুটে আসবেন তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। অনুষ্ঠানটা আমরা ভোপালে বা সাতনায় করতেই পারতাম কিন্তু এখানে করলাম কারণ, আপনার মতো গুণী মানুষ যাঁরা আসছেন তাঁরা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এই খাজুরাহোটাও ঘুরে দেখতে পারবেন।

লোকটার কথা শুনে দিবাকরদা মৃদু হেসে বললেন, 'তাহলে লোভ দেখিয়ে টেনে আনলেন বলছেন? এ জায়গা কিন্তু আমার দেখা। বছর কুড়ি আগে আমরা কয়েকজন লেখক বন্ধু মিলে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। সে অর্থে এ জায়গা আমার কাছে পরিচিত। এখানে একটা সুর সুন্দরীর মূর্তি আছে না, যে নৃত্যের ভঙ্গিমায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা থেকে কাঁটা তুলছে? মনে আছে আমার। এখানে তো অনেক মন্দির আছে! হিন্দু মন্দির, জৈন মন্দির।'

তাঁর কথা শুনে ভদ্রলোক একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, হ্যাঁ, পার্শ্বনাথের মন্দিরের গায়েই অমন মূর্তি আছে। আমি আসলে ঠিক আপনার কথা বলতে চাইনি। আপনি এত বড় সাহিত্যিক। আপনি যে দেশবিদেশের সর্বত্র ঘুরেছেন, এই খাজুরাহো আপনার নিশ্চয়ই দেখা থাকবে। আসলে অন্য এমন অনেকে আসবেন যাদের এ জায়গা দেখা নেই।'

দিবাকরদা লোকটার কথার প্রত্যুত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঈশানকে দেখতে পেয়ে হুইস্কির গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরে প্রথমে বললেন, এসো, এসো, বসে পড়ো। লজ্জা কোরো না। আরও একটা গ্লাস আছে।' তারপর অন্যদের উদ্দেশে বললেন, ঈশান কিন্তু খুব ভালো লিখছে। আমরা আর কতদিন লিখব, ওরাই এখন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। তাই আপনারা যখন কোনও তরুণ লেখককে সঙ্গে আনার কথা বললেন, তখন ওর কথা আমার মথায় এল। আপনারা কেউ পড়েছেন ওর লেখা?

একটা নিস্তব্ধতাই ঈশানকে বুঝিয়ে দিল তারা পড়েনি। অবশ্য পড়ার কথাও নয়, আসলে প্রথমত কলকাতার সব বাংলা কাগজ এখানে আসে না। তাছাড়া মাত্র বছর চারেক লিখতে শুরু করেছে ঈশান। মাত্র তিনটে বই তার। কলকাতায় তার লেখা কিছুটা পরিচিতি পেলেও এত তাড়াতাড়ি এত দূরে তার নাম ছড়াবে তা ঈশান আশা করে না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘরের লোকগুলো ঈশান যাতে ব্যাপারটাতে অপ্রস্তুত না হয় সে জন্য তার লেখা পড়েছে কিনা সে জবাব না দিয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন।'

এখানে আসার পর ভোপালের বঙ্গভাষী সমিতির আয়োজকরা ঈশানের প্রতি আতিথেয়তার ত্রুটি না রাখলেও ঈশানের নিজের মনের ভিতর কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছে। তার খালি মনে হচ্ছে নিজের যোগ্যতায় নয়, দিবাকরদার সঙ্গী বলেই সবাই খাতির করছে তাকে। আরও অনেক অতিথি অভ্যাগত এসেছেন এই সাংস্কৃতিক বঙ্গ সম্মেলনে। তাদের কেউ চিত্রকর, কেউ নাট্যকর্মী, কেউ অধ্যাপক, কেউ বা নৃত্যশিল্পী। এই রিসর্টেই নানা ঘরে তাঁরা আছেন। কিন্তু নাম আর খ্যাতির বিচারে উদ্যোক্তাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু দিবাকরদাই। আর দিবাকরের আলোকছটা ঈশানের গায়েও লাগছে। তাই উদ্যোক্তারা তাকেও খাতির করছে।'

boierpathshala.blogspot.com

দিবাকরদা ও অন্যদের কথা শুনে ঈশান বলল, 'না, না, আপনারা বরং গল্প করুন। জানলা দিয়ে দেখলাম কিছুটা দূরে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ওদিকটায় একবার দেখে এলে অসুবিধা হবে?'

একজন লোক, সম্ভবত স্থানীয় কেউ হবেন, তিনি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আটটা বাজে। রাত হলেও এখানে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। চোর-ডাকাতের ভয় নেই। ওটাই কান্তরিয় শিব মন্দির। যেতে পারেন। তবে কাল তো দুপুরে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু, সকালবেলায় আপনাদের এখানকার প্রধান মন্দিরগুলো ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাইডও থাকবে সঙ্গে। সব বুঝিয়ে দেবে।

ঈশান বলল, 'তখন তো দেখবই ভালো করে, আসলে দেখলাম বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে। মন্দিরটাও দেখা যাচ্ছে, তাই ভাবলাম...তার কথা শেষ হতে না হতেই দিবাকরদা হেসে বললেন, 'যাও তবে ঘুরে এসো, বুঝতে পারছি তোমার আর ওসব দেখার তর সইছে না। তোমার বয়সে আমি যখন এসেছিলাম তখন আমারও এমন আগ্রহ ছিল ওই মূর্তিগুলো নিয়ে। বহুদিন ধরে শুনতাম ওদের কথা। দেখে এসো, তারপর স্বপ্নে আহ্বান করো ওদের।' এই বলে চোখ মটকালেন তিনি।

তাঁর কথা শুনে একটা চাপা হাসির রেখা খেলে গেল উপস্থিত সকলের ঠোঁটের কোণে। দিবাকরদার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। এই খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর গায়ে অসংখ্য মিথুনমূর্তি আছে। অনেকে সেই মূর্তিগুলোর টানেই এখানে ছুটে আসেন। বসনহীন নারী-পুরুষের মূর্তি সব। এ ব্যাপারটা না দেখলেও শোনা আছে ঈশানের। এখানে আসার পর এক ফাঁকে একটা পোস্টকার্ড বুক কিনেছে ঈশান। তাতেও ছবি আছে তেমন কিছু ভাস্কর্যের। দিবাকরদার মুখে এতগুলো লোকের সামনে একথা শুনে বেশ লজ্জা পেল ঈশান। সে আর কথা না বলে এগোল রিসর্ট ছেড়ে বাইরে বেরোবার জন্য। রিসর্টের গেটে দাঁড়িয়ে ছিল সিকিউরিটির একজন লোক। বাইরে বেরোবার আগে ঈশান তবু তাকে একবার বলল, 'ওই যে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছি, কোনও অসুবিধা হবে না তো?'

লোকটা হিন্দিতে জানাল, 'না, কোনও অসুবিধা নেই, রাতে মাঝে মাঝে পুলিশ পেট্রল হয়। তারা জিগ্যেস করলে বলবেন আপনি এখানে উঠেছেন। আপনার গলায় আইডেন্টিটি কার্ড তো ঝুলছেই। কোনও সমস্যা হবে না। ওই কাণ্ডারিয় মন্দিরেই একমাত্র পুজো হয়। তবে মন্দিরের পুরোহিত সন্ধ্যারতি শেষ করে এতক্ষণ মনে হয় চলে গেছেন। যান দেখে আসুন। লোকটার কথায় আশ্বস্ত হয়ে রিসর্ট ছেড়ে বাইরে বেরোল ঈশান।

শীতের রাত। ফাঁকা রাস্তা। ট্যুরিস্টপার্টি যারা খাজুরাহো দেখতে এসেছিল তারা হয় ফিরে গেছে অথবা হোটেল রিসর্টে কম্বলের তলায় রাত্রিবাস করছে। কুয়াশা নামতে শুরু করলেও চাঁদের আলোতে মোটামুটি সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন সব মন্দিরের চুড়ো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওইভাবেই চাঁদের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কাণ্ডারিয় মন্দির রিসর্ট থেকে যত কাছে মনে হয়েছিল ঠিক তত কাছে নয়। নির্জন পথে হাঁটতে মন্দ লাগছিল না ঈশানের। এক সময় পিছনের হোটেল রিসর্ট থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল। মিনিট পনেরো চলার পর মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছতেই ঈশানের সামনের সব কিছু হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঈশান। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। আসলে একটা কুয়াশার চাদর হঠাৎই যেন নেমে এসেছে মন্দিরের চারপাশে, তাই কুয়াশার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য মন্দিরটা। গায়ে চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কুয়াশা ভেদ করে সামনে এগোতে লাগল ঈশান। আর তারপর সামনের কুয়াশার পর্দা যেন কেটে গেল। ঈশান

boierpathshala.blogspot.com

দেখতে পেল সুবিশাল প্রাচীন এক মন্দিরের বেদিমূলে এসে দাঁড়িয়ে সে। প্রাচীন পাথরের তৈরি সোপানশ্রেণি তার সামনে থেকে উঠে গেছে বেদির ওপর। আর সেখান থেকে মন্দিরগাত্র পর্বতমালার মতো ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো উঠে গেছে চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে। মন্দিরের গায়ে চাঁদের আলোতে জেগে আছে অসংখ্য ভাস্কর্য, অলংকরণ, মূর্তি। অদ্ভুত সুন্দর হাজার বছরের প্রাচীন এক মন্দির। খাজুরাহোর কাণ্ডারিয় মন্দির। চান্দেলা রাজবংশের অতুলনীয় কীর্তি।

অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধর মতোই সোপানশ্রেণি বেয়ে ওপরে উঠে এল ঈশান। মন্দিরের ভিতর থেকে কোনও আলো ভেসে আসছে না, কোথাও কোনও লোকজন নেই। শুধু ঘি আর ধূপমিশ্রিত মৃদু সুবাস ছড়িয়ে আছে বাতাসে। রিসর্টের সেই লোকটা সম্ভবত ঠিকই বলেছিল। সন্ধ্যারতি শেষ করে পূজারি মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগে। উঁচু বেদি থেকে একবার দূরে চারদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল ঈশান। কিন্তু কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে কুয়াশাবৃত্তের আড়ালে যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন মন্দিরটা। মাথার ওপর পূর্ণচন্দ্র যেন শুধু ওপর থেকে মায়াবী আলো ফেলছে মান্দিরের ওপরেই। গর্ভগৃহ অন্ধকার হলেও মন্দিরের শীর্ষবিন্দু থেকে বেদি পর্যন্ত বহিঃগাত্রের সব কিছু স্পষ্ট দৃশ্যমান।

ঈশানের কিছুটা তফাতেই বেদিমণ্ডপে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক শার্দূল মূর্তি। বিভিন্ন পশুপাখির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে প্রাচীন ভাস্করের দল রচনা করেছিল সেই কল্পিত শার্দূল। ঈশান তার কাছে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল মূর্তিটাকে। সত্যিই কী অসম্ভব সুন্দর কল্পনা ছিল সে সময়ের শিল্পীদের! তারপর সে ধীর পায়ে প্রদক্ষিণ শুরু করল মণ্ডপ। বয়সের ভারে কিছু কিছু মূর্তি ভেঙে গেলেও মহাকাল তার থাবা সম্পূর্ণ বসাতে পারেনি এই মন্দিরের ওপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত ঝড় জলকে উপেক্ষা করে, মহাকালকে অগ্রাহ্য করে আজও মন্দির গাত্রে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ভাস্কর্যগুলো। চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারা যেন হাসছে। ঈশান ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যগুলো। অসংখ্য দেবদেবী, সুরসুন্দরী, অপ্সরা, যক্ষ, জীবজন্তুর মূর্তি ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আর আছে বিভিন্ন ভঙ্গিমার অগুনতি মিথুনমূর্তি। চাঁদের আলোতে তারা সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা যেন কেউ পাথরের তৈরি নয়, রক্তমাংসের মানুষ সব! ঈশান অবাক হয়ে ধীরে ধীরে দেখতে লাগল সেসব।

প্রাচীন শিল্পীরা সেসময়ের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের চিত্রও খোদিত করে গেছেন মন্দির গাত্রে। বিশেষত নারীদের অঙ্গ সজ্জার দৃশ্য। ঘুরতে ঘুরতে তেমনই এক দৃশ্যের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল ঈশান। দেওয়াল-গাত্রে খোদিত সেই ছবিতে এক অপরূপা সুরসুন্দরী বসে আছে। তার এক পা বুকের কাছে, অন্য পা সামনে প্রশস্ত। সে-পায়ে মল পরিয়ে দিচ্ছে একজন পরিচারিকা। অন্য দুজন পরিচারিকার একজন তাঁর কবরীবন্ধনে ব্যস্ত, আর একজন তার সামনে দর্পণ ধরে আছে। সেই সুরসুন্দরীর দেহসৌষ্ঠব যেন ম্লান করে দিচ্ছে আকাশের চন্দ্রিমাকে। কবরীবন্ধন আর মল পরানো শেষ হলেই উঠে দাঁড়াবে উন্নত বক্ষদেশ ম্লান কটির সেই অপরূপা। মূর্তিটার দিকে স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে ঈশান ভাবছিল, কীভাবে ভাস্কররা কল্পনা করত এই সব নারীদের! এরা কি সত্যিই ছিল? এই যে দেওয়ালগাত্রে খোদিত এত নারী। মূর্তি, মিথুনরত নারীমূর্তি এ সবই ছিল কি নিছক প্রাচীন শিল্পী ভাস্করদের কল্পনা, নাকি সত্যিই একদিন রক্তমাংসের ছিল এই নারীরা? নইলে কীভাবে এত জীবন্তভাবে তাদের রচনা করলেন সে সময়ের শিল্পীরা?

boierpathshala.blogspot.com

'মগধ, মালব, কামরূপ, বঙ্গ-সমতট থেকে বিশেষ শারীরিক লক্ষণযুক্ত নারীদের সংগ্রহ করে আনা হত এখানে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে আবার পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হত কাদের সুরসুন্দরী বা দেবদাসী বানানো হবে। যাদের দেখে মূর্তি নির্মাণ করতেন ভাস্করের দল।'—কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে ফিরে তাকাল ঈশান। যেন মনে মনে নয়, ঈশান প্রশ্নটা কাউকে করেছিল, আর সে তার জবাব দিল! ঈশানের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা। শাড়ির ওপর শাল জড়ানো। শালের অবগুণ্ঠনের আড়ালে চন্দ্রালোকে তার মুখমণ্ডল যতটুকু দৃশ্যমান, তাতে তাকে যুবতী বলেই মনে হয়। এই নির্জন মন্দিরপ্রাঙ্গণে এত রাতে একাকী তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল ঈশান। কোথা থেকে এলেন এই মহিলা? তারপর তার মনে হল তিনিও হয়তো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন। যখন তিনি বাংলায় কথা বলছেন। আর তাকে দেখে অবাক হবার কিছু নেই। আর মেয়েরা এখন অনেক সাহসী। ঈশান নিজে যদি এত রাত্রে একলা এখানে মন্দির দেখতে আসতে পারে তবে সে-ও আসতে পারবে না কেন?

ঈশান প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে একটু ইতস্তত করে তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'ওই যে বঙ্গ সমতট।'

ঈশান বলল, 'আমার নাম ঈশান। একটু-আধটু লেখালেখি করি। আপনি?'

মহিলা জবাব দিলেন, 'আমার নাম সোমদত্তা। এ মন্দির যে সময় তৈরি হয়েছিল সে সময় হলে আমাকে "নটী" বলত, এখন বলা হয় "নর্তকী"। বেশ জবাব দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা। ঈশান এবার হেসে ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি, কলকাতা থেকে একটা ডান্সট্রুপ এসেছে। যদিও তাদের কারো সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। আপনার সঙ্গেই প্রথম আলাপ হল। এত রাতে একলা এখানে আপনার ভয় করছে না?'

মুহূর্তের জন্য যেন প্রশ্নটা শুনে চুপ হয়ে গেল সোমদত্তা। তারপর কুয়াশার পর্দা ভেদ করে দূরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি ভয় যে করছে না তা নয়, তবে আপনাকে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। চলুন মন্দিরটা এবার ঘুরে দেখা যাক।'

ঈশান বলল, 'হ্যাঁ, চলুন।'

ধীর পায়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করা শুরু করল তারা দুজন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সব মূর্তি। তার মধ্যে অধিকাংশই সব মিথুনমূর্তি, অথবা স্বল্পবসনা বা বিবসনা নারীমূর্তি। সুন্দর মুখশ্রী, কোমলবাহু, ঘন সন্নদ্ধ স্তনদ্বয়, মাংসল উদরে গভীর নাভিকূপ, ক্ষীণ কটিদেশের নারীমূর্তিগুলো যেন তাকিয়ে দেখছে তাদের দুজনকে। সঙ্গে মহিলা থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় ঈশানের যে একটা মৃদু অস্বস্তি হচ্ছিল না তা নয়, তবে চুপচাপ মূর্তিগুলো দুজন মিলে ঘুরে দেখতে দেখতে সে অস্বস্তি এক সময় কেটে গেল। ক্রমশ মন্দির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করল তারা দুজন। মন্দিরের গর্ভগৃহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির। তার ভিতর আছে অসংখ্য দেবদেবী লক্ষ্মী গণেশ-নারায়ণ ইত্যাদির মূর্তি, স্তম্ভগাত্রে খোদিত আছে শৃঙ্গার দৃশ্য। ঈশান খেয়াল করল সম্ভবত ভদ্রমহিলার পায়ে মল বা নূপুর পরা আছে। মাঝে মাঝে মৃদু ঠুং টাং শব্দ হচ্ছে। এতবড় মন্দির চত্বরে শব্দ বলতে শুধু ওইটুকুই। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর মৌনতাভঙ্গ করার জন্য ঈশান বলল, 'অদ্ভুত সুন্দর মন্দির। এসব ভাস্কর্য কোনারক মন্দিরে কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু শুনেছি আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। কারা কেন দেবালয়ে তৈরি করল এসব মূর্তি?' শেষ বাক্যটা স্বগতোক্তির স্বরেই বলল ঈশান।

boierpathshala.blogspot.com

সোমদত্তা বেশ স্পষ্টভাবে বলল, আপনি ওই মিথুনমূর্তিগুলোর কথা বলছেন তো। দেবালয়ে মিথুনমূর্তি নির্মাণের পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ ছিল। সেসময় মানুষের বিশ্বাস ছিল মন্দিরে মিথুনমূর্তি থাকলে বজ্রপাত হয় না। বজ্র স্পর্শ করে না মিথুনরত নারী-পুরুষকে। আবার কেউ কেউ বলেন ওই যুগল মূর্তিগুলোর মিলনের মধ্যে দিয়ে দেহের সঙ্গে আত্মার মিলনকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া সেসময়ের ভাস্কর-শিল্পীরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে গোপন রাখতে চাননি। তা খোদিত করে গেছেন মন্দিরগাত্রে। এক সময় চান্দেল রাজাদের রাজধানী ছিল এই মন্দির নগরী খাজুরাহো। আর এই কাণ্ডারিয় মহাদেব মন্দির-নির্মাণ করিয়েছিলেন মহারাজ বিদ্যাধর। কী আমি ঠিক বলছি তো?'

ঈশানের খাজুরোহো নিয়ে তেমন কোনও পড়াশোনা নেই। তবে সঙ্গিনীর কথা শুনে কেন জানি তার মনে হল এ কথাগুলো তার জানা, যে গাইডবুকটা সে কিনেছিল তাতে একবার ঈশান চোখ বুলিয়েছিল। হয়তো-বা সেখানেই লেখা ছিল এই কথাগুলো। তবে মেয়েটা যে এই জায়গা সম্বন্ধে বেশ কিছু জানে তা অনুমান করে ঈশান তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন? আগে এসেছেন এখানে?' সোমদত্তা জবাব দিল, 'এ মন্দিরের আমি সব কিছু চিনি-জানি।'

ঈশান হেসে বলল, 'বুঝলাম, তার মানে আপনি আগে এসেছেন এখানে। বিনা পয়সায় তাহলে একজন গাইড পেলাম আমি।'

ঈশানের কথায় সোমদত্তা যেন মৃদু হাসল মনে হয়। তারপর বলল, 'আচ্ছা, এ জায়গা আপনার চেনা মনে হয় না? মনে হয় না আপনিও কোনও দিন এখানে এসেছেন?'

ঈশান জবাব দিল, 'আমি এখানে প্রথম এসেছি। তবে এক জায়গাতে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালে মনে হয় সে জায়গা আমার চেনা। যেন আগে কোনওদিন গেছি সেখানে। সে অনুভূতি কিছুটা আমার হচ্ছে।'

সোমদত্তা বলল, 'আসুন আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।' এই বলে সে এগোল গর্ভমন্দিরের দিকটাতে। ঈশান তাকে অনুসরণ করল। গর্ভমন্দিরের প্রবেশ মুখের কাছাকাছি পৌঁছে ঈশান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'ভিতরে যাওয়া কি ঠিক হবে? যা অন্ধকার।'

মন্দিরের ভিতরে ঢোকার মুখটাতে ঈশানের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য পিছনে ফিরে তাকিয়ে সোমদত্তা বলল, 'ভয় পাচ্ছেন?'

ঈশানের এবার বেশ লজ্জাবোধ হল তার কথা শুনে। সে যখন ভিতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছে তাহলে ঈশান পারবে না কেন? 'আচ্ছা চলুন' বলে ঈশান প্রবেশ করল গর্ভমন্দিরে।

বিশাল গর্ভমন্দির। তার ভিতরেও নানা অলিগলি। সেখানে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে নানা দেবদেবী বা সুরসুন্দরীদের মূর্তি। ছাদের ফাটল গলে বা অন্য কোনওভাবে কিছুটা চাঁদের আলো ঢুকছে ভিতরে। আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষের মূর্তিগুলোকে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। ঈশানের কয়েক পা আগে চলেছে সোমদত্তা। তার শান্ত ধীর পদচারণা দেখে ঈশানের মনে হল, সত্যি যেন সে মন্দিরটা চেনে। ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

ঈশানকে সঙ্গে নিয়ে এক সময় এক জায়গাতে এসে থামল সোমদত্তা। কোথা থেকে যেন চাঁদের আলো এসে পড়েছে সামনের দেওয়ালটার ওপর। আর সেই আলোতে তাদের সামনে জেগে আছে একসার ক্রীড়ারত নারীমূর্তি। ছোট ছোট বল বা গোলক নিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

তারা খেলা করছে। কারো হাতের তালুতে গোলক রাখা, কেউ আবার গোলক স্থাপন করেছে তাদের উন্মুক্ত বক্ষ বিভাজিকার খাঁজে।

অদ্ভুত সুন্দর নারীমূর্তি সব। প্রত্যেকেই যেন জীবন্ত। ছোট গোলক নিয়ে নারীদের খেলার ব্যাপারটা খুব প্রাচীন প্রথা। মূর্তিগুলোকে দেখে একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঈশানের। সাহিত্যের কথা। একটু ইতস্তত করে ঈশান বলল, 'জানেন মহাকবি কালিদাসের রচনায় এই বলের কথা উল্লেখ আছে—"ছোট্ট গোলক তুমি আমার প্রিয়ার করকমলের ছোঁয়ায় লাফাও। উঁচুতে আরও উঁচুতে লাফাও। ছুঁতে চাও তার ওষ্ঠ। অথচ প্রতিবারই ভুল করে নেমে আসো মাটিতে। আমি সাক্ষী থাকি সেই মর্মবেদনার।" '

সোমদত্তা সেকথা শুনে প্রথমে যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, 'হ্যাঁ, মর্মবেদনা।' তারপর যেন একটু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আর কিছু, আর কিছু মনে পড়ছে আপনার এই নারী-মূর্তিগুলো দেখে? বিশেষত ওই গোলকগুলোর ব্যাপারে?'

ভালো করে মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে ঈশান বলল, 'না, তেমন কিছু নয়, তবে এই মূর্তিগুলো দেখে কেন জানি মনে হচ্ছে এদের আগে আমি দেখেছি। এমনও হতে পারে কবির বিবরণ পড়ে মনের কল্পনায়। তাই হয়তো একটু চেনা মনে হচ্ছে এই রমণীদের।'

ঈশানের কথা শুনে মৃদু চুপ করে থাকার পর সোমদত্তা বলল, 'ওই ছোট গোলকগুলো কিন্তু অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও ব্যবহার করা হত। বক্ষ সৌন্দর্য এই নারীমূর্তিগুলোর অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। যেসব নারীদের মগধ, কামরূপ, বঙ্গ সমতট থেকে সংগ্রহ করে আনা হত তাদের সুরসুন্দরী রূপে নির্বাচন করা হবে কিনা তার জন্য এক অন্তিম পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ওইসব নারীদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দাঁড় করিয়ে কিছুটা তফাত থেকে আকাশের দিকে এমনভাবে ওই ছোট গোলক ছুড়ে দেওয়া হত যা ওপর থেকে এসে নারীর দুই বক্ষের মাঝে পড়ে। গোলক যদি ফাঁক গলে গড়িয়ে নীচে পড়ে তবে সেই নারীকে সুরসুন্দরী হবার অনুপযুক্ত ধরা যেত। তারা দাসী হত সুরসুন্দরীদের। আর যে নারী ওই গোলক তার দুই বক্ষের মাঝখানে ধারণ করতে পারত, সে হত সুরসুন্দরী। তাকে দেখে মূর্তি নির্মাণ করত ভাস্করের দল। এই মন্দিরে যত সুরসুন্দরীদের মূর্তি আছে তাদের সবাইকেই এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

সম্পূর্ণ অজানা এক কথা শুনলেও ঈশানের কেন জানি মনে হল এ কথাটাও তার জানা। সে শুধু বলল, 'যদি মন্দিরের আরও ওপরে ওঠা যেত তবে মন্দিরের শীর্ষগাত্রে যেসব মূর্তিগুলো আছে তাদেরকেও কাছ থেকে ভালোভাবে দেখা যেত।'

সোমদত্তা বলল, 'চলুন তবে। আমি ওপরে ওঠার পথ চিনি। ওই পথ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মন্দির যখন নির্মিত হয়েছিল তখন ভাস্করের দল ওই পথে ওপরে উঠে কাজ করত।'

তার কথা শুনে ঈশান বলল, 'আপনি এ মন্দিরের এত কিছু চেনেন কী করে? কতবার এসেছেন এখানে?'

সোমদত্তা তার কথা শুনে হাসল। তারপর এগোল সামনের দিকে। অগত্যা ঈশান অনুসরণ করল তাকে।

গর্ভগৃহ সংলগ্ন একটা কক্ষ থেকে সংকীর্ণ একটা সোপানশ্রেণি ওপরে উঠে গেছে। সোমদত্তা উঠতে শুরু করল সেই সিঁড়ি বেয়ে। আর তার পিছন পিছন ঈশান। দেওয়ালের ফাটল দিয়ে মাঝে মাঝে আলো এসে পড়ছে সিঁড়িতে। বাকি জায়গাগুলো অন্ধকার। ছমছম নূপুর বাজছে সোমদত্তার পায়ে। সিঁড়ির অন্ধকার বাঁকগুলোতে যেখানে অন্ধকারে

boierpathshala.blogspot.com

অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সোমদত্তা, সেখানে ওই নূপুরধ্বনিকেই অনুসরণ করছে ঈশান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওপরে ওঠার পর এক সময় সামনেটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠল। সোমদত্তার পিছন পিছন ঈশান এসে প্রবেশ করল ঘরের মতো একটা জায়গাতে। মাথায় ছাদ থাকলেও তার চারপাশ খোলা। চারদিক থেকে মন্দিরগাত্রের পাথুরে থাক এসে মিশেছে সে-জায়গার সাথে। চন্দ্রালোকে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরসুন্দরীরা। ঈশান বুঝতে পারল সে সম্ভবত মন্দিরের শীর্ষদেশের কোনও জায়গায় উঠে এসেছে। নীচের মন্দির চত্বরটা পুরো দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। আর মন্দিরকে ঘিরে থাকা কুয়াশাবলয়ের ওপর দিয়েও এদিক-ওদিকে দেখা যাচ্ছে মন্দির-নগরীর সার সার চূড়া।

ঘরের মতো জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সোমদত্তা প্রশ্ন করল, 'এই জায়গাটা চেনা মনে হচ্ছে আপনার?'

ঈশান ভালো করে তাকাল চারপাশে। ঘরের মতো জায়গাটার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নানা প্রকারের প্রস্তরখণ্ড, কিছু অর্ধসমাপ্ত মূর্তি। জায়গাটার এক কোণে কিছু লৌহ কীলক, হাতুড়ি ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্রপাতিও পড়ে আছে।

ঈশান কোনও দিন এ জায়গাতে আসেনি। কিন্তু এবার হঠাৎ তার মনে হতে লাগল জায়গাটা তার পরিচিত। সে বলল, 'আচ্ছা এখানে কী মূর্তি বানানো হত?'

সোমদত্তা বলল, 'হ্যাঁ, তারপর সে মূর্তিগুলো স্থাপন করা হত এ জায়গা সংলগ্ন মন্দিরশীর্ষের তাকগুলোতে। এ জায়গা দেখে আর কিছু মনে পড়ছে আপনার?'

চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি শুরু হল ঈশানের মনে। ঈশান স্পষ্টভাবে জবাব দিল, 'কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছে এ জায়গা...'

সোমদত্তা আবার জানতে চাইল, 'আর কিছু আর কিছু?'

জায়গাটা দেখে ঈশানের মনের ভিতর অস্পষ্ট কিছু ফুটে উঠে আবার যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। ঈশানের মনে হচ্ছে সে যেন কিছু একটা এবার বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না!

ঈশানকে চুপ করে থাকতে দেখে সোমদত্তা যেন একটু বিষণ্ণভাবে বলে উঠল, 'এই মন্দির, গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত সুরসুন্দরীদের মূর্তি, ভাস্করদের এই জায়গা দেখে এখনও তোমার কিছু মনে পড়ছে না ঈশান?'

কথাগুলো বলা শেষ করে সোমদত্তা ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল একটা লৌহ কীলক আর হাতুড়ি। তারপর বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।' ঈশান খেয়াল করল সোমদত্তার সম্বোধন এবার পাল্টে গেছে। ঈশানের কপালের দু-পাশের রগগুলো কেমন যেন দপদপ করতে শুরু করেছে। কীলক আর হাতুড়িটা নিয়ে সে জায়গা ছেড়ে একটা তাকের দিকে এগোতে শুরু করল সোমদত্তা। তাকে অনুসরণ করল ঈশান।

মন্দিরের শীর্ষদেশের সংকীর্ণ তাক! কোনও প্রাকার নেই তার। অনেক নীচে মন্দির প্রাঙ্গণ। উন্মুক্ত তাকগুলোর মাঝেমাঝে শুধু বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে সুরসুন্দরীদের দল। চাঁদের আলোতে তাদের ঠোঁটের কোণে যেন আবছা হাসি লেগে আছে। যেন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছে তারা। তাক ধরে এগিয়ে চলছে সোমদত্তা। তার পিছনে ঈশান যত এগোচ্ছে তত যেন ঈশানের মনে হচ্ছে এ জায়গা তার খুব চেনা, খুব চেনা! কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তাকের শেষ প্রান্তে এক সময় এসে পৌঁছল সোমদত্তা। সেখানে অন্য

boierpathshala.blogspot.com

মূর্তিগুলোর তফাতে একাকী দাঁড়িয়ে আছে এক সুরকন্যার মূর্তি। সেখানে এসে থামল তারা দুজন।

সোমদত্তা ঈশানকে বলল, 'এবার ভালো করে তাকাও মূর্তিটার দিকে।'

ঈশান তাকাল। চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে সেই সুরকন্যা, গ্রীবাটা ঈষৎ আনত। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা ঘন সন্নিবেষ্ট বক্ষদেশ, ক্ষীণ কটির সেই সুরসুন্দরীর গা বেয়ে যেন জ্যোৎস্না চুইয়ে পড়ছে। মৃণাল লতার মতো তার বাহুযুগলের করপল্লব দুটো বুকের ঠিক মাঝখানে চেপে ধরা। হাত দুটো কি লজ্জা নিবারণের জন্য বুকের মাঝখানে ওভাবে চেপে ধরেছে, নাকি সেখানে লুকিয়ে রেখেছে অন্য কিছু?

ঈশান বলল এ মূর্তি যে আমার চেনা মনে হচ্ছে?

সোমদত্তা সেই লৌহ-শলাকা আর হাতুড়িটা ঈশানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এ মূর্তি তো তুমিই বানিয়ে ছিলে একদিন। বঙ্গ সমতট থেকে এসেছিল এক নারী। ভাস্করশ্রেষ্ঠ তুমিও বঙ্গসমতটের লোক ছিলে। এই মন্দিরের প্রধান ভাস্কর। তোমার কাছেই থাকত সেই দুর্মূল্য স্ফটিক গোলক। যা বক্ষের মাঝখানে ধারণ করেছিল এই নারী, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয়ও...'

কী বলছে সোমদত্তা! মাথার ভিতরটা যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ঈশানের। যেন বাস্তব আর পরাবাস্তবতার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঈশান। সোমদত্তা বলে চলল, 'তারপর তোমাকে আর এই নারীকে নিয়ে রচিত হল কত ভাস্কর্য। তুমিও ভালোবেসেছিলে তাকে। কিন্তু একদিন তোমার কার্য্যোপলক্ষে কিছু দিনের জন্য দেশে ফেরার প্রয়োজন হল। নারীর সৌন্দর্য নির্বাচনের জন্য ওই স্ফটিক গোলক ছিল হীরকখণ্ডের চেয়েও দামি। যাবার আগে তুমি সেই গোলক গচ্ছিত রেখে গেলে এই নারীর কাছে, তোমার সৃষ্ট এই মূর্তির মধ্যে। বলে গেলে তুমি যত দিন ফিরে না আসো ততদিন সে যেন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে সেই গোলক। কিন্তু তুমি আর ফিরলে না। রাজ নির্দেশে একদিন তল্লাশি শুরু হল সেই গোলকের। তারা অনুমান করল তোমার প্রেয়সী নিশ্চয়ই সন্ধান জানে সেই গোলকের আর তারপর...।'

সোমদত্তার কথাগুলো যেন তছনছ করে দিচ্ছে ঈশানের মাথার ভিতরটা। ঈশানের ভিতর থেকে যেন জেগে উঠেছে অন্য এক ঈশান। তবু সে শেষ একবার বলার চেষ্টা করল, 'এ সব আবোলতাবোল কী বলছেন আপনি?'

সে কথা বলার জন্য ঈশান তাকাল সোমদত্তার দিকে। কখন যেন শালের আবরণ খসিয়ে ফেলেছে সোমদত্তা। ঈশান দেখতে পেল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা সুরসুন্দরী আর সোমদত্তার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। তারা দুজন যেন একই নারী।

সে দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশানের মনের ভিতর থেকে যেন খসে পড়ল হাজার বছরের খোলস। ঈশান চিৎকার করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। সব মনে পড়ে গেছে আমার। সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বঙ্গসমতট থেকে এ দেশে আর ফেরা হয়নি আমার।'

মূর্তিটার মতোই তার ঠোঁটের কোণে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল সোমদত্তার। সে বলে উঠল, 'কিন্তু আমি যে হাজার বছর ধরে তোমার প্রতীক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি ভাস্করশ্রেষ্ঠ। তোমারই সেই স্ফটিক গোলক বুকে নিয়ে, তোমার ভালোবাসাকে বুকের মধ্যে আগলে ধরে। আমি কাউকে জানতে দিইনি তার কথা। কারো হাতে তুলে দিতে পারিনি তোমার-আমার ভালোবাসাকে।

boierpathshala.blogspot.com

ঈশান আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভুলে গেছিলাম তোমাকে।'

বিষণ্ণ হেসে সোমদত্তা বলল, 'ক্ষমা নয়, আমি যে তোমায় ভালোবাসি। সেজন্যই তো আমি সে-গোলক তুলে দিতে পারিনি রাজরক্ষীদের হাতে। সে গোলক যে ভাস্করের হাতে যেত সেই হত তোমার জায়গায় প্রধান ভাস্কর। সে কেমন করে সইতাম আমি। কিন্তু হাজার বছর ধরে বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রাখা এ গোলকের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সামান্য সুরসুন্দরী আমি। হাজার বছর আগে তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো তবে মুক্তি দাও আমাকে।'

বিস্মিত ঈশান বলে উঠল, 'মুক্তি? কীভাবে?'

সোমদত্তা বলে উঠল ওই মূর্তি আর আমি অভিন্ন নই। তোমার হাতের ওই লৌহশলাকা হাতুড়ি দিয়ে বিদ্ধ করো আমার বুকে। খুন করো আমাকে। আমার বুকের ভিতর থেকে উৎপাটিত করো তোমার স্ফটিক গোলক। এই বলে নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করল সে। এক মুহূর্তের জন্য একখণ্ড কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদকে। ঈশান দেখতে পেল মূর্তিটা অদৃশ্য হয়েছে তার জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে সোমদত্তা!

ঈশান বলল, 'এ কী বলছ তুমি। চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

সোমদত্তা বলে উঠল, 'পালানো হবে না আমার। আমাকে নিয়ে পালাতে গেলে তোমারও বিপদ হবে। রক্ষীরা ঠিক ধরে ফেলবে দুজনকে। আমাকে তুমি খুন করে মুক্তি দাও এই সুরসুন্দরীর জন্ম থেকে। কীলক বসিয়ে দাও আমার বুকে, কথাগুলো বলতে বলতে এবার কেমন যেন সে চঞ্চল হয়ে উঠল।

ঈশান বলল, 'কোথায় রক্ষী কেউ তো কোথাও নেই!'

সোমদত্তা বলল, 'খুন করো, খুন করো আমাকে। কীলক বসিয়ে দাও। দ্বিধা কোরো না। যেমনভাবে কঠিন পাথরের গায়ে এই কীলক আর হাতুড়ির ঘায়ে তুমি আমার প্রাণ সঞ্চার করেছিলে তেমনই ভাবো কোনও প্রস্তরমূর্তির বুকে আঘাত হানছ তুমি। নারী নয়, তুমি প্রস্তর ঘাতক।'

আর এরপরই সোমদত্তা চিৎকার করে উঠল, ওই দেখো তারা এসে পড়েছে! আর সময় নেই।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মশালের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মন্দির চত্বর। এখানে-ওখানে মন্দিরগাত্রের নানা জায়গাতেও জ্বলে উঠল মশালের আলো। নীচে তাকিয়ে ঈশান দেখতে পেল মন্দির চত্বর থেকে পাথুরে দেওয়ালের পথ বেয়ে সার বেঁধে ওপর দিকে উঠে আসছে হাজার বছরের প্রাচীন এক রক্ষীবাহিনী। মশালের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে তাদের হাতে ধরা তলোয়ার, বর্শার ফলা। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আদিম জিঘাংসা, নারী লালসা। অতি দ্রুত ওপরে উঠে আসছে তারা!

সোমদত্তা আবারও চিৎকার করে উঠল, 'আর দেরি কোরো না। খুন করো আমাকে, নইলে তুমিও বাঁচবে না। ওই গোলকের জন্য হাজার বছর ধরে এমন চাঁদনি রাতে ওরা আসে। সবাই মিলে গোলক না পেয়ে চরিতার্থ করে তাদের লালসা। তুমি কি সহ্য করতে পারবে সেই দৃশ্য? গোলক ওদের হাতে তুলে দেব না বলে যুগ যুগ ধরে সহ্য করেছি এই অত্যাচার। দোহাই তোমার। এবার আমাকে মুক্তি দাও। খুন করে মুক্তি দাও। খুন

boierpathshala.blogspot.com

করে মুক্তি দাও আমার প্রাচীন আত্মাকে। তারপর আবার তোমার মতো আমার নবজন্ম হবে। দোহাই তোমার দেরি কোরো না।'

ভাস্কর ঈশান চিৎকার করে অসহায়ভাবে বলে উঠল—'না, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না।'

ক্রমশ উঠে আসছে পিশাচের দল। কানে আসছে তাদের অস্পষ্ট উল্লাসধ্বনি।

না, আর দেরি নয়। মন শক্ত করল ভাস্কর। তার দু-হাতের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল। স্তনের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে সোমদত্তা। মনের সব শক্তিকে একত্রিত করে সোমদত্তার বুকের ঠিক মাঝখানে লৌহ কীলক প্রতিস্থাপিত করল ঈশান। মুহূর্তের জন্য এবার যেন হাসি ফুটে উঠল সেই সুরসুন্দরীর ঠোঁটের কোণে। মুক্তির হাসি। কোলাহল আরও কাছে উঠে এসেছে। আর দেরি না করে ঈশান হাতুড়ির ঘা দিল কীলকে। ঠং করে একটা শব্দ হল। তার আঘাতে কী যেন একটা ছোট্ট উজ্জ্বল গোলকের মতো জিনিস তার স্তনের ভিতর থেকে নিক্ষিপ্ত হল আকাশের দিকে। লৌহ শলাকাটা আমূল প্রোথিত হল সুরসুন্দরীর স্তনে। থরথর করে কেঁপে উঠল সুরসুন্দরী। তারপর টাল খেয়ে উন্মুক্ত তাক থেকে ছিটকে পড়ল নীচের দিকে। তার দেহ নীচে আছড়ে পড়ার সঙ্গে মিশে গেল ঈশানের আর্তনাদ। আর সঙ্গে সঙ্গেই সব কোলাহল থেমে গেল, সব আলো নিভে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। একদম নিস্তব্ধ যে বৃত্তাকার কুয়াশার স্তর কান্তরিয় মন্দিরকে ঘিরে ছিল তা যেন মন্দিরকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ওপরে উঠে আসছে কুয়াশা। ঈশান এরপর যে-পথ বেয়ে সেখানে পৌঁছেছিল পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল সেদিকে।

পরদিন বেলা আটটা নাগাদ দিবাকরদার ডাকে ঘুম ভাঙল ঈশানের। ঘুম ভেঙে উঠে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে পড়ে গেল, গতরাতের ঘটনার কথা। সেটা কি সত্যি ছিল, নাকি স্বপ্ন? সে দিবাকরদাকে জিগ্যেস করল, 'কাল কখন ঘরে ফিরেছি আমি?'

দিবাকরদা বললেন, 'তা তো বলতে পারব না। কাল পানটা একটু বেশি হয়ে গেছিল। ওরাই আমাকে ধরাধরি করে এঘরে পৌঁছে দেয়। কোনও হুঁশ ছিল না আমার। এখন চটপট তৈরি হয়ে নাও। গাইড এসে গেছে, মন্দির দেখতে বেরোতে হবে।'

কিছু সময়ের মধ্যেই মন্দির দেখার জন্য গাইডের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল ঈশানরা সঙ্গে আয়োজকরা তো আছেই। বেশ বড় দল। তারা প্রথমে এসে উপস্থিত হল কান্তরিয় মন্দিরে। বিশাল মন্দির। অপূর্ব তার শিল্প সুষমা। সকালের সূর্যালোকে তার গায়ে জেগে আছে অসংখ্য সুরসুন্দরী, মিথুন ভাস্কর্য। হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে সেসব ভাস্কর্য দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। গাইড তাদের বলল, 'এই মন্দিরে যেসব সুরসুন্দরীদের আপনারা দেখতে পাবেন তারা কিন্তু কেউ কল্পিত ছিলেন না। মগধ, উজ্জয়িনী, কামরূপ এমনকী আপনাদের বঙ্গসমতট থেকেও সংগ্রহ করে এনে তাদের মডেল বানিয়ে মূর্তি নির্মাণ করত শিল্পী ভাস্করের দল।'

গাইডের কথা শুনতে শুনতে বিমোহিতভাবে মূর্তিগুলো দেখতে শুরু করল সবাই। হঠাৎ এক জায়গাতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পুরো দলটা। সামনেই পাথুরে চাতালের ওপর পড়ে আছে খণ্ডবিখণ্ড এক সুরসুন্দরীর মূর্তি। গাইড একবার মন্দির শীর্ষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সম্ভবত মাথার ওপরের কোনও তাক থেকে রাতে খসে পড়েছে মূর্তিটা। গতকালও এখানে এটা দেখিনি। মাঝে মাঝে এমন হয়। হাজার বছরের প্রাচীন স্থাপত্য তো। মাঝে মাঝে এটা-ওটা খসে পড়ে। সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল মূর্তির খণ্ডিত

boierpathshala.blogspot.com

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে। তার বুকটা অক্ষত আছে। আর তার মধ্যে প্রোথিত আছে একটা প্রাচীন লৌহ শলাকা। একজন বলল, 'এ শলাকাটা দিয়েই মনে হয় দেওয়ালের গায়ে আটকে রাখা হয়েছিল মূর্তিটাকে। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন কেউ বুকের মধ্যে শলাকা বিঁধে খুন করেছে সুরসুন্দরীকে।' তার কথা শুনে মৃদু চমকে উঠল ঈশান। আর তারপরেই তার পায়ের কাছে একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে সেটা কুড়িয়ে নিল সে। পাথরের তৈরি নিটোল একটা গোলক। অনেকটা পায়রার ডিমের আকৃতির। হয়তো হাজার বছর ধরে পাথরের মধ্যে থাকার কারণে স্ফটিক গোলক রূপান্তরিত হয়েছে লালচে পাথরের গোলকে। গাইড গোলকটা দেখে বলল, 'এ ধরনের বল মাঝে মাঝে এখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। চলুন এগোনো যাক। এ মন্দির দেখা শেষ করে অন্য মন্দিরে যেতে হবে। আরও অন্য মন্দির আছে এখানে।'

শলাকাবিদ্ধ সেই সুরসুন্দরীকে পাশ কাটিয়ে অন্যদের সঙ্গে ঈশান এগোল সামনের দিকে।

boierpathshala.blogspot.com

বিল্ববতী

boierpathshala.blogspot.com

১

বিল্ববতী। বিল্বফলের মতো নিটোল বর্তুলাকার তার স্তনযুগল। চাঁদনী রাতে যখন সে তার মহল সংলগ্ন ক্ষুদ্র সরোবরের মর্মর সোপানশ্রেণিতে এসে দাঁড়ায় তখন সব জ্যোৎস্না যেন আকাশ থেকে নেমে এসে জমা হয় তার নিবিড় স্তন-খাঁজে। বিভ্রান্ত মৎস্যকুল ঘাই দিয়ে ভেসে উঠে চেয়ে থাকে বিল্ববতীর দিকে। তারা ভাবে আরও দুটো চাঁদ যেন আকাশ থেকে নেমে এসে আটকে আছে বিল্ববতীর বুকে। দিনের বেলাতে এই মরুরাজ্যের প্রখর সূর্য যেন শীতলতা খোঁজে বিল্ববতীর গভীর নাভিকূপে। ধাবমান ঘোটকের দল থমকে দাঁড়ায় বিল্ববতীর ঘোটকী সদৃশ ভারী নিতম্ব দেখে।

ক্ষীণ কটি, মৃগনয়না বিল্ববতী। বারবণিতা বিল্ববতী। নগর নটী বিল্ববতী। মহারাণা উদয়সিংহর সঙ্গসহচরী, প্রধানা বারবনিতা বিল্ববতী। তার রং যখন প্রস্ফুটিত হয়নি ঠিক সেই বয়সে, কোনও যুদ্ধবাজ তাকে গান্ধার রাজ্যের সরবরতীরস্থ শীতল কুটির থেকে উৎপাটিত করে এনে উপস্থিত করে ছিল নিষ্প্রাণ মরুরাজ্য জয়শালমেরের দাস বাজারে। সেখান থেকে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাকে খরিদ করে মেবারাধিপকে উপহার দিয়েছিল কোনও এক রাজপুত সর্দার।

কিরিটশোভিত, তুষারময় গান্ধার রাজ্য থেকে রুক্ষ উষর মরুপ্রদেশে এভাবেই আগমন এই নারীর। পূর্বস্মৃতি প্রায় কিছুই স্মরণে আসে না তার। এমনকী নামটাও পর্যন্ত নয়। যখন তার বক্ষ প্রস্ফুটিত হতে শুরু করল, তখন তা দেখে কোনও প্রাচীন অভিজ্ঞ বারবনিতা ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার নামকরণ করেছিল 'বিল্ববতী'। এই তার অকিঞ্চিৎকর অতীত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

তবে বর্তমানে সে মেবারের বারবনিতা শ্রেষ্ঠা। রাজ অনুগ্রহে এ পদ লাভ করেছে সে। হয়তো বা তার ওই অসীম সৌন্দর্যময় বিল্ব স্তনের জন্যই। মহারানা থেকে অতি সাধারণ নাগরিক, সকল পুরুষকেই আকৃষ্ট করে বিল্ববতীর বেলফলের মতো উদ্ভিন্ন স্তন। এক সহস্র বারবনিতা রয়েছে বিল্ববতীর অধীনে। রাজপুরুষ থেকে অচেনা বণিক, চিতোরের নগরজীবনে মনোরঞ্জন করে তারা। তবে গণিকা, বারবনিতা শ্রেষ্ঠা বিল্ববতী আজ শুধুই মহারাণার অঙ্কশায়িনী। গণিকাদের আবাসস্থলে সে থাকে না। মেবারের মহারানা তার জন্য এক ক্ষুদ্র মর্মর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন চিতোর নগরীর এক নিভৃত সরোবরের কিনারে। সেখানে নিত্য আনাগোনা মোবারনরেশ উদয়ের। অন্তঃপুরে রাজমহিষীরা মহারানার প্রতীক্ষাতে থাকলেও তিনি কাল অতিবাহিত করেন বিল্ববতীর সঙ্গে। এ জন্য মহিষী ও সামন্ত সর্দারদের মনে বিল্ববতীর প্রতি অসন্তোষ আছে। রাজমহিষীদের অনেকেই সামন্তরাজা বা সর্দারদের কন্যা বা ভগিনী। ব্যাপারটা জানলেও এ নিয়ে তোয়াক্কা করেন না উদয়সিংহ। বিল্ববতী অপার সৌন্দর্যের আধার, বিল্বফলের মতো স্তনযুগলের অমোঘ আকর্ষণ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় বিল্ববতীর মহলে। শুধু কি শরীরী আকর্ষণ, হয়তো বিল্ববতীকে ভালোবেসে ফেলেছেন উদয়, এবং বিল্ববতীও।

মরু অঞ্চলে এক পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রাকারবেষ্টিত, জলাশয়, কানন, হর্ম্য প্রাসাদ, দেউল শোভিত মেবারের রাজধানী চিতোর গড় রাজপুতাধিপ উদয়ের আবাসস্থল। তার রাজপ্রাসাদ। দ্বিপ্রহরে হরিণ-মাংস ও পরমান্ন সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিদ্রা গেছিলেন উদয়। তার যখন নিদ্রাভঙ্গ হল তখন সূর্যাস্ত হয়েছে। তার ক্ষীণ আভাটুকু ছড়িয়ে আছে দুর্গস্থিত চিতোর নগরীর বুকে। আঁধার ঘনাতে শুরু করেছে প্রাসাদ নগরীর

boierpathshala.blogspot.com

স্তম্ভ, অলিন্দের আড়ালে। প্রাকার গাত্রে মশাল জ্বালাবার আয়োজন শুরু করেছে রক্ষীর দল, প্রাসাদে দাসীরা সলতে পাকাচ্ছে প্রদীপে, মন্দিরে শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি।

নিদ্রাভঙ্গের পর হাতির দাঁতের পালঙ্কে উঠে বসে গবাক্ষ দিয়ে গোধূলি সমাচ্ছন্ন নগরীর দিকে তাকালেন তিনি। দূরে নগরীর প্রান্তসীমাতে অবস্থিত বিল্ববতীর মহল। যদিও অন্য নানা হর্ম্যরাজির আড়ালে অদৃশ্য সেই ক্ষুদ্র প্রাসাদ, তবুও সেদিকে তাকিয়ে উদয় কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগলেন, বিল্ববতী এখন কী করছে? স্ফটিক পাত্রে ঢেলে রাখছে মহারানাকে আপ্যায়ন করার জন্য রক্তবর্ণের অথবা স্বর্ণাভ মদিরা? মহারানার শরীরে তার অঙ্গের মাদকতা ছড়িয়ে দেবার জন্য মৃগনাভি তৈল মর্দন করছে তার জঙ্ঘায়, কটিদেশে, মৃদঙ্গ সদৃশ নিতম্বে? চন্দনবারি লেপন করছে তার বিল্ববক্ষে? হয়তো তাই।

আজকাল অন্ধকার নামলেই তো মহারানা অমরসিংহের শিবিকা তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে বিল্ববতীর মহলে। বিল্ববতীর সঙ্গে সেখানে নিভৃতে রাত্রি যাপন করেন উদয়। রতিক্রীড়া করেন কুসুম বিছানো পালঙ্কে অথবা বিল্ববতীর সঙ্গে চন্দ্রালোকে জলকেলি করেন সেই প্রাসাদ সংলগ্ন ক্ষুদ্র সরোবরে। রাত শেষে যখন শুকতারা ফুটে ওঠে তখন মহারানার শিবিকাবাহকের দল সেখানে আবার উপস্থিত হয় তাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার জন্য।

আজও নিশ্চয় তার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে বিল্ববতী। এ কথা ভেবে নিয়ে কিছু পরে অন্ধকার নামতেই পালঙ্ক ত্যাগ করলেন মহারানা। রোজকার মতো বিল্ববতীর মহলে যাবার প্রস্তুতি শুরু করার জন্যই শয্যা ত্যাগ করেছিলেন মহারানা, কিন্তু পোশাক পরিবর্তনের পর দাসীরা যখন তার গুম্ফে সুগন্ধী লেপন করছে ঠিক তখনই তার মনে পড়ে গেল বিশেষ একটি কথা। সামন্ত সর্দার সেনাপতি শালব্রুমার নেতৃত্বে কিছু সামন্ত সর্দারদের সঙ্গে তাঁর আজ রাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে। আলোচনার বিষয় বেশ গুরুতর।

মোঘল সম্রাট আকবর শাহ নাকি চিতোর অধিকার করতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মরুরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে। তার সঙ্গে আছে বিশাল হস্তিবাহিনী আর অগণিত সেনা। আর একপক্ষকালের মধ্যেই হয়তো বা সম্রাট এসে উপস্থিত হবেন চিতোর কেল্লার পাদদেশে। চিতোরের মাটিতে মহাসংগ্রামের নানা ইতিহাস লেখা আছে। লেখা আছে আলাউদ্দিনের চিতোর ধ্বংসের ইতিহাস, কচ্ছের অধিপতি বাহাদুর শাহর চিতোর আক্রমণের ঘটনা, লেখা আছে রাজপুত নরনারীদের আত্মত্যাগের কাহিনি। কিন্তু সে সব বহুকাল আগের ঘটনা। পূর্বতন চিতোর অধিপতি বনবীরের থেকে চিতোর দখল করে সিংহাসন দখলের পর, বিগত কয়েক দশক যুদ্ধের কোনও আঁচ লাগেনি চিতোর নগরীতে। ভোগ বিলাসেই দিন কাটাচ্ছেন মহারানা উদয়, আর শান্তির জীবন কাটাচ্ছে নাগরিকরা। কিন্তু চর মারফত এই সংবাদ শুনে নড়েচড়ে বসেছে মেবারের হিতৈষী সামন্ত সর্দাররা। দীর্ঘদিন যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকার ফলে সৈনিকদের শরীর মনেও কিছুটা শ্লথতা এসেছে। কিন্তু আকবর নামের ওই দুর্যোগকে প্রতিহত করতে হবে। কীভাবে রাজপুত সেনাবাহিনীকে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা যায়, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার জন্যই মহারানার সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা সর্দারদের।

কথাটা মনে পড়তেই উদয় উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে গেলেন। আলোচনাটা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে আলোচনার পরই সৈন্যদের এবং অন্যান্য যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রস্তুতি শুরু করবে সর্দাররা। সামন্ত সর্দার শালব্রুমার আবেদনক্রমে সমর

boierpathshala.blogspot.com

নিজেই সর্দারদের সম্মতি দিয়েছেন এই বৈঠকের জন্য। আবার ওদিকে তার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে থাকবে প্রিয়তম বিল্ববতী। সামন্ত সর্দারদের সঙ্গে আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিল্ববতীর শরীরের, ভালোবাসার আকর্ষণ এক রাত্রের জন্যও প্রত্যাখ্যান করা মহারানা উদয়ের পক্ষে দুষ্কর। প্রতি রাতে বিল্ববতীর সৌন্দর্য, শরীর-সুধা যেন গণ্ডুষ ভরে পান করেন উদয়। মদিরার নেশা যেমন মদিরা পানের সময় আসন্ন হলে মানুষকে তাড়িত করে, তেমনই অন্ধকার নামলেই বিল্ববতীর শরীরের আহ্বান মহারানার মনকে তাড়িত করে তার মহলে ছুটে যাবার জন্য। মদিরার নেশা অপেক্ষা এ নেশা, এ আহ্বান অনেক বেশি তীব্র।

তার কী করা উচিত ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত নিলেন উদয়। তাতে দুকুলই রক্ষা পাবে। তিনি ঠিক করলেন, বিল্ববতীর মহলে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসবেন। সর্দাররা প্রাসাদে এলে তাদের নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হবে। মহারানা কিয়ৎকাল বিল্ববতীর প্রাসাদে তার সঙ্গ লাভ করে প্রাসাদে ফিরে এসে সর্দারদের সঙ্গে মিলিত হবেন নৈশভোজ সহকারে আলাপচারিতাতে। ভাবনাটা মাথাতে আসতেই উদয়সিংহ সেইমতো নির্দেশ দিলেন তাঁর ভৃত্যবর্গকে। সর্দার অমাত্যরা প্রাসাদে এলে তাদের যেন জানিয়ে দেওয়া হয় রানা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গে তিনি নৈশভোজ সাঙ্গ করবেন ও সে সময় জরুরি বিষয়ে আলোচনা করবেন। সেই মতো যেন মহারানার জন্য তারা প্রতীক্ষা করেন।

প্রসাধন কার্য সম্পন্ন হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভৃত্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে রক্ষী পরিবৃত স্বর্ণমণ্ডিত দারুকাঠের শিবিকাতে প্রাসাদ ছেড়ে রানা যাত্রা করলেন নগর প্রান্তে বিল্ববতীর মহলের উদ্দেশে।

অন্ধকার নেমে গেছে। দুর্গ প্রাকারে জ্বলে উঠেছে সার সার মশালের আলো। সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে চিতরেশ্বরীর মন্দির থেকে। রানা প্রাসাদ ত্যাগ করার কিছু সময়ের মধ্যেই প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন শালরুমা ও অন্য সমস্ত সর্দাররা। মহারানার ভোগবিলাস, নারী প্রীতি সুবিদিত সবার কাছেই। তারা ভেবেছিলেন এই বিপদকালীন পরিস্থিতিতে মহারানা হয়তো সময় রক্ষা করবেন। উদয়সিংহকে দেখতে না পেয়ে তারা মৃদু মনক্ষুন্ন হলেন ঠিকই, কিন্তু তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলেন মহারানা কখন ফিরে এসে নৈশভোজে তাদের আহ্বান জানাবেন সে জন্য।

২

বিল্ববতীর মহলের সামনে মহারানা যখন শিবিকা থেকে নামলেন তখন আকাশে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। আজ কিছু সময় পরই প্রাসাদে ফিরে যাবেন উদয়। তাই তিনি বিল্ববতীর মহলের বাইরে শিবিকাবাহক আর সঙ্গরক্ষকদের অপেক্ষা করতে বললেন। বিল্ববতীর ক্ষুদ্র মর্মর প্রাসাদে সার সার তেলের প্রদীপ জ্বলছে প্রবেশ তোরণের গায়ের কুলুঙ্গিগুলোতে। উদয়কে স্বাগত জানাবার জন্য প্রতিদিনের মতোই একটা বড় পিতলের প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বিল্ববতী। মহারানা তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই বিল্ববতী প্রথমে নতজানু হয়ে তার চরণ স্পর্শ করল। কিছুটা তফাতে স্বর্ণপাত্রে ফুলমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক দাসী। তার থেকে সেই মালা নিয়ে বিল্ববতী তা সমর্পণ করল উদয়ের হাতে। মহারানার কণ্ঠে মালা পরাবার অধিকার বারবনিতার নেই। মহারানা উদয় তাই নিজেই ধারণ করতেন সেই পুষ্পমালিকা। উদয়কে নিয়ে তার মহলে প্রবেশ করল বিল্ববতী। প্রতিদিনের মতো প্রজ্জ্বলিত ধূপ আর চন্দনের সুবাসে মাতোয়ারা মহলের

boierpathshala.blogspot.com

অন্তঃপুর। শ্বেতপাথরের মেঝে ফুলের পাপড়ি শোভিত। পাপড়ি পায়ে মাড়িয়ে বিল্বতী সেই কক্ষের দিকে এগোতে যাচ্ছিল যেখানে তার সঙ্গে নিশিযাপন করেন মহারানা। কিন্তু মহারানা বললেন 'আজ আর আমি রাত্রি যাপন করব না। প্রাসাদে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হবে। কিছু সময় এখানে অতিবাহিত করে আমাকে প্রাসাদে ফিরতে হবে। আমরা বরং সরোবরের তীরে এই সময়টুকু অতিবাহিত করি।'

উদয়ের কথা শুনে বিল্বতী 'যথা আজ্ঞা' বলে তাকে নিয়ে এগোল বাটিকার পশ্চাৎভাগে নির্গমন তোরণের দিকে। সেদিকেই প্রাসাদ সংলগ্ন সেই ক্ষুদ্র সরোবর অবস্থান করছে। মহল থেকে বাইরে বেরোবার আগে প্রদীপটা নামিয়ে রাখল বিল্বতী, তারপর মহারানাকে নিয়ে বাইরে এল। মহলের পশ্চাৎভাগ থেকেই শুভ্র সোপানশ্রেণি নেমে গেছে কাকচক্ষু সরোবরের জলে। আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার প্রতিবিম্ব ধরা দিচ্ছে জলে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতা মৃদু ভঙ্গ করে নূপুরের ছমছম শব্দ তুলে হাত ধরে মহারানাকে নিয়ে বিল্বতী নামতে শুরু করল সোপানশ্রেণি বেয়ে। নিম্নগামী তার প্রতি পদক্ষেপে আন্দোলিত হচ্ছে তার বিল্বের ন্যায় স্তন-যুগল।

সোপানশ্রেণির শেষ প্রান্তে জল যেখানে ছুঁয়ে যায় সোপানের শেষ ধাপ, সেখানে ছত্রি সমেত শ্বেতপাথরের বেদি আছে বসার জন্য। সেখানে গিয়ে পাশাপাশি বসল তারা দুজন। শীতল বাতাস উঠে আসছে সরোবরের বুক থেকে। এ বাতাস শরীর জুড়িয়ে দেয়। এই মরুদেশে বর্ষার সামান্য কয়েকটা দিন ছাড়া বৃষ্টি নামে না। তাও সর্বত্র নয়। যতটুকু বা বর্ষা হয় তার প্রতিটা জলকণা শুষে নেয় তপ্ত মরু। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই প্রাচীন কেল্লা পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত হলেও এ ধরনের ছোট বড় বেশ কয়েকটা বৃহৎ পুষ্করিণী বা ক্ষুদ্র সরোবর আছে এই কেল্লা নগরীতে। এই জলের উৎস কি তা কেউ জানে না। এই সব কুণ্ডের জলই নগরবাসীদের তৃষ্ণা মেটায়, রাজপুত্রদের রুক্ষ শরীরকে শীতল করে।

বেশ শান্ত, শীতল পরিবেশ চারদিকে। মহারানা বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ভাবে চেয়ে রইলেন জলের দিকে। এক সময় বিল্বতী মৃদু অনুযোগের সুরে বলল, 'মহারানার এমন কী জরুরি সভা যে আজ রাতে তার সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন এই দাসীকে?'

মৌনতা ভঙ্গ করে উদয় বললেন, 'শুনছি দিল্লির বাদশাহ আকবর নাকি চিতোর দখল করতে আসছেন! আর ক'দিনের মধ্যেই তিনি নাকি উপস্থিত হবেন এখানে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। সে বিষয়ে আলোচনার জন্য সামন্ত সর্দাররা সমবেত হয়েছেন প্রাসাদে।'

কথাটা শুনে বিল্বতী বলল, 'পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত প্রাকারবেষ্টিত এই নগরী তো দুর্ভেদ্য, শত্রুসেনা কীভাবে প্রবেশ করবে এখানে?' কথাটা শুনে উদয় বললেন, 'আকবর কোনো ক্ষুদ্র নৃপতি নন। তিনি সম্রাট, বিশাল তার সেনাদল। যদি তিনি তার রণহস্তিদের দিয়ে দুর্গ তোরণ ভেঙে ফেলেন তখন? দখল করেন চিতোর গড়? যেমন করেছিলেন আলাউদ্দিন, করেছিলেন গুর্জরের সুলতান বাহাদুর শাহ।

বিল্বতী বলল, 'হঠাৎ বাদশাহর চিতোর অভিযানের কারণ কী?'

উদয় বললেন, 'আক্রোশ। মালবের পদচ্যুত রাজা আর নরোবরের অধিপতিকে আমি আশ্রয় দিয়েছি মেবারে। রাজ্যভ্রষ্ট হলেও তারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি। একজন হিন্দুরাজা হয়ে হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ের আবেদন আমি ফেরাতাম কীভাবে?'

boierpathshala.blogspot.com

এ কথা বলার পর মৃদু রসিকতার ছলে উদয় বললেন, 'ধরো আকবর কেল্লা দখল করল। তখন তুমি কী করবে? তার সঙ্গে দিল্লি চলে যাবে? শুনেছি সম্রাটের আশীর্বাদধন্য বারবানিতারা নাকি বিশাল অর্থ সম্পদের অধিকারিণী। এক এক জনের এমন অর্থ আছে যা এই মরু প্রদেশের অনেক রাজাদের নেই। লোকে বলে বারবনিতারা নাকি আসলে কোনো পুরুষকে নয়, তারা একমাত্র অর্থ সম্পদকে ভালোবাসে। কী করবে তুমি? আমাকে ভুলে গিয়ে কোন মুঘলের বক্ষলগ্না হবে?

উদয়ের কথা শুনে বিল্বতী তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তেমন হলে আপনার মহিষীরা, রাজ অন্তঃপুরের নারীরা কী করবেন?'

প্রশ্ন শুনে উদয় একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'সম্ভবত মহারানা কুম্ভের প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করবেন। যেমন আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের সময় কেল্লার পতন হবে বুঝতে পেরে হাজারো হাজারো রাজপুত নারী ওই বিশাল কক্ষে অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। যে কক্ষের ধূলিকণা আজও সংগ্রহ করে বিবাহিত রাজপুত নারীরা তার স্বামীর মঙ্গলকামনায় সিঁথিতে দেবার জন্য, অক্ষয় স্বর্গলাভের জন্য।'

কথাটা শুনে বিল্বতী একটু আহতভাবে বলল, 'আপনি তো জানেনই রানা পতিব্রতা রাজপুত নারী ছাড়া সে কক্ষে আমার মতো বারবনিতাদের প্রবেশাধিকার নেই। আমাদের পাদস্পর্শ ঘটলে নাকি অপবিত্র হবে সেই কক্ষ। আমারও দীর্ঘ দিনের বাসনা ছিল ওই কক্ষের পবিত্র ধূলিকণা সংগ্রহের। তেমন কোনো দুর্যোগ ঘটলে ওই কক্ষে আমার প্রবেশাধিকার না থাকলেও ছুরিকা তো আছেই। তা দিয়ে বক্ষ বিদীর্ণ করব।'

এ কথা বলার পর একটু হেসে বিল্বতী বলল, 'এ কথা ঠিকই যে গণিকারা অর্থের বিনিময়ে শরীর তুলে দেয়। কিন্তু তাদের মনও থাকতে পারে। বারবনিতা গৃহে যারা আসে তারা শুধু দেহপসারিণীর শরীরের খবর রাখে, মনের খবর রাখে না। তারা ভাবে সবটাই রূপজীবির ছলাকলা। তার মধ্যে যে কোথাও কখনও মনও লুকিয়ে থাকতে পারে সে ধারণা মানুষের থাকে না। মাতৃভূমি সুদূর সেই গান্ধার দেশের কথা আমার আজ কিছুই মনে নেই। এই মরু দুর্গকেই এখন আমি আমার দেশ বলে মনে করি। আমার মতো অনেক গণিকাও ওই একই কথা মনে ভাবে, এ দেশের মাটিকে ভালোবাসে, যাদের নানা দেশ থেকে একদিন এই চিতোরে আনা হয়েছিল।'

মহারানা উদয় তার কথা শুনে মৃদু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সত্যি তোমরা এ দেশকে ভালোবাসো?' প্রশ্নটা করে বিল্বতীর দক্ষিণ হস্ত নিজের কোলে টেনে নিলেন উদয়।

মহারানার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বিল্বতী বলল, 'হ্যাঁ, মহারানা। আমি সামান্য গণিকামাত্র। কিন্তু আপনি আমার প্রতি যে করুণা প্রদর্শন করেছেন তা কখনও পরিশোধ করার নয়। তবু আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সব সময় চেষ্টা করব আপনার পাশে থাকার। প্রয়োজনে আমি অস্ত্র ধরব আপনার জন্য। কুম্ভ প্রাসাদের গর্ভগৃহে আমার প্রবেশাধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু কেল্লা রক্ষার্থে অস্ত্র ধরতে তো আমাদের বাধা নেই। জহরব্রত পালন করার সৌভাগ্য লাভ না করতে পারি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বুকে তির গ্রহণ করতে তো বাধা নেই।'

উদয়, বারবনিতা বিল্বতীর কথা শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। আলাউদ্দিন, বাহাদুর শাহর আক্রমণে বহু যুগ আগে যখন চিতোরে প্রবল দুর্যোগ নেমে এসেছিল তখন মহারানি কর্ণাবতী সহ অন্য অনেক নারী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন,

boierpathshala.blogspot.com

জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারা অস্ত্র ধরেছিলেন তাদের স্বামী-পুত্র-পিতা-ভ্রাতাদের রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এ নারী তো কারো পত্নী নয়, কন্যা নয়, ভগিনী নয়!

চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিল্ববতীর শুভ্র মুখমণ্ডলে, তার শরীরে। তার স্তনের প্রতিবিম্ব ধরা দিচ্ছে সরোবরের জলে। কোনো এক বৃহৎ মৎসরাজ সেই বর্তুলাকার প্রতিবিম্বকে খাদ্যবস্তু ভেবে ঘাই মারল সেই প্রতিবিম্বে। অনেকটা জল ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল জলাশয়ের কিনারে বসা বিল্ববতীর শরীর। ভেজা বসনে প্রকট হয়ে উঠল বিল্ববতীর স্তনযুগল। তার দিকে তাকিয়ে উদয়ের মনে হল তার পাশে যে বসে আছে সে যেন এক জলপরী। জলাশয়ের গহীন থেকে সে এই মাত্র যেন উঠে এসে বসেছে উদয়ের পাশে! মহারানা তার কটিদেশ আলিঙ্গন করলেন। কী কোমল শরীর বিল্ববতীর। তার ঠোঁট ছুঁয়ে মহারানার চিবুক ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল নীচের দিকে। বিল্ববতী এবার উন্মুক্ত করে দিল তার বক্ষ। আকাশে চাঁদের গায়ে মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাকালে মনে হয় চাঁদ যেন চলমান। সেই চাঁদ যেন চলতে চলতে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হতে শুরু করল। তার সব আলো যেন শুষে নিচ্ছে বিল্ববতীর স্তনখাঁজ, শরীর! উদয়ের ঠোঁট স্পর্শ করল বিল্ববতীর কুচ। বিল্ববতীর বক্ষের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন মহারানা। বিল্ববতী প্রাচীন বল্কলের মতো মহারানার শরীর থেকে খসিয়ে ফেলতে লাগল বস্ত্রের আচ্ছাদন। এক সময় সোপানশ্রেণির শেষ ধাপ থেকে সরোবরের জলে নেমে এল দুই নর-নারী। সম্পূর্ণ নিরাবরণ তাদের দেহ। জলকেলি শুরু করল তারা। তাদের গোল করে ঘিরে ধরে মৎসকুল দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। তারপর সরোবরের থেকে উঠে উদয় বিল্ববতীর সঙ্গে মহলের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন নিশি যাপনের জন্য।

রাত্রির শেষ প্রহরে শৃগালের ডাকে সম্বিত ফিরল মহারানার। তিনি ভুলেই গেছিলেন তার জন্য প্রাসাদে অপেক্ষা করে আছেন সেনাপতি, অমাত্য, সর্দারের দল। কথাটা মনে হতেই তিনি বিল্ববতীর বাহুডোর থেকে নিজেকে মুক্ত করে মহল ত্যাগ করে শিবিকায় চেপে দ্রুত রওনা হলেন প্রাসাদের দিকে। আর অনেক আগেই অবশ্য সর্দারদের দল মহারানার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে নৈশ ভোজ না করেই ফিরে গেছেন যে যার গৃহে। উদয় যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন তখন চাঁদ অস্তমিত। শুকতারা ফুটে উঠেছে। সর্দারদের না দেখতে পেয়ে মহারানা তার শয়নকক্ষে চলে গেলেন।

৩

সূর্যোদয়ের কিছু সময়ের মধ্যেই কিন্তু আবার মহারানার প্রাসাদে হাজির হলেন অমাত্য সর্দারেরা। আগের রাতে বেশ অপমানিত বোধ করেই প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন তারা। কিন্তু তারা যখন মহারানার প্রাসাদ ত্যাগ করে নিজ নিজ গৃহের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় এক অশ্বারোহী চর এসে খবর দিয়েছে আকবর শেষ যেখানে ছাউনি স্থাপন করেছিলেন সেখান থেকে শিবির তুলে ফেলেছেন। অতিদ্রুত তিনি একদল অশ্বারোহী সেনা নিয়ে এগিয়ে আসছেন চিতোরের দিকে। একপক্ষকাল নয়, হয়তো বা আর ছয়-সাত দিবসের মধ্যেই পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হবেন সম্রাট। এ সংবাদ স্থির থাকতে দেয়নি শালব্রুমা সহ অন্য অমাত্যদের। দেশের মাটিকে তারা মায়ের মতো ভালোবাসেন, বুক দিয়ে আগলে রাখেন কেল্লাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সামন্ত সর্দাররাই মেবারের অভিভাবক। তাই মহারানার প্রতি গত রাতের অভিমান ভুলে তারা আবার রাজপ্রাসাদে ছুটে এসেছেন উদয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

boierpathshala.blogspot.com

শালব্রুমা সহ অন্য সামন্ত সর্দাররা যখন প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন তখন রাত্রি জাগরণের ফলে মহারানা গভীর নিদ্রামগ্ন। তার নিদ্রাভঙ্গ হয় সূর্যদেব যখন চিতোর কেল্লার মাথার ওপর অবস্থান করেন ঠিক তখন। কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। মহারানার সাক্ষরিত আদেশনামা নিয়ে সামন্ত সর্দারদের অতি দ্রুত কেল্লা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আশেপাশের ভূস্বামীদের থেকে সেনা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য।

মহারানার শয়নকক্ষের ঠিক বাইরেই একটি পিতলের তৈরি ঝুলন্ত গোলক আছে। কোনো একান্ত জরুরি পরিস্থিতি হলে সেই তাম্রগোলকে ঘা দেওয়া হয় মহারানার নিদ্রা ভঙ্গ করার জন্য। উদয় মেবারের সিংহাসনে আরোহন করার পর কোনওদিন সে গোলকে ঘা দিয়ে মহারানার নিদ্রা ভঙ্গের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে শালব্রুমা মহারানার প্রধান ভৃত্যকে গোলোকে ঘা দিতে বললেন। পাছে মহারানা কুপিত হন সে কথা ভেবে ভৃত্য প্রথমে ঘা দিতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু শালব্রুমা একে প্রধান সেনাপতি, তার ওপর তিনি আবার কন্যাদান করেছেন মহারানাকে। শালব্রুমা-কন্যা মহারানার অন্যতম মহিষী। কাজেই তিনি যখন দ্বিতীয়বার ভৃত্যকে গোলকে ঘা দিতে বললেন তখন আর তার নির্দেশ অমান্য করতে পারল না। কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে সে ঘা দিল গোলকে। ঝমঝম শব্দে মহল আলোড়িত করে বেজে উঠল সেই গোলক। বার কয়েক গোলকে ঘা দেবার পর মহারানার নিদ্রাভঙ্গ হল। পালঙ্কে উঠে বসে তিনি চাইলেন দ্বারের দিকে। মখমলের পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল খাস ভৃত্য। মহারানাকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে ভৃত্য বলল 'আমাকে মার্জনা করবেন মহারানা। সেনাপতি শালব্রুমা আমাকে গোলকে ঘা দিতে বাধ্য করলেন। সেনাপতি ও সর্দাররা মন্ত্রণা কক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। বিল্ববতীকে নিয়েই একটা সুখস্বপ্ন দেখছিলেন উদয়। স্বপ্নভঙ্গ হওয়াতে মৃদু রুষ্টভাবেই ঘুম জড়ানো চোখে তিনি শয্যা ত্যাগ করলেন।

মহারানা সোজা গিয়ে হাজির হলেন মন্ত্রণাকক্ষে। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য এ কক্ষে কোনো গবাক্ষ নেই। শুধু একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। মশাল জ্বলছে কক্ষে। সেখানে শালব্রুমা সহ জনা সাতেক সর্দার অপেক্ষা করেছিলেন মহারানার জন্য। মাথা ঝুঁকিয়ে প্রথামাফিক মহারানাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন তারা। মহরানার চোখে তখনও ঘুম জড়ানো। নিজের আসন গ্রহণ করলেন উদয়।

এক সর্দার মহারানার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনার নিদ্রাভঙ্গের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। গত রাতে চর খবর এনেছে বিধর্মী বাদশাহ তার পূর্বতন শিবির তুলে ফেলে অশ্বারোহীবাহিনী নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে চিতোরের দিকে। আর ছয়-সাত দিবসের মধ্যেই হয়তো চিতোর তোরণে পৌঁছে যাবে সেই নরাধম। আমাদের হাতে আর সময় নেই। এখনই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।'

উদয় তার কথা শুনে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'তার জন্য আমার নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন কী ছিল? আপনারাই তো যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা করতে পারেন।'

শালব্রুমা বললেন, 'প্রয়োজন আছে। পার্শ্ববর্তী নৃপতি, ভূস্বামীদের কাছে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে লোক পাঠাতে হবে। তার জন্য আপনার পাঞ্জার ছাপের প্রয়োজন। সেগুলো প্রস্তুত করে এনেছি।'

কথাটা শুনে উদয় নিস্পৃহ ভাবে বলে উঠলেন, 'কী আছে দিন? করে দিচ্ছি।' তখনও উদয়ের চোখে বিল্ববতীর সুখস্বপ্নের রেশ লেগে আছে।

boierpathshala.blogspot.com

একজন অমাত্য এরপর মহারানার হস্তে ভূষাকালি লেপন করলেন। মহারানা তার পাঞ্জার ছাপ দিতে লাগলেন আদেশনামাতে।

এ কাজ মেটার পর মহারানা বললেন, 'এবার তবে আমি ফিরে যাই?'

শালব্রুমা বললেন, 'তার আগে একটা অনুরোধ আছে মহারানার কাছে।'

'কী অনুরোধ?' জানতে চাইলেন উদয়।

প্রৌঢ় সেনাপতি শালব্রুমা নিজের শুভ্র শ্মশ্রুতে হস্ত চালনা করে বললেন, 'দিবা হোক বা রাত্রি, আজ থেকে মহারানা যেন এ প্রাসাদ ত্যাগ না করেন। যে কোনো সময় মহারানার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে।'

শালব্রুমার কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্য স্পষ্ট। অর্থাৎ মহারানা যেন বিল্ববতীর মহলে রাত্রি যাপন করতে না যান। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? সেনাপতির কথা শুনে তাই উদয় বললেন, 'প্রাসাদ ত্যাগ করলেও আমি তো নগরী ত্যাগ করি না। আমি কোথায় রাত্রিবাস করি তা আপনাদের জানা। রাত্রি কালে তেমন কোনো জরুরি প্রয়োজন হলে আপনারা সেখানে গিয়েও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।'

সামন্তদের ওপর রাজ্য চালনার যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করে মহারানা এত দিন অতিবাহিত করেছেন ভোগবিলাস নারী আর সুরা নিয়ে। কিন্তু শিয়রে যখন সমন তখনও মহারানার এত নিস্পৃহতা! বারবণিতার প্রতি এত আসক্তি! আর ওই বিল্ববতী নামের গণিকার জন্যই যে তার কন্যা মহারানার সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত তাও শালব্রুমা জানেন। মহারানা গত রাতেও বিল্ববতীর মহলে গিয়ে অমাত্যদের মিথ্যা অপেক্ষা করিয়ে তাদের কার্যত অপমানিত করেছেন। মহারানা উদয় সিংহের কথা শুনে সেনাপতি শালব্রুমা আর নিজের ক্ষোভ ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আমাকে মার্জনা করবেন রানা। আমি সদবংশজাত ক্ষত্রিয়। একলিঙ্গদেব আর চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা না দিয়ে আমি অন্ন স্পর্শ করি না। আমি গণিকা গৃহে বা বেশ্যালয়ে গমন করি না।'

মহারানার মুখের ওপর এই কথা বলার সাহস হয়তো অন্য কেউ দেখাতে পারতেন না। শালব্রুমা প্রধান সেনাপতি। তাছাড়া তিনি কন্যাদান করেছেন রানাকে। সে জন্যই হয়তো বা তিনি এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কথাটা বলে ফেলেছেন।

মহারানা প্রথমে ভাবলেন তিনি হয়তো ঘুম চোখে শালব্রুমার কথাগুলো ঠিক শোনেননি। কারণ তাকে এ কথা বলার স্পর্ধা কারো নেই। তাই উদয়, শালব্রুমাকে বললেন, 'কী বললেন? আবার বলুন।'

শালব্রুমা আবারও একই কথা বললেন তার উদ্দেশে।

তবে শালব্রুমা নিজেকে সদবংশজাত বললেও তার কথার এ উদ্দেশ্য ছিল না যে মহারানা অসদ বা নীচ বংশজাত। কিন্তু এই ব্যাপারটাই কানে ধরল মহারানার। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল তার। উদয় ব্যঙ্গ ভরে শালব্রুমাকে বললেন, 'এতই যখন বংশগরিমা তখন নীচ বংশজাতর হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন কী অভিলাষে? কোন সদবংশজাত সৈনিকের হস্তেই কন্যা সমর্পণ করতে পারতেন। চিতরেশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে নিজের আভিজাত্য বাড়াবার লোভ সম্বরণ করতে পারেননি কেন?'

এ কথা বলার পর উদয় মৃদু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'শুনুন সেনাপতি। এবার থেকে যদি আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তবে আপনাকে তা ওই বিল্ববতীর মহলে গিয়েই করতে হবে। আর আপনি যদি সেখানে যেতে অপারগ হন, যদি যুদ্ধে

boierpathshala.blogspot.com

যেতে না চান তবেও বিশেষ সমস্যা তৈরি হবে না। আপনি যাদের বারবণিতা বলে ঘৃণা করছেন, প্রয়োজন হলে তারাই অস্ত্র ধরবে চিতোর রক্ষার জন্য। তারাই যুদ্ধ জয় করবে।'

মহারানা উদয়ের হয়তো বিল্ববতীর বলা কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি শেষের কথাগুলো বললেন।

এত অপমান! কাঁপতে শুরু করলেন প্রায়-বৃদ্ধ শালব্রুমা। ক্রোধে মহারানার আঙুলগুলোও কাঁপছে। শালব্রুমার বদলে অন্য কেউ হলে হয়তো মহারানা এখনই তাকে চিতোর ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন। অন্য সর্দাররা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতবাক মহারানা ও তার প্রধান সেনাপতির কথোপকথন শুনে।

শালব্রুমা শেষ পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তবে তাই হোক। আপনি আপনার বারবণিতাদের নিয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন। তারা যদি পরাজিত হয় তখন না হয় আমাকে আবার ডাকবেন। আমি প্রস্তুত হয়ে রইলাম।'

উদয় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই ডাকব। তবে যুদ্ধ করার জন্য নয়, বিল্ববতীর প্রাসাদে যুদ্ধ জয়ের উৎসব পালন করার জন্য। আমন্ত্রণ রক্ষা করবেন কিন্তু।'

মহারনার সঙ্গে আর বাক্যালাপ না করে অপমানিত শালব্রুমা মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করলেন। আর উদয়ও ফিরে গেলেন তার নিজের কক্ষে।

৪

চিতোরে যখন এ ঘটনা ঘটল তখন সত্যি কিন্তু ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে মেবারের রাজধানীর দিকে এগোচ্ছিলেন আকবর। পাথুরে মাটির সঙ্গে ঘোড়ার নালের সংঘর্ষে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উঠছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন বিজুরি চমকাচ্ছে ধাবমান অশ্ববাহিনীর পায়ে। এই অগ্রবর্তী বাহিনীতে পাঁচশত অশ্বারূঢ় সেনা। তাদের পশ্চাতে আসছে হস্তিবাহিনী ও পদাতিক সেনারা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আকবরের বুকে। ধ্বংস করতে হবে মেবারের রাজধানী চিতোরগড়। রানা উদয় সিংহকে সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে জীবন ভিক্ষা করাতে হবে, যেমন করেছে অন্য রাজপুত রাজারা। কিন্তু কেন এই অদম্য প্রতিশোধ স্পৃহা মাত্র তেইশ বৎসর বয়সি যুবক সম্রাটের মনে? এর পশ্চাতে ক্ষুদ্র এক কাহিনি আছে।

শেরশাহ মুঘল পরিবারের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে দিল্লির সিংহাসন থেকে সম্রাট হুমায়ূনকে বিতাড়িত করে পাঠান সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। রাজ্যভ্রষ্ট হুমায়ূন যখন তার পরিবারের সদস্য ও সামান্য কিছু অনুচর নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন অমরকণ্টক পর্বতের অরণ্যভূমিতে আকবরের জন্ম হয়। রাজ্যচ্যুত হুমায়ূনের সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে তখন এক ভয়ঙ্কর অসহনীয় অবস্থা। যেখানেই তিনি যান না কেন তার পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে পাঠান সেনা। শত্রুর কোনো শেষ রাখতে নেই। হত্যা করতে হবে হুমায়ূনকে। আর ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে হত্যা করতে হবে তার শিশুপুত্রকে।

ভিস্তিঅলার জল রাখার চর্ম থলির মধ্যে সদ্যজাত শিশুপুত্রকে লুকিয়ে পথ অতিক্রম করছেন বেগম হামিদাবানু, পাছে দূর থেকে ঘাতকের তির এসে সন্তানকে বিদ্ধ করে সেই আশঙ্কাতে। পাঠান সম্রাটের ভয়ে ভারতের কোনো রাজারা যখন হুমায়ূনকে আশ্রয় দিতে সম্মত হল না তখন হুমায়ূন বাধ্য হয়েই রওনা হলেন মরুস্থলীর দিকে। যদি কোনো মরু

boierpathshala.blogspot.com

রাজ্যের রাজা অন্তত তার শিশুপুত্রের জীবন রক্ষার কথা ভেবে তাকে আশ্রয় দেন। কিন্তু সেখানেও তখন একই অবস্থা। যোধপুর, জয়শালমের, ভাট্টি, কোনো মরুরাজাই হুমায়ূনকে আশ্রয় দিতে রাজি হল না।

পাঠানরা সাধারণত মরু রাজ্যের দিকে পা বাড়ায় না। কী দরকার হুমায়ূনকে আশ্রয় দিয়ে পাঠানদের মরুস্থলীতে ডেকে আনার? রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করার। নানা মরুরাজ্য থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে অবশেষে একদিন মালবরাজ মালদেবের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হলেন হুমায়ূন। ধূর্ত মালদেব এক কূট কৌশলের সিদ্ধান্ত নিলেন। আশ্রয় দেবার নাম করে পরিবার সহ হুমায়ূনকে বন্দি করে তুলে দেবেন পাঠান সম্রাটের হাতে। আর তার বিনিময়ে সম্রাটের থেকে পাবেন প্রচুর সম্পদ।

এক দুর্গে হুমায়ূনকে আশ্রয় দিলেন মালদেব। তারপর সে খবর পাঠান সম্রাটকে পৌঁছে দেবার জন্য দিল্লির উদ্দেশে চর পাঠালেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ব্যাপারটা জানতে পেরে গেলেন হুমায়ূন। রাতের অন্ধকারে দুর্গ থেকে পালিয়ে অজানা পথে রওনা হয়ে গেলেন। তারা গিয়ে উপস্থিত হলেন মরুভূমিতে। সেখানে কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই, জীবনের স্পন্দন নেই, এক ফোঁটা জল নেই, বালু সমুদ্রের ওপর অগ্নিশিখা বর্ষণ করে প্রখর মরুসূর্য। মরুভূমির সেই ভয়াল রূপ দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন হামিদাবানু। কীভাবে তিনি রক্ষা করবেন তার সন্তানকে?

তবে শেষ রক্ষা হয়েছিল, বলা যেতে পারে নিতান্ত ভাগ্যের জোরেই সেই মরুভূমি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন আকবর পিতা হুমায়ূন। আশ্রয় পেয়েছিলেন অমরকণ্টকেরই এক গুপ্ত স্থানে। তারপর নানা ঘটনাপ্রবাহ। ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই পিতা-পুত্রের। কখনও গান্ধার-কাশ্মীর জয়, আবার কখনও পালিয়ে যাওয়া পিতৃভূমি তাতারে। অসীম কষ্ট সহ্য করে বেড়ে ওঠা আকবরের। কখনও খাদ্যাভাবে ঘাস সিদ্ধ করে খাওয়া, কখনও বা কান্দাহারে প্রবল শীত থেকে বাঁচার জন্য উন্মুক্ত আকাশের নীচে ভেড়াকে জড়িয়ে শুয়ে থাকা। আর এর মধ্যে দিয়েই বালক আকবরকে অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী করে তুলছিলেন হুমায়ূন। বালক আকবরই তখন হুমায়ূনের আশার শেষ চিরাগ।

ব্যর্থ হয়নি হুমায়ূনের আকাঙ্ক্ষা। শেষ পর্যন্ত আকবরের তরবারিই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল সেকেন্দর শাহর পাঠান বাহিনীকে। বালক পুত্রের তরবারির জোরে আবার দিল্লির মসনদ ফিরে পেলেন হুমায়ূন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেশি দিন সিংহাসন ভোগ করতে পারলেন না। পাঠাগারের মঞ্চ থেকে পড়ে মৃত্যু হল হুমায়ূনের।

সিংহাসনে বসলেন আকবর। এরপরও কিন্তু আকবরকে দুর্যোগ পোহাতে হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেছিল দিল্লি এবং আগ্রা। কিন্তু বৈরাম খাঁর সাহায্যে আবার তা পুনঃদখল করেছেন যুবক সম্রাট। সারা ভারতে বিস্তার করেছেন তার আধিপত্য। পিতার মুখে আকবর শুনেছিলেন যে হুমায়ূনের জীবনের কঠিনতম দিন ছিল মালদেবের চক্রান্তের হাত থেকে তার শিশুপুত্রকে রক্ষা করা। যে কোনো মুহূর্তেই সেখানে মৃত্যু নেমে আসতে পারত আকবরের জীবনে। আর মালদেবই সেই অবর্ণনীয় কষ্টের জন্য দায়ী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মালদেবের সেই শঠতার প্রতিশোধ নেবার দায় বর্তেছে আকবরের ওপর।

মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন তিনি। দখল করেছেন তার রাজ্য। মারবার ও অম্বর রাজ্যও তিনি ইতিমধ্যেই দখল করেছেন। কিন্তু এতদিন তিনি মেবারের দিকে হাত বাড়াননি। কিন্তু যেদিন খবর পেলেন রাজ্যভ্রষ্ট মালদেবকে উদয় সিংহ আশ্রয় দিয়েছেন সেদিন আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হয়নি। বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন মালদেবের

boierpathshala.blogspot.com

আশ্রয়দাতা উদয় সিংহের রাজধানী দখলের উদ্দেশে। আকবর ছুটে আসছেন চিতোরের দিকে।

সকাল বেলা মন্ত্রণা কক্ষ থেকে ফিরে আর ঘুম এল না উদয়ের। ক্রোধ ধীরে ধীরে প্রশমিত হবার পর উদয় বুঝতে পারলেন, যা ঘটেছে তা অভিপ্রেত নয়। বিশেষত এই সংকটময় পরিস্থিতিতে শালব্রুমাকে তিনি কথাগুলো না বললেই পারতেন। যদিও তাকে উত্তেজিত করার পিছনে শালব্রুমার অপমানজনক বক্তব্য অনেকাংশে দায়ী। শালব্রুমা বার্ধক্যের দিকে এগোচ্ছেন, হয়তো সেই কারণেই জামাতা আর মহারানার মধ্যে ব্যবধান ভুলে গেছিলেন তিনি। রাজা, মহারানা বা সম্রাটরা যখন ক্ষমতায় থাকেন তখন তারা কারো পিতা-ভ্রাতা-পুত্র-জামাতা নন, তারা শাসক, দেশের সর্বময় কর্তা, প্রভু। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও তাদের সঙ্গে বাক্যালাপের সময় তাকে দেশের সর্বময় কর্তার মর্যাদাই দিতে হয়, যা লঙ্ঘন করেছেন শালব্রুমা।

কিন্তু কী উপায় হবে এখন? আকবরের নেতৃত্বে তার যবন সেনা এগিয়ে আসছে চিতোর আক্রমণের জন্য। কথা আর তির একবার ছুটে গেলে তাকে আর ফেরানো যায় না। সেনাপতি শালব্রুমাকে ডেকে পাঠালে তিনি হয়তো আসবেন, কিন্তু তাতে মাথা নত হবে মহারানার। শালব্রুমার সাহায্যে হয়তো যুদ্ধে মহারানা জয় লাভ করবেন কিন্তু তাতে মহারানার সম্মান রক্ষা হবে না। নিভৃতকক্ষে বসে মহারানা এই সংকট থেকে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজতে লাগলেন। সময় এগিয়ে চলল, সূর্যদেব এক সময় চিতোর নগরীর ঠিক মথার ওপর উঠলেন তারপর এগিয়ে চললেন পশ্চিমের দিকে। দ্বিপ্রহরের আহার সাঙ্গ করে উদয় আবার ভাবতে বসলেন। কিন্তু তিনি কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। কীভাবে তিনি প্রতিহত করবেন আকবরের আক্রমণ? চিতোর কেল্লার পরিত্যক্ত প্রাচীন রাজপ্রাসাদ-কুম্ভপ্রাসাদের মাথায় দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে সূর্যদেব যখন দুর্গ প্রাকারের আড়ালে পরিক্রমণ শেষ করলেন তখন গাত্রত্থান করলেন মহারানা।

প্রতিদিনের মতোই দাসীর দল এদিনও দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে মহারানাকে চন্দনচর্চিত করে নতুন পট্টবস্ত্রে অলঙ্কারে সজ্জিত করার জন্য। প্রাসাদের ভিতর মর্মর আচ্ছাদিত প্রাঙ্গনে শিবিকা ও অঙ্গরক্ষীরা প্রস্তুত মহারানার অভিসার গমনের জন্য। মহারানা উদয় যখন প্রাসাদ ত্যাগ করে বিল্ববতীর মহলের দিকে যাত্রা করলেন তখন আঁধার নেমে এসেছে। দুর্গ প্রাকারে মশালের আলো জ্বলে উঠেছে। তবে এদিন যেন পথ ঘাটের পরিবেশ একটু অন্যরকম মনে হল মহারানার। সারাদিন প্রচণ্ড দাবদাহতে পুড়তে থাকে কেল্লা। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষরা নিজেদের গৃহ ছেড়ে বাইরে আসে না মরু সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রখরতা থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য। কিন্তু সূর্যাস্তের পরই পরিবেশের পরিবর্তন হয়। বিশেষত অন্ধকার নামার পর এ সময়টাই সর্বাপেক্ষা মনোরম।

মহারানা কুম্ভের প্রাচীন প্রাসাদের সন্নিকটে চিতোরের সব থেকে বড় জলাশয় গোমুখ কুণ্ড ও দুর্গ নগরীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কুম্ভ-জলাশয় থেকে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালাবার পর চিতোরবাসীরা গৃহ থেকে পথে নামে। তাদের কেউ যায় চিতোরেশ্বরী অথবা কুম্ভশ্যাম মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে, কেউ বা মেতে ওঠে নানা আমোদ প্রমোদে, গমন করে পাশা খেলতে অথবা বেশ্যালয়ে। রাজপথের পাশে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে পণ্য সাজিয়ে বসে বিক্রেতারা। চলমান সুরা ব্যবসায়ী চর্ম থলি অথবা ধাতব কলসে সুরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পিষ্টক বিক্রেতা আর মালিকার দল পথে নামে

boierpathshala.blogspot.com

তাদের পসরা নিয়ে। আলোতে, জনতার কোলাহল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে পথঘাট। এদিন কিন্তু শিবিকার ভিতর থেকে বাইরে তাকিয়ে চারপাশ অন্য দিনের তুলনায় বেশ ফাঁকাই মনে হল উদয় সিংহর। আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে চিতোরবাসী। তাদের অধিকাংশই কীভাবে তাদের প্রাণ সম্পদ রক্ষা হবে তা নিয়ে শলা করছেন নিজ গৃহে বসে। দোলায় দুলতে দুলতে চিন্তিত মহারানা এক সময় গিয়ে হাজির হলেন নগরপ্রান্তে বিল্ববতীর ক্ষুদ্র প্রাসাদের সমুখে।

৫

শিবিকা ত্যাগ করে পদব্রজে বিল্ববতীর মহলের প্রবেশ তোরণের দিকে এগোলেন উদয়। প্রতিদিনের মতোই তোরণদ্বার, মহল সেজে উঠেছে চিতোর নরেশকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। অঙ্গে সুগন্ধী লেপন করে স্বচ্ছ বক্ষ আবরণী, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত বিল্ববতী দাসীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহারানার প্রতীক্ষাতে। মহারানা মহলের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হবার পর তাকে ফুলমালা সুগন্ধীতে বরণ করে বিল্ববতী তাকে নিয়ে চলল মহারানা যে কক্ষে নিশি যাপন করবে সেই কক্ষে।

বিল্ববতীর সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন উদয়। মৃগনাভির সুগন্ধে মাদকতাময় পরিবেশ রচিত হয়েছে কক্ষের ভিতর। রূপোর প্রদীপ দণ্ডের ওপর একটা বিরাট ঘৃত প্রদীপ জ্বলছে। চন্দনকাঠের বিশাল পালঙ্কের ওপর সোনার সুতোয় বোনা মখমলের আচ্ছাদন, রাজহংসের পালকের নরম তাকিয়া, মিনা করা মরালগ্রীবার মতো সুরাপাত্র, স্ফটিকের পানপাত্র, তাম্বুলের স্বর্ণপাত্র, মহারানার সুখভোগের জন্য আরও নানা ধরনের উপাচারে সজ্জিত সে কক্ষ। পালঙ্কের মাথার ওপর বিরাট একটা ঝালরপাখা ঝুলছে। রজ্জু দ্বারা কক্ষের বাইরে থেকে এক দাসী বাতাস করছে সেই ঝালর দিয়ে।

পালঙ্কে উপবেশন করে মহারানা পানপাত্রের দিকে তাকালেন। বিল্ববতী ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সেই স্ফটিক পাত্র স্বর্ণাভ মদিরাতে পরিপূর্ণ করে মহারানার হস্তে সমর্পণ করল। খাটের ছত্রিতে হেলান দিয়ে বসে মদিরার পাত্র নিঃশেষ করে বিল্ববতীর দিকে সেটা আবার পুনরায় পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে দিলেন মহারানা। স্ফটিকের পানপাত্র দ্বিতীয়বার মদিরাপূর্ণ হলে সেটাতে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে শুরু করলেন তিনি। স্বর্ণাভ মদিরাপূর্ণ স্ফটিক পাত্র মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে প্রদীপের আলোতে। সেই আলো এসে পড়েছে মহারানার মুখমণ্ডলেও। সে মুখের দিকে তাকিয়ে বিল্ববতী স্পষ্ট বুঝতে পারল তাতে জেগে আছে দুঃশ্চিন্তার ছাপ।

‘আজ কোন কারণে চিন্তাগ্রস্ত? আজ কেমন যেন আনন্দহীন মনে হচ্ছে মহারানাকে?’

প্রশ্ন শুনে মহারানা উদয় ইশারায় তার পাশে বসতে বললেন বিল্ববতীকে। নির্দেশ পালন করল বিল্ববতী। মহারানা এক চুমুকে মদিরার পাত্র নিঃশেষ করে বললেন, ‘হ্যাঁ, গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ আমি। আর কয়েকদিনের মধ্যে চিতোরে এসে আছড়ে পড়বে আকবরের অশ্বারোহী বাহিনী। কিন্তু সেনাপতি শালব্রুমাও যুদ্ধে যোগ দিচ্ছেন না। সংকট থেকে মুক্তি লাভের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না আমি।’

‘কেন, তিনি যোগ দেবেন না কেন?’ জানতে চাইল বিল্ববতী।

মহারানা উদয় এবার সব ঘটনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করলেন গণিকা বিল্ববতীর কাছে। মহারানার কথা শুনে বিল্ববতী বলল, ‘আপনি বলেছেন গণিকারাই আপনাকে যুদ্ধে জয়লাভ করাবে আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে!’

boierpathshala.blogspot.com

মহারানা ম্রিয়মান ভাবে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। হয়তো বা তোমার বলা কথাগুলো আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর সে কথা শোনোতেই মনে হয় সব থেকে বেশি অপমানিত বোধ করেছেন সেনাপতি।'

মহারানার কথা শুনে বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ ভাবে বসে রইল বিল্ববতী। তারপর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল সম্রাটের সেনাবাহিনীর সংখ্যা কত?

উদয় জবাব দিলেন, 'শুনেছি, পদাতিক আর অশ্বারোহী বাহিনী মিলে পাঁচ সহস্র। তবে পাঁচশত অশ্বারোহী সেনা নিয়ে প্রথমে উপস্থিত হতে চলেছেন আকবর। আর তার কয়েক দিনের মধ্যে তার সঙ্গে এসে মিলিত হবে তার পদাতিক বাহিনী, হস্তিকুল আর কামানবাহী উষ্ট্রশকট।'

মহারানার জবাবের পর আবারও কিছুক্ষণ বিল্ববতী কী যেন ভাবল। তারপর সে বলল, 'দুশ্চিন্তা মুক্ত হন মহারানা। আপনার মুখের কথাই সত্যি হবে।'

বিল্ববতীর কথা বুঝতে না পেরে মহারানা উদয় বললেন, 'সত্যি হবে মানে?'

বিল্ববতী বলল, 'এই চিতোর নগরীতে এক সহস্র গণিকা আছে। তারা অস্ত্র ধরবে আপনার জন্য, পরাস্ত করবে যবন সম্রাটকে।'

এত সংকটময় পরিস্থিতিতেও এই নারীর কথা শুনে হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না মহারানা। শিশুসুলভ কথা বলছে বিল্ববতী। তিনি বিল্ববতীর কটিদেশ আলিঙ্গন করে হেসে বললেন, 'এ কথা হয়তো সত্যি যে তুমি আমার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারো। কিন্তু তা বলে প্রমীলা বাহিনী নিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! আকবরের মতো রণকৌশলী, নিপুণ যোদ্ধা ভারতবর্ষে কেউ নেই। সদ্য যৌবনে পদার্পণ করলেও এরই মধ্যে সে সারা ভারতবর্ষ জয় করে নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র নারী বাহিনী কী করবে? হয়তো একটা খণ্ডযুদ্ধ হবে। অথবা বালকের দল যেমন যুদ্ধ ক্রীড়ায় লিপ্ত হয় তেমন কিছু একটা। তোমরা বন্দি হবে মোগল সেনার হাতে। তারপর তারা তোমাদের দিয়ে কামজ্বালা মেটাবে। আঁচড়ে কামড়ে শেষ করবে তোমাদের দেহ।'

এ কথা বলে মহারানা আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। চিন্তার মেঘ যেন ঘিরে ধরল তাকে। তিনি বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ নিয়েও আমি শঙ্কিত। সেনাপতি শালব্রুমা যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ না দেন তবে আমার অনুগত সর্দার দিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আমি। পাহাড়ের ওপর প্রাকারবেষ্টিত চিতোর নগরী। ওপরে ওঠার একটাই মাত্র পথ। হয়তো বা সম্রাটের ওপরে উঠে আসা সহজ হবে না।

'কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা যদি পরাজিত হই তবে কী হবে?'

'শোনো বিল্ববতী, আরাবল্লী পর্বতের পাদদেশে পিছোলা হ্রদের তীরে আমার একটা প্রাসাদ আছে। ভিল উপজাতি অধ্যুষিত সে জায়গা এখানে থেকে বেশ দূরে এবং নিরাপদ স্থান। আকবর চিতোরে এসে উপস্থিত হবার আগেই আমি তোমাকে কয়েকজন রক্ষীর সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দেব। যুদ্ধে যদি আমি জয়লাভ করি তবে তুমি আবার এখানে পদার্পণ করবে। আর যুদ্ধের পরিস্থিতি, ফলাফল যদি আকবরের অনুকূলে যায় তবে চিতোর কেল্লা ত্যাগ করে আমি পিছোলা হ্রদের তীরে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সেখানেই আমি আমার রাজধানী গড়ে তুলব।'

বিল্ববতী বলল, 'না মহারানা। আপনাকে রেখে চিতোর ত্যাগের কোনো প্রশ্নই নেই। আপনি বৃথাই চিন্তিত হচ্ছেন। সে পরিস্থিতির সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে না। আপনার

boierpathshala.blogspot.com

সেবাদাসী বিল্ববতীর ওপর ভরসা রাখুন মহারানা। আপনার সেনাপতি শালব্রুমাকে আমি বুঝিয়ে দেব, ভাগ্যের ফেরে আমি বারবণিতা ঠিকই, কিন্তু এই বারবণিতাই চিতোর রক্ষা করতে পারে।'

মহারানা উদয় বিল্ববতীর শিশুসুলভ কথার জবাবে কী বলবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না। মহারানার হাত দুটে জড়িয়ে ধরে বিল্ববতী আবারও বলল, 'আমার ওপর ভরসা রাখুন মহারানা, বিশ্বাস রাখুন। আকবরকে আমি পরাজিত করবই।'

এতদিন বিল্ববতীর কথার মধ্যে শুধু প্রেম-ভালোবাসার কোমলতাই শুনেছেন উদয়, আজ যেন অন্য এক দৃঢ়তা বিল্ববতীর কণ্ঠে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে মহারানা একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু কীভাবে? আকবরের তুর্কি তরবারির সামনে সারা ভারতের রাজা-সুলতানরা দাঁড়াতে পারছে না। সে তরবারীর সামনে দাঁড়াবার জন্য তোমার অস্ত্র কোথায়?'

বিল্ববতী বলল, 'অস্ত্র আছে মহারানা। ও সব নিয়ে আপনি ভাববেন না। তবে মহারানার কাছে একটা অনুরোধ আছে সেবিকার।'

'কী অনুরোধ?' জানতে চাইলেন উদয়।

বিল্ববতী বলল, 'যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসার পর কুম্ভপ্রাসাদের ভূগর্ভস্থ প্রাচীন কক্ষে জহরব্রত পালন করা নারীদের পবিত্র চিতাভস্ম মিশ্রিত যে ধূলিকণা আছে যা সংগ্রহ করার অধিকার দিতে হবে আমাদের।'

মহারানা একটু চুপ থেকে বললেন, 'যদি সত্যিই তুমি আকবরকে পরাজিত করতে পরো তবে সে অধিকার তুমি পাবে। কিন্ত ও ধূলিকণা তো বিবাহিত নারীরা তাদের সিঁথিতে লেপন করে কুমকুমে মিশ্রিত করে, তার স্বামীর মঙ্গলকামনার জন্য। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে কিছু গণিকার নিশ্চয়ই স্বামী-সন্তান আছে। কিন্তু তুমি এই ধূলিকণা নিয়ে কী করবে?'

একটু চুপ করে থেকে বিল্ববতী বলল, 'ওই পবিত্র ভস্ম মিশ্রিত ধূলিকণা যদি আমি সংগ্রহ করতে পারি তবে আমি নিজেকে অন্তঃপুরবাসিনী অন্য নারীদের সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করব।'

এ কথা বলার পর মহারানার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে বিল্ববতী বলল, 'দুশ্চিন্তা মুক্ত হন মহারানা। কালকের কথা ভেবে আজকের এই মধুযামিনীকে চলে যেতে দেবেন না।'

মহারানা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা। ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই মধুরাতকে ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবে না।' মহারানা নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন বিল্ববতীকে। ডুবে যেতে লাগলেন, হারিয়ে যেতে লাগলেন তার শরীর সুধাতে।

ঠিক এই সময় চিতোর কেল্লার অভ্যন্তরে শালব্রুমার গৃহের এক নিভৃত কক্ষে মুখোমুখি দঁড়িয়ে ছিলেন পিতা-পুত্রী। এ-কক্ষেও একটা প্রদীপ জ্বলছে। তার আলোতে স্পষ্ট বেদনা জেগে আছে তাদের দুজনেরই মুখে। পিতা শালব্রুমার অপমানের কথা কানে পৌঁছতে দেরি হয়নি রাজমহিষীর। মহারানা প্রাসাদ ত্যাগ করার পরই সে ছুটে এসেছে পিতা গৃহে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। দীর্ঘক্ষণ নিজেদের বেদনার কথা বিনিময় হয়েছে তাদের দুজনের মধ্যে। মহারানা কর্তৃক শালব্রুমার অপমানের কথা, মহারানা কর্ত,ক তার মহিষীকে অবহেলার কথা। এখন এই মুহূর্তে তারা দুজনেই ভাবছেন তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থার ব্যাপারে।

boierpathshala.blogspot.com

শালব্রুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজও মহারানা সেই বারবণিতার গৃহে গেলেন! অর্থাৎ তিনি তার সিদ্ধান্তে অবিচল। আমাকে তিনি আর আহ্বান করবেন না। তাদের দিয়েই যুদ্ধ করাবেন তিনি। ধ্বংস হতে চলেছে চিতোরগড়। না, আর কিছুই করার নেই। আতঙ্কে মানুষ কাল থেকেই চিতোর ত্যাগ করতে শুরু করবে। বিশেষত নারীরা। যারা মোগলবাহিনীর লালসার শিকার হতে চায় না।'

কথাটা শুনে কন্যা বলল, 'কিন্তু আমি কী করব পিতা? স্বামীকে ত্যাগ করে যদি পলায়ন করি লোকে আমাকে কুলত্যাগিনী বলবে। আবার যদি প্রাসাদে থেকে যাই তবে...।'

কন্যার অসম্পূর্ণ কথাটা বুঝতে অসুবিধা হল না শালব্রুমার। মোগল সেনাদের দ্বারা তার সতীত্ব নষ্ট হবার ভয়ে আতঙ্কিত তার কন্যা।

আর তারপরই রাজমহিষী হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, পথ একটা আছে।'

'কী পথ?' জানতে চাইলেন শালব্রুমা।

তাকে চমকে দিয়ে কন্যা বলে উঠল, 'জহরব্রত পালন করব আমি। যুদ্ধ শুরু হলে মহারানা কুম্ভ প্রাসাদের সেই পবিত্র কক্ষে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেব আমি। যেমন একসময় আত্মসম্মান বাঁচাতে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছেন বহু নারী। আমিও সেই নারীদের অনুসরণ করব।'

ঘি-এর প্রদীপটা হঠাৎই দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। আঁধার নেমে এল শালব্রুমার কক্ষে। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন শালব্রুমা। তিনি অনুভব করলেন তার পাদস্পর্শ করছে তার কন্যা। তারপর রাজমহিষী পিতাগৃহ ত্যাগ করে রওনা হয়ে গেল প্রাসাদের উদ্দেশে।

৬

তিন দিন পর দ্বিপ্রহরে কেল্লা বুরুজের মাথায় দাঁড়ানো এক রক্ষী দেখতে পেল প্রচণ্ড এক ধূলিঝড় দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে চিতোরের দিকে। সে চিৎকার করে উঠল 'আসছে! আসছে! যবন বাহিনী আসছে।' তার চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীকে সতর্ক করার জন্য ঢেড়া বাজতে লাগল চতুর্দিকে। অবশ্য এ ক'দিনে চিতোর ছেড়ে বহু মানুষ অন্যত্র পলায়ন করেছে অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা ভেবে। সেই ঢেড়ার শব্দ পৌঁছে গেল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মহারানা উদয়ের কানে। একইসঙ্গে বিল্ববতীর মহলে ও শালব্রুমার গৃহেও।

মহারানা তাঁর ভাগ্য তখন ছেড়ে দিয়েছেন বিল্ববতীর হাতে, বলা ভালো অদৃষ্টের হাতে। শালব্রুমা তার কক্ষে বসে পাথরের মূর্তির মতো চেয়ে আছেন তলোয়ারটার দিকে। যদি মহারানা এখনও একবার তাকে ডাক পাঠান তবে সব অভিমান ভুলে তিনি ওই তলোয়ার তুলে নেবেন চিতোর রক্ষার জন্য। আর বিল্ববতী সেই ঢেড়ার শব্দ শুনে তার প্রস্তুতি শুরু করল। নগর গণিকার দল সেই শব্দ শুনে তার মহলের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের তেমনই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল বিল্ববতী। আর রাজপ্রাসাদের রানিমহলে সেই শব্দ পৌঁছতে আতঙ্কে কান্নার ঢেউ উঠল রাজমহিষীদের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজনই শুধু স্থির, অবিচল। সে শালব্রুমার দুহিতা। একজন দাসী তার জন্য

boierpathshala.blogspot.com

মধ্যহ্নভোজন নিয়ে উপস্থিত হতে সে বলল, 'আজ আমার ব্রত। খাদ্য স্পর্শ করব না। একটা শিবিকা ডাক। গোমুখকুণ্ডে স্নান করতে যাব।'

অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে চিতোরে এসে উপস্থিত হলেন আকবর। খাড়া পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত প্রাকার ঘেরা চিতোরগড়। একটি মাত্র পথ ওপরে ওঠার। সে পথ দিয়ে কেল্লার প্রধান প্রবেশদ্বারে পৌঁছতে সর্পিল পাকদণ্ডী পথে আরও বেশ কয়েকটা তোরণ যে তাকে অতিক্রম করতে হবে সে খবর আকবরের জানা আছে।

পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আকবর তাকালেন কেল্লার দিকে। কেল্লা প্রাকারে কিছু রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। তবে নিচ থেকে ছোঁড়া তিরের নাগালের বাইরে তারা। আকবর হিসেব করে দেখলেন যদি চিতোর কেল্লার মূল তোরণে উপস্থিত হতে হয় তবে অন্তত সাতটা তোরণ অতিক্রম করে তাকে ওপরে উঠতে হবে। নিচ থেকে পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে সেই বিশালাকৃতির কয়েকটা তোরণ দৃশ্যমান। এমনও যদি হয় ওই তোরণগুলো অতিক্রম করার সময় কোনো প্রতিরোধ এল না তবুও সেই তোরণের দরজা অতিক্রম করে ওপরে পৌঁছতে অন্ধকার নেমে যাবে। আর তারপর যদি রাজপুত বাহিনী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গিরিবর্ত্মের আড়াল থেকে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মোগলবাহিনী। অবস্থা হবে জাঁতাকলে আটকে থাকা মূষিকের মতো।

কাজেই বিচক্ষণ রণকৌশলী সম্রাট সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওপরে ওঠা শুরু করবেন। দ্বিপ্রহরে তিনি পৌঁছে যাবেন চিতোর কেল্লার প্রধান তোরণে। অশ্বারোহী বাহিনী দীর্ঘ পথ পরিক্রম করে এসেছে। তাদের বিশ্রামেরও দরকার। পরদিন ভোরের আলো ফুটলে ক্লান্তিমুক্ত মোগল সেনারা নব উদ্যমে রাজপুত বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে। একথা ভেবে নিয়ে সম্রাট পাহাড়ের পাদদেশে তার সৈনিকদের শিবির স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন।

সম্রাটের তাঁবু খাটানো হল। তার ভিতরে বসে সম্রাট নিচ থেকে পাহাড়ের ওপর দুর্গটা লক্ষ করতে লাগলেন। না, রাজপুত সৈন্যদের মধ্যে তেমন কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ করা যাচ্ছে না। একটা তির বা পাথরের খণ্ড ওপর থেকে শিবিরের দিকে উড়ে আসছে না। তবে কি উদয় সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি শুরু করেছেন? ভাবতে লাগলেন আকবর। তার সেনারা কেউ চুলা জ্বেলে রুটি পাকাবার কাজে, পাথরে ঘষে ঘষে অস্ত্রে শান দেবার কাজে, ধনুকের ছিলা টানা সহ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দুপুর গড়িয়ে চলল বিকালের দিকে।

কিন্তু বিকাল নাগাদই ঘড়ঘড় শব্দ তুলে উন্মুক্ত হয়ে গেল নিচের কেল্লার বিশাল তোরণের লৌহ কপাট। না, গুম্ফঅলা অসিধারী রাজপুত সেনারা নয়, প্রজাপতির ঝাঁকের মতো রমণীর দল বেরিয়ে আসতে লাগল কেল্লা তোরণ থেকে। পরনে তাদের লম্বা ঝুলের কাচ আর চুমকি বসানো রঙিন ঘাগরা। উর্ধাঙ্গ রঙিন চুনরি দ্বারা আবৃত। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। সত্যি যেন এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি। শুধু একমাত্র বিল্ববতীর শরীরই মখমলের কালো আবরণে আবৃত।

পাথুরে মাটিতে এক সহস্র নারী নূপুরের ছমছম শব্দ তুলে নামতে শুরু করল নীচের দিকে। সেই শব্দ গিরিবর্ত্মে প্রতিধ্বনিত হয়ে পৌঁছে গেল আকবরের শিবিরে। ও কীসের শব্দ? সবাই সচকিত হয়ে তাকাল ওপর দিকে। তারা দেখতে পেল একটা রঙিন ঘূর্ণি যেন ছমছম শব্দ তুলে গিরি পথে পাক খেতে খেতে নেমে আসছে নীচের দিকে! পোশাক দেখে তো ওদের নারী বলেই মনে হচ্ছে! তবে তারা পুরুষ নয়তো? নারীবেশে তারা এগিয়ে আসছে নাতো অতর্কিতে আক্রমণ হানার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে গেল

boierpathshala.blogspot.com

মোগল সেনা। অসি কোষমুক্ত করে, ধনুকে তির রচনা করতে লাগল সেই রঙিন ঘূর্ণির জন্য।

সম্রাট আকবরের হীরক অঙ্গুরীয় শোভিত আঙুলগুলো স্পর্শ করল মখমলের সামনে শায়িত তাঁর তরবারির হাতল। চঞ্চল হয়ে উঠল শিবিরের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বগুলোও। পা ঠুকতে লাগল তারা। সূর্য তখন ডুবতে বসেছে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, ঠিক সেই সময় সেই প্রমীলা বাহিনী নিচে নেমে উপস্থিত হল আকবরের ছাউনিতে। না, তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই, আর তাদের পদযুগল দেখে রমণী বলেই মনে হচ্ছে। মোগল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘিরে ধরল তাদের। এক সেনাপতি কর্কশ স্বরে জানতে চাইল, 'তোমরা কারা?'

কালো পোশাকে আবৃত এক রমণী জবাব দিল, 'আমরা চিতোরের নগর নটী, বারবণিতার দল। চিতোর ত্যাগ করে সম্রাটের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি।'

আশ্রয় নিতে এসেছে বারবণিতার দল! চুনরি দিয়ে মুখ আর উর্ধাঙ্গ আবৃত সবার। তবুও সন্দেহ নিরসনের জন্য সেনাপতি বলল, 'চুনরি হটাও। দেখি তোমরা সত্যি জেনেনা কিনা?'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সেই কালো বস্ত্রখণ্ডে আবৃত নারী তার মুখ থেকে প্রথমে চুনরিটা সরালো। হ্যাঁ, সে নারী, এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। সে নারী এরপর তার সঙ্গিনীদের নির্দেশ দিল তাদের শরীর থেকে সম্পূর্ণ চুনরি খসিয়ে ফেলতে। নির্দেশ পালন করে তারা মুহূর্তের মধ্যে চুনরি খসিয়ে ফেলল মাটিতে। সেনাপতি আর মোগল বাহিনী অবাক হয়ে দেখল তাদের সামনে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী রমণীর দল। চুনরির নীচে তাদের কোনো বক্ষ আবরণী বা অন্তর্বাস নেই। অন্ধকার নামার আগে দিনের শেষ আলো এসে পড়েছে তাদের উন্মুক্ত বক্ষে। তারা যেন আহ্বান জানাচ্ছে মোগল সেনাদের। নারীদের ঠোঁটের কোণের হাসিতে, চোখের চাহনিতে আলিঙ্গনের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

মোগল সেনাপতি বুঝতে পারল, কথাটা নিশ্চয় মিথ্যা নয়। এই নারীকুল বারবণিতার দল। না-হলে অচেনা পুরুষদের সামনে এমন লজ্জাহীনা কখনও হতে পারত না। সেনাপতি এরপর তাকাল সেই রূপসীর দিকে। তার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত হলেও তার শরীর কিন্তু তখনও কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত। হয়তো বা উন্মুক্ত হবার প্রত্যাশাতেই তার দিকে তাকাল সেই মোগল সেনাপতি। কিন্তু সেই রমণী বলল, 'আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি চিতোরের গণিকাশ্রেষ্ঠা। একমাত্র তার সামনেই শরীরের আবরণ উন্মোচন করব আমি। তাঁর কাছেই আমি নিবেদন করতে চাই নিজেকে। আর তাকে আমার বেশ কিছু জরুরি সংবাদ দেবার আছে।'

এ কথা বলার পর সে তার সঙ্গিনীদের দেখিয়ে সেনাপতিকে বলল, 'তবে আপনার সেনারা কেউই অভুক্ত থাকবে না। চিতোর কেল্লা ত্যাগ করে এসেছি আমরা। এই নারীকুল এখন মোগল সম্রাটের সম্পত্তি। সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুত সবাই। আশা করি, তারা সম্রাট সেনাদের পথের ক্লান্তি দূর করে তৃপ্ত করতে পারবে।' বিল্বতীর এ কথা শুনে ঝিলিক দিয়ে উঠল মোগল সেনাপতির চোখ। সত্যিই এই রূপসী নারীর দল তাদের মনোরঞ্জন করবে! তাদের কামার্ত চাহনি ঘুরতে শুরু করল অর্ধনগ্নিকাদের স্তনের ওপর।

বিল্বতীর কথা শুনে সেনাপতি বলল, 'তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি সম্রাটকে গিয়ে তোমার বক্তব্য জানাচ্ছি।'

boierpathshala.blogspot.com

সম্রাটের তাঁবুতে বিল্ববতীর যখন ডাক এল তখন সূর্য ডুবে গিয়ে দ্রুত অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আর গণিকার দলও সৈনিকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের আলিঙ্গন করতে শুরু করেছে। কোনো কোনো মোগল সৈনিক আবার উপোসি বাঘের মতো নিজেরাই এগিয়ে আসছে বারবণিতাদের দিকে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা খুব কঠিন কাজ। মোগল সেনার সংখ্যা পাঁচশত আর বারবণিতার সংখ্যা এক সহস্র। সারা রাত বাকি পড়ে আছে। একাধিক নারীকে সম্ভোগ করতে পারবে তারা। মেটাতে পারবে তাদের যৌন ক্ষুধা।

সম্রাটের তাঁবুর ভিতর একটা মশাল জ্বলছে। মেঝেতে পারস্য গালিচা পাতা। তার ওপর মখমলের বিছানায় তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে বসে ভারত সম্রাট। পাশে শোয়ানো আছে তার তলোয়ার। সম্রাটও বিস্মিত হয়েছেন বারবণিতাদের আগমনে। বিল্ববতী প্রবেশ করল তার তাঁবুতে। বিল্ববতী তাঁবুতে প্রবেশ করে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মশালের আলো এসে পড়েছে বিল্ববতীর মুখে। সে মুখ দেখে সম্রাট অবাক হয়ে গেলেন। এত রূপসি নারী! যেন সে কোনো সাধারণ নারী নয়। জন্নত থেকে কোনো হুরী এসে আবির্ভূত হয়েছে তাঁবুতে। দিল্লির বাদশাহী হারেমে এত সুন্দরী নারী একজনও নেই।

কিছুক্ষণ সে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সম্রাট তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি? তোমাকে তো ঠিক সাধারণ গণিকা বলে মনে হচ্ছে না?'

বিল্ববতী জবাব দিল, 'আমি বিল্ববতী। আপনার অনুমান ঠিক জাঁহাপনা। আমি চিতোরের গণিকাশ্রেষ্ঠা। মহারানা উদয় সিংহের অঙ্গ সেবিকা আমি। সাধারণ মানুষ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।'

কথাটা শুনে সম্রাট জানতে চাইলেন, 'তুমি তবে রানাকে পরিত্যাগ করলে কেন?'

বিল্ববতী বলল, 'নিজের প্রাণ রক্ষা কে না চায়? প্রধান সেনাপতিই যখন যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তখন রানার পরাজয় তো অবশ্যম্ভাবী।' এই বলে মৃদু হাসল সে।

সম্রাট আকবর বললেন, 'তার মানে?'

বিল্ববতী বলল, 'মহারানা নাকি দুর্ব্যবহার করেছেন প্রধান সেনাপতির সঙ্গে। তাই তিনি যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। মহারানা উদয় কোনোদিন তেমন কোনো যুদ্ধে যাননি। সৈন্য পরিচালনা করতে তিনি অক্ষম। সম্রাটের চিতোর জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যুদ্ধ হয়তো একটা হবে। কিন্তু তা অতি সামান্য। কাল দ্বিপ্রহরেই সম্রাটের বিজয় পতাকা উড়বে চিতোর কেল্লাতে। সম্রাট যদি অনুমতি দেন তবে আমি আসন গ্রহণ করতে পারি?'

এমনই কোনো কিছু যে একটা ঘটেছে তা মনে মনে অনুমান করেছিলেন সম্রাট। খুশিতে নেচে উঠল তার মন। তিনি ইশারাতে বসতে বললেন বিল্ববতীকে। সম্রাটের কিছুটা তফাতেই বসল বিল্ববতী। বসার সময় তার বস্ত্রে কালো রেশমের আবরণটা কিছুটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। যুবক সম্রাটের চোখে পড়ল বিল্ববতীর গাঢ় বক্ষ বিভাজিকা। সে স্থানের ওপর যে সম্রাটের দৃষ্টি পড়েছে তা যেন বুঝতে পারল বিল্ববতী। আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। সম্রাট আকবর এরপর কেল্লা সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন বিল্ববতীকে। কেল্লার জনসংখ্যা কত? রানার হয়ে যারা অস্ত্র ধরতে পারে তেমন সৈন্য সংখ্যা কত? কেল্লাতে অস্ত্রাগারের অবস্থান কোথায়? তোষাখানা কোথায়? মন্দিরগুলোতে কোনো সম্পদ গোপন করা আছে কিনা? এমন নানা প্রশ্ন। তার মতো করে সম্রাটের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে লাগল বিল্ববতী। আর সেই সঙ্গে বিল্ববতীর শরীর

boierpathshala.blogspot.com

থেকে যেন ধীরে ধীরে খসে পড়তে লাগল কালো রেশমবস্ত্রের আচ্ছাদন। ক্রমশ প্রকট হতে শুরু করল তার বক্ষ বিভাজিকা। তারপর উন্মোচিত হতে লাগল বিম্ববতীর সুডৌল বিম্ববক্ষ। যুবক সম্রাট চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারলেন না সেদিক থেকে।

যুবক সম্রাট কথা বলতে বলতে যেন সম্মোহিত হয়ে যেতে লাগলেন সেই বক্ষের দিকে তাকিয়ে। বিম্ববতীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠতে শুরু করেছে। তার মনে পড়ল মহারানার কথা। তিনি বিম্ববতীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন সম্রাটের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বিম্ববতীর অস্ত্র কই? বিম্ববতী তার আসল অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। হতে পারেন আকবর সম্রাট। কিন্তু তিনি তো পুরুষ। যে কোনো পুরুষকে ঘায়েল করার অমোঘ অস্ত্র বিম্ববতীর এই স্তনযুগল। অজগরের দৃষ্টি যেমন শিকারকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তেমনই তার স্তনযুগল আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যুবক সম্রাটকে।

বিম্ববতী এরপর হঠাৎই সম্পূর্ণ খসিয়ে ফেলল তার শরীরের আচ্ছাদন। তাকে কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন সম্রাট। মশালের আলোতে সম্রাটের চোখের সামনে জেগে আছে বিম্ববতীর নিটোল বিম্বফলের মতো স্তনযুগল, আর সেই শুভ্র স্তনে আঙুরের মতো কৃষ্ণ স্তনবৃন্ত!

বিম্ববতী সরে আসতে লাগল সম্রাটের দিকে। আর সম্রাটের হস্তও যেন নিজের অজান্তে এগোতে লাগল বিম্ববতীর নরম স্তন স্পর্শ করার জন্য। বিম্ববতী সম্রাটের একদম কাছে সরে এল। সম্রাটের হীরক অঙ্গুরীয়খচিত আঙুল প্রায় বিম্ববতীর স্তনবৃন্ত স্পর্শ করে ফেলেছে, ঠিক এমন সময় চিতোর কেল্লার মাথার ওপর থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠে দাঁড়াল বিম্ববতী। বিস্মিত, হতচকিত সম্রাট দেখলেন বিম্ববতীর হাতে সম্রাটের তলোয়ার! যেটা কোষ মুক্ত করতে উদ্যত বিম্ববতী। এ কোনো কোমল নারী নয়, ভারত সম্রাটের প্রতি তার চোখে ফুঠে উঠেছে তীব্র ঘৃণা আর হিংস্রতা।

সে বলে উঠল, 'যে স্তন মহারানা স্পর্শ করেন সেই স্তন স্পর্শ করার দুঃসাহস আপনার কীভাবে হল?' এই বলে সে তলোয়ার কোষমুক্ত করে তা চালনা করল সম্রাটকে লক্ষ করে। আকবর অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় এক পাশে সরে গিয়ে রক্ষা করলেন নিজেকে। তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে আবারও তার দিকে এগিয়ে এল বিম্ববতী। না, এভাবে বারবার তলোয়ারের আঘাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। বিম্ববতীর দ্বিতীয় আঘাতটাও কোনোরকমে এড়িয়ে গেলেন সম্রাট। তারপর তাঁবুর ভিতর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। কিন্তু বাইরের পরিস্থিতি তখন আরও ভয়ঙ্কর। মোগল সৈনিকরা তখন কেউ পালাচ্ছে, আবার কেউ মৃত্যু যন্ত্রণাতে ছটফট করছে।

বিম্ববতী কেল্লাতে একজন বারবণিতাকে নির্দেশ দিয়ে এসেছিল যে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের বিশাল ঘণ্টাটা নির্দিষ্ট সময় বাজাতে। ওটাই ছিল সংকেতধ্বনি। প্রত্যেক বারবণিতা তার ঘাগরার নীচে জানুতে চর্ম রজ্জু দিয়ে বেঁধে এনেছিল তীক্ষ্ন ছুরিকা। ঘণ্টাধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তা তারা বসাতে শুরু করেছে আলিঙ্গনরত, কামার্ত মোগল সৈনিকদের বুকে। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে মোগল সৈনিকদের আর্তনাদে। তাঁবু থেকে সম্রাটের পিছন পিছন উদ্যত তলোয়ার হাতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বিম্ববতী। সম্রাটকে দেখতে পেয়ে তার দিকে অস্ত্র হাতে ছুটে আসতে লাগল আরও কিছু বারবণিতা। সম্রাট বুঝতে পারলেন তার আর কিছু করার নেই। কোনওরকমে একটা ঘোড়ায় উঠে পালাবার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ভারত সম্রাট আকবর। পিছনে পড়ে রইল তার হতাহত মোগল সৈনিকরা।

boierpathshala.blogspot.com

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। দুর্গ প্রাকারের ওপর থেকে রক্ষীরা দেখতে পেল নীচে মোগলদের তাঁবুগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। সে খবর দেবার জন্য মহারানার প্রাসাদের দিকে ছুটল তারা। কয়েকজন গণিকা নিহত বা আহত হলেও সে সংখ্যা নগণ্য। তাদের দেহগুলোকে মোগলদের ঘোড়াগুলোর পিঠে বেঁধে নিয়ে বিজয়িনী বিল্বতী তার সহচরীদের নিয়ে কেল্লাতে ফেরার পথ ধরল। মহারানাকে দেওয়া কথা রাখতে পেরেছে সে। বারবণিতা বাহিনী পরাস্ত করেছে ভারত সম্রাট আকবরকে। ভোররাতে চিতোর কেল্লাতে বিল্বতীর সঙ্গে ফিরে এল সেই বারবণিতার দল। আর তাদের আগমনে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল চিতোর নগরীতে।

৭

অন্ধকার, নিষ্প্রদীপ কক্ষে সেনাপতি শালব্রুমা বসে ছিলেন মহারানা উদয়ের আহ্বানের জন্য। কিন্তু রাত্রি নামলেও ডাক আসেনি তার। দিনে বা রাত্রি নামার পর একবারের জন্যও কক্ষ ত্যাগ করেননি তিনি। শুধু মোগল সৈনিকরা যে এসে পড়েছে তা ঢেড়ার শব্দে জেনেছিলেন তিনি। তার বেশি কিছু তার জানা নেই। মধ্য রাতের কিছু সময় পর বাইরে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। তবে কি মোগল সেনা প্রবেশ করেছে কেল্লাতে? নিজেকে এবার আর স্থির রাখতে পারলেন না সেনাপতি। রানা তাকে ডাকুন বা না ডাকুন এ দেশ তো তারও নিজের। তাই মোগলদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে হবে তাকে। হয়তো বা তলোয়ার ধরা এখন নিষ্ফল, কিন্তু তিনি মৃত্যু বরণ করার আগে কিছু শত্রু নিধন করে তবেই মরবেন—এ কথা ভেবে নিয়ে সেনাপতি শালব্রুমা তার তলোয়ার নিয়ে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন শত্রু নিধনের উদ্দেশে।

সারা কেল্লা মশালের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। অন্ধকারকে উপেক্ষা করে চিতোরবাসী নেমে পড়েছে পথে। শালব্রুমা তাদের দেখে বুঝতে পারলেন তারা আতঙ্কিত নয়, উল্লসিত। এক সাধারণ নাগরিককে উল্লাসের কারণ জিগ্যেস করাতে সে জানাল, 'বারবণিতারা মোগল বাহিনীকে পরাস্ত করেছে। কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন সম্রাট আকবর। প্রাসাদ চত্বরে উৎসব শুরু হয়েছে। সবাই সেখানে যাচ্ছে।'

নগরবাসীর কাছে কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সেনাপতি শালব্রুমা। এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হল? ভারত সম্রাট আকবরকে কীভাবে পরাস্ত করল সামান্য বারবণিতারা? তবে ঘটনাটা যে সত্যি তা তো তিনি নগরবাসীদের উল্লাস দেখেই বুঝতে পারছেন। আর এরপরই 'প্রাসাদ' শব্দটা শুনে শালব্রুমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কন্যার কথা। সে সেদিন বলে গিয়েছিল জহরব্রত পালন করবে। সত্যি সে তা করেনি তো? পিতার মন কেঁদে উঠল সেই অশুভ আশঙ্কাতে। আর কালক্ষেপ না করে তিনি ছুটতে শুরু করলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

মশাল আর প্রদীপের আলোতে আলোকিত রাজপ্রাসাদ। বহু মানুষ সমবেত হয়েছে প্রাসাদ চত্বরে। জনতার নৃত্য-গীত, উল্লাসধ্বনি, ঝাঝার, নাগাড়ার শব্দতে মুখরিত চারপাশ। জনতা চিৎকার করছে, 'জয়, চিতোরেশ্বরীর জয়! মহারানা উদয় সিংহের জয়!'

প্রাসাদের প্রবেশ মুখে মহারানার চাটুকার এক সামন্ত সেনাপতি শালব্রুমাকে দেখে ব্যঙ্গ করে বলল, 'সেনাপতি বিজয় উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন বুঝি? বিল্বতী যখন আছে তখন আর সেনাপতির প্রয়োজন কি?'

boierpathshala.blogspot.com

অপমানটা গায়ে মাখলেন না শালব্রুমা। প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনি ছুটলেন রানি মহলের দিকে। রানি মহলের দাসী তাকে জানাল, 'রানি সেই যে গোমুখকুণ্ডে স্নান করতে গেছেন আর ফেরেননি। কথাটা শুনেই শালব্রুমা প্রাসাদ পরিত্যাগ করে ছুটলেন গোমুখকুণ্ডের দিকে।

পবিত্র গোমুখকুণ্ড জলাশয়। গঙ্গা নদীর মতো এ কুণ্ডতে অবগাহন করে চিতোরবাসী শুদ্ধ হয়। একদা যে সব নারীর দল জহরব্রত পালন করেছিলেন তারা এই গোমুখকুণ্ডতে স্নান করেই আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রবেশ করেছিলেন কুম্ভপ্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে। যেখানে অহর্নিশ প্রজ্জ্বলিত থাকে এক অনির্বাণ শিখা। যে আগুন কোনোদিন নেভে না।

মহারানা কুম্ভের প্রাচীন প্রাসাদ দীর্ঘকাল হল পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, ধ্বসে পড়েছে তার বেশ কিছু অংশ। কেউ বাস করে না সেখানে। শুধু পুণ্য স্থান হিসাবে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে ধুলো-রেণু সংগ্রহ করতে যান কুলনারীরা। বিশেষ কোনো ঘরবাড়িও নেই কুম্ভ প্রাসাদ সংলগ্ন অংশে। তাই কোনো মানুষও নেই। সারা নগরী উৎসবে মাতোয়ারা। নগরীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মহারানা কুম্ভের সেই প্রাচীন প্রাসাদের কাছে শালব্রুমা যখন পৌঁছলেন তখন চাঁদ বৈতরণীর পথে। শুকতারা ফুটে উঠতে শুরু করেছে সূর্যোদয়ের আগমন বার্তা নিয়ে।

আধো অন্ধকারে এক ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খণ্ডহর প্রাসাদটা। বাতাসে যেন একটা পোড়া গন্ধ ভাসছে! সত্যি নাকি শালব্রুমার মনের ভুল? বুক কেঁপে উঠল তার। কিন্তু এরপরই তিনি একটু দূর থেকে দেখতে পেলেন একটা মূর্তি যেন গোমুখকুণ্ডের দিক থেকে এসে কুম্ভপ্রাসাদে প্রবেশ করল। নারী মূর্তি! 'ও নিশ্চয় আমার কন্যা। থামাতে হবে ওকে। দূর থেকে ভেসে আসা গোলোযোগের শব্দ শুনে মোগলসেনা দুর্গে প্রবেশ করেছে বলে ভ্রম হয়েছে তার।'—এ কথা ভেবে নিয়ে শালব্রুমা অতি দ্রুত এগোলেন সেই প্রাসাদের দিকে।

এ প্রাসাদে আগে কোনওদিন প্রবেশ করেনি বিল্বাবতী। কোনও গণিকার এই পবিত্র প্রাসাদে প্রবেশ অধিকার ছিল না। এ অধিকার আজ অর্জন করেছে বিল্বাবতী। যুদ্ধ জয় করে কেল্লাতে ফিরে প্রথমে সে গিয়েছিল তার মহলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির স্বর্ণকৌট আনার জন্য। সেটা নিয়ে এসে গোমুখকুণ্ডের পবিত্র জলে অবগাহন করে একটা মাত্র পট্টবস্ত্রে নিজেকে আবৃত করে প্রাসাদে প্রবেশ করেছে বিল্বাবতী। পবিত্র স্থানে এই একটি মাত্র পট্টবস্ত্রে নিজেকে আবৃত করে রাখাই প্রথা। কোনও রেশম বস্ত্র বা অন্তর্বাস রাখতে হয় না শরীরে। প্রাসাদে প্রবেশ করেই একটা পোড়া গন্ধ অনুভব করল বিল্বাবতী। সে বেশ বিস্মিত বোধ করল সেই গন্ধে। যে নারীকুল জহরব্রত পালন করে এখানে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সে তো বহু বছর আগের কথা। তবে? ওই পোড়া গন্ধটাই বিল্বাবতীকে নিয়ে গেল নির্দিষ্ট স্থানে। অন্ধকার সোপানশ্রেণি যেখান থেকে মাটির গভীরে নেমেছে। কটু গন্ধটা উঠে আসছে তার ভিতর থেকেই। রুক্ষ সেই সোপানশ্রেণি বেয়ে নামতে শুরু করল বিল্বাবতী। অবশেষে সে পৌঁছে গেল ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষে।

বিশালাকৃতির এক প্রাচীন কক্ষ। আর সেই কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটা বৃত্তাকার স্থান। সেই পবিত্র অগ্নিকুণ্ড। পর্বতের মাথার ওপর চিতোর কেল্লার জলাশয়গুলোতে কোথা থেকে জল আসে তা কারো জানা নেই, তেমনই এই পবিত্র অগ্নিকুণ্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কীভাবে জীবন্ত আছে তা সঠিক জানা নেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে এ আগুন নাকি পৃথিবীর আগুন নয়, স্বর্গের আগুন। ইন্দ্রদেবের বজ্রের আগুন। কোনও এক অজানা যুগে আকাশ থেকে খসে পড়েছিল এ আগুন। আর তার ওপর প্রাসাদ নির্মাণ

boierpathshala.blogspot.com

করেছিলেন মহারানা কুম্ভ। কুণ্ড থেকে ওঠা আগুনের লাল আভাতে আলোকিত কক্ষ। পাথুরে দেওয়ালগুলোর সর্বত্র আজও জেগে আছে অস্পষ্ট হাতের দাগ। বহু শতাব্দী আগে যে সব নারীরা জহরব্রত পালন করেছিলেন তারা অগ্নিকুণ্ডতে ঝাঁপ দেবার আগে দক্ষিণ হস্তে আলতা-সিঁদুর মেখে ওই ছাপ রেখে গেছিলেন দেওয়ালের গায়ে।

বিল্ববতী বিস্মিত ভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল সেই পবিত্র চিহ্নগুলো। কেমন যেন একটা গা ছমছমে পরিবেশ বিরাজ করছে কক্ষে। হঠাৎই দেওয়ালের গায়ে একটা হস্তচিহ্ন খুব স্পষ্ট বলে মনে হল তার। যেন সিঁদুরের ছাপটা সদ্য কেউ এঁকেছে দেওয়ালের গায়ে। আর এরপরই তার চোখ পড়ল অগ্নিকুণ্ডের কাছেই এক স্থানে মাটিতে রাখা আছে মালা জড়ানো একটা কলস আর কিছু স্বর্ণালঙ্কার! বিল্ববতী গল্প শুনেছিল যে যারা জহরব্রত পালন করতেন তারা অগ্নিকুণ্ডতে ঝাঁপ দেবার আগে কলসে করে গোমুখকুণ্ডের পবিত্র জল বহন করে আনতেন এখানে। তবে কি কেউ জহরব্রত পালন করতে এখানে এসেছিলেন? বিল্ববতী ভালো করে তাকাল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। এখনও যেন একটা সূক্ষ্ম ধোঁয়ার কুণ্ডলী নির্গত হচ্ছে অগ্নিকুণ্ড থেকে। বিস্মিত বিল্ববতী পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল সেই কুণ্ডের ভিতর। লাল গনগনে অগ্নিকুণ্ডর ভিতর রয়েছে ছাই হয়ে যাওয়া কোন মানুষের শায়িত অবয়ব। কটু গন্ধ আর ধোঁয়ার উৎস এই অবয়বই। বেশিক্ষণ সেই অগ্নিকুণ্ডর সামনে আগুনের হলকার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। একবার উঁকি দিয়েই কুণ্ডের গা থেকে সরে এল বিল্ববতী।

তার অনুমান সত্যি। জহরব্রত পালন করেছে কোনো নারী! বিল্ববতী অনুমান করল, যুদ্ধে পরাজিত হবার আশঙ্কাতেই মোগল বাহিনীর হাত থেকে সতীত্ব রক্ষা করার জন্যই সম্ভবত জহরব্রত পালন করেছে সেই নারী। বিল্ববতী মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম জানাল সেই সতী নারীর উদ্দেশে। ওই কক্ষের পবিত্র রেণু সংগ্রহ করে এবার ফিরতে হবে বিল্ববতীকে। বাইরে ভোর হয়ে আসছে। কুণ্ড থেকে জহরব্রতী সতী নারীর ভস্মের কিছু অংশ উড়ে এসে পড়েছে মাটিতে। বিল্ববতী তার স্বর্ণ কৌটো হাতে মাটিতে ঝুঁকে পড়ল ভস্মমিশ্রিত পবিত্র ধূলিকণা সংগ্রহের জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হলেন শালব্রুমা। যে গন্ধে আবৃত কক্ষের বাতাস তা পরিচিত অভিজ্ঞ সেনাপতি শালব্রুমার। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহুবার মৃত সৈনিকদের চিতা সাজিয়েছেন তিনি। এ গন্ধ তার পরিচিত। নরদেহের মাংস-মজ্জা পোড়ার গন্ধ। শালব্রুমা দেখতে পেলেন কুণ্ডের কিছুটা তফাতে মাটিতে ঝুঁকে পড়ে ভস্ম সংগ্রহ করছে এক নারী। যে নারীকে পশ্চাৎ ভাগ থেকে দেখলেও তার অবয়ব দেখে শালব্রুমা বুঝতে পারলেন এ নারী তার কন্যা নয়। অপর কেউ। আর এরপরই শালব্রুমার চোখে পড়ল সেই মালা জড়ানো কলস আর অলঙ্কারগুলোর ওপর। এখনও ক্ষীণ ধোঁয়ার কুণ্ডলী নির্গত হচ্ছে অগ্নিকুণ্ড থেকে। ব্যাপারটা বুঝতে আর অসুবিধা হল না শালব্রুমার। এই অগ্নিকুণ্ড গ্রাস করে নিয়েছে তার কন্যাকে। সত্যি জহরব্রত পালন করে কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে তার কন্যা। পিতা শালব্রুমার কণ্ঠ থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

নিস্তব্ধ কক্ষে সেই আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে বিল্ববতী ফিরে দাঁড়াতেই পট্টবস্ত্র খসে পড়ল তর উর্ধাঙ্গ থেকে। শালব্রুমা তাকালেন সেই নারীর দিকে। এ যে বিল্ববতী! অগ্নিকুণ্ডের লাল আভা এসে পড়েছে তার শরীরের ওপর। শালব্রুমার মনে হল বিল্ববতীর স্তন দুটো যেন দুটো অগ্নিগোলক! যে অগ্নিগোলক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল তার সব কিছু! শালব্রুমার চোখ যেন জ্বলে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে! নাক জ্বলে

boierpathshala.blogspot.com

যাচ্ছে আত্মজার মাংস পোড়ার কটু গন্ধে! এ কি কোনো নারী নাকি পিশাচিনী? যে সংগ্রহ করছে তার কন্যার চিতাভস্ম!

৮

প্রাসাদ আজ উৎসব মুখর। প্রাসাদের ভিতর বাহির জনাকীর্ণ। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র শব্দ উল্লাসে মুখরিত। মহারানা উদয় সিংহ সারা রাত ধরে তার প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছেন সেই আনন্দ উৎসব। তাকে দেখে জয়ধ্বনি, হর্ষধ্বনি করছে জনতা। তিনি মুঠো মুঠো স্বর্ণমুদ্রা ছুড়ে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশে। আর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সারা চিতোরবাসী সমবেত হয়েছে প্রাসাদের সামনে। সবাই দর্শন চায় মহারানার। মহারানাকে তাদের সাধ্যমতো উপঢৌকন দিয়ে প্রণাম জানাতে চায়। সবাই প্রাসাদে প্রবেশ করতে চায়। প্রহরীরা তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। শুধু সামন্ত সর্দার আর অভিজাত ব্যক্তিদেরই প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। দরবার কক্ষে তার হাতে উপঢৌকন তুলে দেবার জন্য।

যুদ্ধ জয়ের আনন্দে বহু দিন পর স্নান সেরে আলো ঝলমল দরবার কক্ষে সিংহাসনে এসে বসেছেন মহারানা। ভাঁড়, পাত্র-মিত্র, সামন্ত সর্দাররা তাকে ঘিরে আছে। উপঢৌকন নিয়ে এক একজন অভিজাত নাগরিক, সর্দারের দল প্রবেশ করছেন দরবারে। চিতোর অধিপতি মহারানা উদয় সিংহকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানিয়ে নজরানা-উপঢৌকন তুলে দিচ্ছেন ভৃত্যদের হাতে। মহার্ঘ বস্ত্রখণ্ড, স্বর্ণালঙ্কার, মুক্তাহার, দুর্মূল্য পাথর, স্বর্ণপাত্র এ ধরনের নানা মূল্যবান উপহার। ভৃত্যরা যে সব উপহার হাজির করছে উচ্চাসনে বসা মহারানার সামনে। তিনি যে সব উপহার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দিয়ে একবার স্পর্শ করছেন। তারপর তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্যত্র। অঙ্গুলি স্পর্শের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহারানা উপহার গ্রহণ করছেন। ওটাই দরবারি রীতি।

এত জনসমাগমের মধ্যেও মহারানা ভেবে চলেছেন প্রিয়তমা বিল্ববতীর কথা। সে তখন তার সরোবরস্থিত মহলে বসে কী করছে? সেও নিশ্চয়ই ভাবছে মহারানার কথাই। মহারানা উদয়ের মনে হচ্ছে এখনই তিনি ছুটে যান বিল্ববতীর প্রাসাদে। আলিঙ্গনে, চুম্বনে ভরিয়ে দেন তার বিল্ববক্ষ। প্রেয়সী বিল্ববতী। বীর্যবতী বিল্ববতী। মহারানা ভাবতে লাগলেন কতক্ষণে শেষ হবে এই উপহার গ্রহণ পর্ব, তিনি তারপর ছুটে যাবেন প্রিয়তমা বিল্ববতীর প্রাসাদে। একের পর এক লোক দরবার কক্ষে প্রবেশ করে চলেছে উপহারের ডালি নিয়ে। অন্তহীন জনস্রোত।

হঠাৎ একজন দরবারে প্রবেশ করে সোজা গিয়ে হাজির হলেন যে মর্মর বেদির ওপর মহারানার সিংহাসন তার সামনে। তার হাতে ধরা রক্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটা রেকাবি। তাকে দেখে মৃদু চমকে উঠলেন মহারানা সহ অন্য অমাত্যরা। অবশেষে সে নিজেই হাজির হল। সেনাপতি শালব্রুমা। উদভ্রান্ত চেহারা তার। পাগড়িহীন মস্তক। সর্বাঙ্গে ধুলোবালি লেগে আছে। পোশাকও এলোমেলো।

তাকে দেখে মহারানা উদয়ের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। বিদ্রুপের হাসি। সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'আপনার আগমনে বড়ই প্রীত হলাম। উপহারও এনেছেন দেখছি। তবে আমার বীর্যবতী বিল্ববতী যতদিন আছে ততদিন আর অন্য কোনও সেনাপতির চিতোর রক্ষার প্রয়োজন হবে না। চিতোর রক্ষার জন্য আমার বীর্যবতী গণিকাকুলই যথেষ্ট।'

boierpathshala.blogspot.com

মহারানার কথা শুনে হেসে উঠল তাঁর ভাড় ও চাটুকাররা।

শালব্রুমার ঠোঁটের কোণেও যেন একটা আবছা হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'জানি মহারানা। এই দরবার কক্ষে আমার আর কোনওদিন পদার্পণ ঘটবে না। চিতোর ত্যাগ করার আগে মহারানাকে যুদ্ধ জয়ের শুভেচ্ছা স্বরূপ শেষ উপহার দিতে এসেছি। দয়া করে তা গ্রহণ করুন।'

বিজয়ীর অপরাধীকে ক্ষমা করা শোভা পায়। তাই মহারানা উপহার গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন না। একজন ভৃত্য সেই বস্ত্র আচ্ছাদিত রেকাবিটা শালব্রুমার হাত থেকে নিয়ে মহারানার সামনে উঠে দাঁড়াল। মহারানা যথারীতি তাতে অঙ্গুলি স্পর্শ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শালব্রুমা বলে উঠলেন, 'মহারানা একবার দেখুন তাঁর জন্য কী উপহার এনেছি আমি। মহারানার প্রতি আমার শেষ উপহার।'

শালব্রুমার কথা শুনে কৌতূহলবশত মহারানা সরিয়ে ফেললেন উপহারের আচ্ছাদন। আর তার পরই চমকে উঠলেন তিনি। রেকাবিতে রাখা আছে দুটো সদ্য কর্তিত মাংস পিণ্ড। নিটোল বিল্বের মতো দুটো স্তন! তখনও রক্ত ঝরছে সেই স্তন যুগল থেকে!

শালব্রুমা সভা কাঁপিয়ে পাগলের মতো অট্টহাস্য শুরু করলেন। হতভম্ব মহারানা কিঞ্চিৎ হতভম্ব ভাবে বলে উঠলেন—'এক কার ছিন্ন স্তন?'

শালব্রুমা হাসতে হাসতে বলেই উঠলেন, 'চিনতে পারছেন না মহারানা? যে স্তন আকবরের তলোয়ারের থেকেও শক্তিশালী, যে স্তন পরাজিত করেছে সম্রাট আকবরকে, আমাকে কন্যাহীনা করেছে, যে স্তনযুগল লাভের প্রত্যাশাতে আপনি প্রতি রাতে ছুটে যান, এই সেই বিল্ববতীর মহার্ঘ বিল্ব স্তনযুগল। মহারানার প্রতি আমার শেষ উপহার। বিল্বস্তনহীন বিল্ববতী এখন মহারানার জন্য প্রতীক্ষা করছেন কুম্ভ প্রাসাদের পবিত্র কক্ষে।'

এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে মহারানা সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠে তার তরবারি কোষমুক্ত করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই শালব্রুমা অট্টহাস্য করতে করতে কটিদেশ থেকে একটা তীক্ষ্ন ছুরিকা বার করে নিজের হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করালেন। মাটিতে ঢলে পড়ল শালব্রুমার দেহ। মহারানা আর কালক্ষেপ করলেন না। বিল্ববতীর কর্তিত স্তনযুগল রেকাবি থেকে তুলে নিয়ে কোষবন্ধে বেঁধে নিয়ে দরবার কক্ষ এবং প্রাসাদ ত্যাগ করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, তারপর পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন কুম্ভ প্রাসাদের দিকে।

কিছু সময়ের মধ্যেই কুম্ভপ্রাসাদের সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করলেন মহারানা উদয়। মাটিতে পড়ে আছে রক্তস্নাত বিল্ববতী। মহারানা তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পাশে উপবিষ্ট হয়ে কোলে তুলে নিলেন তার মাথাটা। বিল্ববতীর বুকে দুটো গভীর ক্ষত। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে তার থেকে। রক্তাক্ত গহ্বরের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে বক্ষ অস্থি। বিল্ববতীর শরীরে তখনও প্রাণ ছিল। হয়তো তার প্রাণবায়ু শরীর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে মহারানার জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। বিল্ববতীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে মহারানা বললেন, 'চোখ মেলো বিল্ববতী। আমি এসেছি।' চোখ মেলল বিল্ববতী। প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও মহারানাকে দেখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল বিল্ববতীর ঠোঁটের কোণে। ধীরে ধীরে সে বলল, 'আপনি এসেছেন মহারানা! দেখুন তো স্তনহীনা বিল্ববতীকে আপনার আগের মতোই সুন্দরী লাগছে কিনা?'

বিল্ববতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মহারানার মনে হল এ যেন এক অপাপবিদ্ধ, পবিত্র নারীর মুখ। কোনও কলঙ্ক যাকে কোনোদিন স্পর্শ করতে পারে না। যৌনতা নয়, যেন

boierpathshala.blogspot.com

এক অপার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য চুঁইয়ে পড়ছে তার রক্তাক্ত শরীর বেয়ে। বিল্বতী যেন কোন শায়িত দেবীমূর্তি।

মহারানা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বিল্বতী। তোমাকে এখন আরও বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে। এত সুন্দর তোমাকে আমি কোনোদিন দেখিনি। স্বর্গের রূপসিরাও হার মানবে তোমার এই রূপ দেখে।'

কথাটা বলে মহারানার এরপর চোখ পড়ল বিল্বতীর এক হাতে ধরা সেই স্বর্ণ কৌটোর ওপর। মহারানা বললেন, 'তুমি কার জন্য এই পবিত্র ধূলিকণা সংগ্রহ করছিলে বিল্বতী?'

প্রশ্ন শুনে শেষ বারের জন্য হাসি ফুটে উঠল বিল্বতীর মুখে। নির্মল, পবিত্র সেই হাসি। বিল্বতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল 'নিজের জন্য মহারানা। ভেবেছিলাম আপনার মঙ্গল কামনাতে এই পবিত্র রেণু ধারণ করব মস্তকে। স্বামীর মঙ্গল কামনাতে যেমন এই রেণু ধারণ করে রাজপুত রমণীরা।'

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন মহারানা উদয়। চোখের পাতা চিরদিনের মতো মুদে আসছে বিল্বতীর। আর সময় নেই। মহারানা তাড়াতাড়ি সেই কৌটো থেকে পবিত্র ভস্মমিশ্রিত ধূলিকণা তুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন বিল্বতীর সিঁথিতে। ঠিক যেমন বিবাহের সময় সিঁথিতে সিঁদুর দান করা হয় সেভাবে।

অসীম তৃপ্তিতে যেন চোখের পাতা মুদল বারবণিতা বিল্বতী। মহারানার কোল থেকে তার মাথাটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। মহারানা আর্তনাদ করে উঠলেন—'বিল্বতী!'

তার আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই প্রাচীন কক্ষে।

বেশ কিছুক্ষণ বিল্বতীর নিথর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সম্বিত ফিরে পেলেন মহারানা উদয় সিংহ। চোখের জল মুছে তিনি তার কোমরবন্ধ থেকে সেই কর্তিত স্তনযুগল নিয়ে স্থাপন করলেন বিল্বতীর বক্ষে। বিল্বস্তনা বিল্বতী। তার স্তনযুগল চেয়ে আছে মহারানার দিকে। পরম মমতায় মহারানা উদয় সেই স্তনযুগল আর বিল্বতীর ওষ্ঠ চুম্বন করলেন শেষ বারের মতো। তারপর বিল্বতীর শরীরটাকে কোলে নিয়ে এগোলেন সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে। পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের সর্বহারা লেলিহান অগ্নিশিখা নিজের কোলে আশ্রয় দিল বিল্বতীকে।

পরিশিষ্টঃ মোগল ইতিহাসে আছে সম্রাট আকবর একবার মাত্র চিতোর অভিযান করেন এবং চিতোর ধ্বংস করেন। স্বাভাবিক ভাবেই একজন সামান্য বারবণিতার কাছে ভারতসম্রাটের পরাজয়ের কথা সেখানে স্থান পাবার কথা নয়। কিন্তু রাজস্থানের ভট্ট কবিদের রচনায় আছে সম্রাট আকবর দুবার চিতোর অভিযান করেন। প্রথমবার তিনি মহারানা উদয় সিংহের বারবণিতাদের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন। আর এর ফলে মহারানা তার বীর্যবতী গণিকাদের সামন্ত সর্দারদের মতো সম্মান দিতে শুরু করেন। কিছু কালের মধ্যে বারবণিতাদের সঙ্গে সামন্ত সর্দারদের তুমুল বিবাদ শুরু হয় যা রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের। অপমানিত সামন্ত সর্দাররা হত্যা করতে শুরু করে বারবণিতাদের। আর তারাও অস্ত্র তুলে নেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই সম্রাট আকবর দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করেন ও চিতোর ধ্বংস করেন। মহারানা উদয়সিংহ চিতোর ত্যাগ করে চলে যান পিছোলা হ্রদের তীরে। সেখানেই তিনি পূর্ব পরিকল্পনামতো গড়ে তোলেন তার রাজধানী। সম্রাট আকবর নাকি চিতোর দুর্গে প্রবেশ করেই খোঁজ করেছিলেন বিল্বস্তনা এক বারবণিতা বিল্বতীর। পক্ক

boierpathshala.blogspot.com

বিল্বের মতো যার স্তনযুগলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ভারত সম্রাট। কিন্তু বিল্ববতীর আর কোনো খোঁজ তিনি পাননি। ততদিনে কুম্ভপ্রাসাদের ভূগর্ভস্থ প্রাচীন কক্ষে অনির্বাণ অগ্নিশিখায় হারিয়ে গেছে বিল্বস্তন বিল্ববতী।

boierpathshala.blogspot.com

মালিনী মঞ্জরী

boierpathshala.blogspot.com

চোখ মেলে সে প্রথমে কিছুই মনে করতে পারল না। সে যেখানে শুয়ে আছে তার চারপাশে খেলা করছে আধো অন্ধকার। তার মনে হল যেন সে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘুমিয়ে ছিল। যুগযুগ ধরে এক অতলান্ত ঘুমের সমুদ্র অতিক্রম করে এসে সবশেষে পাড়ে উঠে চোখ মেলল। অন্ধকার যেন একটু হালকা মনে হয়। মাথাটা তুলতে গিয়ে বেশ ভারী মনে হল। সে ভাবার চেষ্টা করল সে কে? কোথায় শুয়ে আছে সে?

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে শুয়ে থাকার পর প্রথমে এক সময় তার নিজের নামটা মনে পড়ল। তার নাম চম্পক—চম্পক সিংহ। এরপর নিজের পরিচয়টাও তার মনে পড়ে গেল। মরুময় বিকানিরের বাসিন্দা সে। কিশোর বয়সে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বিকানির থেকে সে এসেছিল অম্বর রাজ্যে। তারপর থেকে সে অম্বর রাজ্যেই স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করল। পেশায় একজন শিল্পী সে। পাথর কুঁদে মূর্তি নির্মাণ করে চম্পক। মানুষের মূর্তি, পশুপাখির মূর্তি, শ্বেতপাথরের মূর্তি, বেলে পাথরের মূর্তি। আর সে সব মূর্তি স্থান পায় অম্বর প্রাসাদের আনাচে-কানাচে, প্রাসাদ সংলগ্ন সুরম্য বাগিচাতে দৃষ্টি নন্দনের জন্য। আত্মপরিচয় স্মরণে আসার পর চম্পক কিছুটা যেন আশ্বস্ত বোধ করতে লাগল।

মাথাটা এক পাশে সে কষ্ট করে ঘোরাল। গরাদ বসানো গবাক্ষ দিয়ে ক্ষীণ আলো প্রবেশ করতে শুরু করেছে কক্ষে। চাঁদের আলো। তা দেখে চম্পক বুঝতে পারল এখন রাত। কিন্তু এ কক্ষ তো অম্বর কেল্লার শিল্পী মহল্লার তার নিজের শয়নকক্ষ নয়! তার কক্ষের বাতায়ন অমন লৌহ শলাকা সমৃদ্ধ নয়। মর্মর পাথরের চাদরের জাফরি বসানো তার গবাক্ষে। চম্পক নিজের হাতেই বানিয়েছিল সেটা। তবে এ কোন কক্ষ? তাছাড়া তার কক্ষে কোনও পালঙ্ক ছিল না! কিন্তু সে বর্তমানে এক লৌহ নির্মিত ক্ষীণকায় পালঙ্কে শুয়ে আছে। ইতিপূর্বে ও ধরনের পালঙ্ক আগে দেখেনি সে! চম্পক বুঝতে পারল এ তার শয়নকক্ষ নয়। তবে সে কোথায়? বাতায়ন দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করা আলোর রেখার দিকে তাকিয়ে চম্পক ভাবার চেষ্টা করতে লাগল সে এই অপরিচিত জায়গাতে কীভাবে এল?

অন্ধকারটা যেন ধীরে ধীরে আরও পরিষ্কার হচ্ছে। চাঁদ আকাশের ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। সম্ভবত পূর্ণিমার চাঁদ। তাই আলো বাড়ছে। কোথা থেকে একটা ঘণ্টাধ্বনি যেন অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল গবাক্ষ দিয়ে। অম্বর থেকে কিছুটা তফাতে পাহাড়ের মাথায় নাহারগঞ্জে যে দেবী মন্দির আছে তার ঘণ্টাধ্বনি কি? ঠিক বুঝে উঠতে পারল না চম্পক। একটা মুখ যেন চম্পকের চোখের সামনে ভেসে উঠছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট এক নারীর মুখ। কে সে? এক সময় সেই মুখ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল চম্পকের মনে। তারপর নামটাও তার মনে পড়ল। এ নারীর নাম মঞ্জরী। যার মূর্তি নির্মাণ করেছে চম্পক। অম্বর প্রাসাদের মালিনী মঞ্জরী। পুষ্প চয়ন করে মালা গেঁথে রানিকে সাজায় সে।

মঞ্জরীর মুখ আর পরিচয় তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাকুর থেকে সুতো খোলার মতো একে একে চম্পকের মনে পড়ে যেতে লাগল সব কিছু।

মঞ্জরী তার প্রেয়সী। অম্বর প্রসাদ কাননে সারাদিন ধরে এক অপ্সরার মূর্তি নির্মাণের কাজ করছিল চম্পক। বেলা তখন পড়ে এসেছে। আপন মনে মূর্তির গায়ে অলঙ্কার খোদাই করছিল চম্পক। হঠাৎই পিছনে এক অস্পষ্ট শব্দ হলে ফিরে তাকিয়ে চম্পক দেখতে পেয়েছিল এক অপরূপ রাজপুত দুহিতাকে। নিবিষ্ট মনে গোধূলির মায়াবী আলোতে সে চেয়েছিল পাষাণ খোদিত অপ্সরা মূর্তির দিকে। চম্পক প্রথম দেখাতেই তাকে রাজকন্যা বলেই ভেবেছিল। কিন্তু সে মাথা ঝোঁকাতেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই যুবতী মৃদু হেসে বলে উঠেছিল; 'না, না, আমি রাজকন্যা নই। আমি মালিনী। রানি, রাজকন্যাদের জন্য পুষ্প চয়ন করে মালা গাঁথি। নগণ্য এক দাসী।'

boierpathshala.blogspot.com

'তুমি দাসী! দাসীর এত রূপ!'—মালিনীর কথা শুনে একথাটা বলে ফেলেছিল চম্পক।

একটু চুপ করে থেকে মালিনী জবাব দিয়েছিল 'আমার নাম মঞ্জরী। দাসী হলেও দাসীর ঘরে জন্ম নয় আমার। অম্বর রাজ টিকাডোরের সময় এক গ্রাম থেকে এখানে এনেছিলেন আমাকে। টিকাডোর কাকে বলে জানো তো?' টিকাডোর হল কিছু কিছু রাজপুত রাজাদের মধ্যে প্রচলিত এক প্রাচীন প্রথা। অভিষেকের পর ললাটে রাজটিকা ধারণ করে কাছাকাছি কোনও শত্রু রাজ্য লুঠ করতে বেরোয় নতুন রাজা। শত্রু রাজ্য না থাকলে বন্ধু রাজারাই তার কোনও গ্রাম বা নগর লুঠ করার জন্য অনুমতি দেন নতুন রাজাকে। সেই গ্রামবাসী বা নগরবাসীকে অবশ্য খবরটা জানানো হয় না। সদ্য অভিষিক্ত রাজা অতর্কিতে সেখানে হানা দিয়ে সে গ্রামের সম্পদ লুঠ করেন। আর সেই লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে অবশ্যই থাকে নারীরত্ন। তাদের লুঠ করে এনে রাজা তাদের দাসী বানান। ভাগ্য ভালো থাকলে তাদের কেউ কেউ মহরাজের শয্যা সঙ্গিনীও হয়।

মঞ্জরীর কথায় এবারে চম্পক বলেছিল, 'হ্যাঁ, টিকাডোর প্রথা সম্বন্ধে জানি। এবার বুঝতে পারছি তুমি কেন এত রূপবতী। নিশ্চয়ই তুমি কোনও সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজপুত কন্যা ছিলে।

চম্পকের কথা শুনে মঞ্জরী মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল 'আচ্ছা, কে বেশি সুন্দরী বলো তো? আমি নাকি ওই প্রস্তর মূতি?'

চম্পক বলল, 'আমি যদি তোমার মূর্তি রচনা করি তবে সে মূর্তি, এই অপ্সরা মূর্তির চেয়েও বেশি সুন্দর হবে। তোমার মূর্তি নির্মাণ করতে দেবে আমাকে?'

শিল্পীর চোখ চম্পকের। মঞ্জরীর দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছিল মরালগ্রীবা, শঙ্খের মতো জেগে থাকা উদ্ভিন্ন স্তন, ক্ষীণ কটিদেশ, ভারী নিতম্ব সমন্বিত এই নারী মূর্তি রচনার পক্ষে আদর্শ। তাই সে প্রস্তাবটা দিয়েছিল মঞ্জরীকে। মঞ্জরী তার কথা শুনে চমকে উঠে বলেছিল, 'কী বলছ তুমি ভাস্কর? মালিনীর মূর্তি আবার কেউ রচনা করে নাকি?'

চম্পক বলেছিল 'হ্যাঁ করে। যদি সে নারী অপ্সরার থেকেও রূপবতী হয়।'

এ কথাটা শুনে মালিনী মঞ্জরী লজ্জিতভাবে বলে উঠেছিল, 'আমার মূর্তি রচনা করে তুমি কী করবে? কী কাজে লাগবে সেই মূর্তি?'

ভাস্কর চম্পক তার উত্তরে জানিয়েছিল, প্রাসাদের অতিথিশালার প্রবেশ তোরণে একটা নারীমূর্তি নির্মাণ করে স্থাপন করতে বলা হয়েছে আমাকে। জানো নিশ্চয়ই যে অম্বররাজের পূর্বপুরুষ ছিল রাজা মান সিংহ। সম্রাট আকবর তাকে একবার বঙ্গদেশের দোয়াব অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে বেশ কিছু অম্বরবাসী রাজপুতও গেছিলেন বঙ্গদেশে। যাদের মধ্যে একটা অংশ আর এ দেশে ফেরেননি। সেখানেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন বংশ পরম্পরায়। তাদেরই এক উত্তরপুরুষ পিতৃপুরুষের দেশ দেখতে আসছেন। তাঁর নাম মোতি সিংহ। অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার জন্য অতিথিশালা সাজানো হচ্ছে। মোতি সিংহ নাকি অর্থ সাহায্য করবেন অম্বররাজকে। তাই তাঁর আতিথেয়তায় ত্রুটি রাখতে চান না অম্বররাজ।'

কথাটা শুনে মঞ্জরী হেসে বলেছিল, 'ঠিক আছে তোমার যখন মন চায় তখন আমার মূর্তি রচনা কোরো তুমি। প্রতিদিন এই সায়াহ্নে যখন পুষ্প চয়ন করতে আসব তখন কিছু সময়ের জন্য তোমার কাছে উপস্থিত হব আমি। এই বলে সে সেদিনের মতো ফুলের সাজি হাতে রওনা হয়েছিল প্রাসাদ অভিমুখে।—সব কিছু এবার মনে পড়ে যাচ্ছে চম্পকের।

boierpathshala.blogspot.com

২

সেই শুরু মঞ্জরীর সঙ্গে চম্পকের সাক্ষাতের। যে কক্ষে চম্পক শুয়ে আছে সে কক্ষটাকে চিনতে না পারলেও তার চোখের সামনে এরপর ভেসে উঠতে লাগল পরবর্তী ঘটনাগুলো। চম্পক, মঞ্জরীকে তার মূর্তি নির্মাণের প্রস্তাব দিলেও প্রাথমিক ভাবে সে কিছুটা সন্দিহান ছিল মঞ্জরীর সম্মতির ব্যাপারে। হয়তো বা মঞ্জরী নেহাতই কথার কথা বলেছে তাকে। কিন্তু মঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেই প্রথম রাতে ঘুমে জাগরণে মঞ্জরীর মুখটাই যেন চম্পকের চোখের সামনে ভেসেছিল। কে জানে হয়তো প্রথম দর্শনেই মঞ্জরীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শিল্পী চম্পক।

পরদিন সারাক্ষণই মঞ্জরীর কথাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তার। একটা মর্মর প্রস্তর খণ্ড কাননের নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়েছিল। দিনের শেষে গোধূলির রাঙা আলো যখন ছড়িয়ে পড়েছিল অম্বর প্রাসাদের মাথায়, সংলগ্ন পুষ্পশোভিত বাগিচাতে তখন সেদিন সেই ক্ষণে সারা দিনের সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফুলের সাজি হাতে ভাস্কর চম্পকের সামনে উপস্থিত হয়েছিল মালিনী মঞ্জরী। বেলা শেষের আলোতে মঞ্জরীকে সেদিন যেন আরও বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছিল। তাকে দেখে চম্পকের মনে হচ্ছিল কাননের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত বিশাল হর্ম্য প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার রূপ, শরীরী বিভঙ্গ দেখে যেন লজ্জা পাবে ইন্দ্রসভার উর্বশীরাও। চম্পকের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে মঞ্জরী বলেছিল, 'নাও এবার কাজ শুরু করো। সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই আর। অন্ধকার নামলেই আমাকে প্রাসাদে ফিরতে হবে। বাইরে থাকার অনুমতি নেই।'

মঞ্জরীর কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে ছেনি দিয়ে মর্মর স্তম্ভের গায়ে আঁক রচনা করার আগে একবার ভালো করে মঞ্জরীর পায়ের দিক থেকে ধীরে ধীরে তার শরীর বেয়ে ওপর দিকে তাকাল চম্পক। ঠিক কোন অংশ যে পাথরের গায়ে প্রথমে রচনা করবে তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন। চম্পকের চোখ গিয়ে স্থির হল মঞ্জরীর বক্ষবিভাজিকাতে। করজোড়ে কেউ যেমন কোনও কিছু গ্রহণ করে ঠিক তেমনই মঞ্জরীর শঙ্খের মতো স্তন যুগল যেন দুটো হাতের পাতার মতোই তাদের সংযোগ স্থলে, বক্ষ বিভাজিকাতে ধরে রেখেছে সূর্যের রক্তিম আলোককে। সেদিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর পাথরের গায়ে ছেনি দিয়ে প্রথম আঁক কাটল চম্পক। নিষ্প্রাণ মর্মর পাথরের গায়ে প্রথম রচিত হয়েছিল একটা গভীর দাগ—মঞ্জরীর বক্ষ বিভাজিকা। সেই গোধূলি বেলাতে পাথরের গায়ে রচিত হয়েছিল প্রাণের প্রথম স্পন্দন। আর তারপরই অবশ্য সন্ধে নেমেছিল। মঞ্জরী ফিরে গেছিল প্রাসাদে।

তবে শুধু সেদিন নয়, তারপর থেকে প্রতিদিনই সেই নির্দিষ্ট সময় আসতে শুরু করল মঞ্জরী। মর্মর পাথরের গায়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে শুরু করল তার অবয়ব। প্রথমে তার স্তন যুগল, তারপর গ্রীবা, মুখমণ্ডল। এ প্রস্তর খণ্ড যেন মঞ্জরীর আয়না! প্রথম প্রথম তেমন কোনও কথা বলত না মঞ্জরী। ওইটুকু সামান্য সময়ে কথা বলে কাজের ব্যাঘাত ঘটাত না কেউই। সূর্য ডুবলেই ফিরতে হয় মঞ্জরীকে। সে ফিরে যাবার পর ভাস্কর চম্পকও প্রাসাদ কানন ত্যাগ করে ফিরে আসত অম্বরনগরীর এক দরিদ্র পল্লীতে, তার বাসস্থানে। তবে স্বপ্নে জাগরণে সে শুধু দেখতে পেত সেই প্রস্তরমূর্তিকে অথবা মঞ্জরীকে। দুটোই তো সমার্থক। দিনের বেলাতে নিজ গৃহতেই থাকত চম্পক। তার সময় যেন কিছুতেই কাটতে চাইত না। কোনও রকমে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কাটিয়ে সে গিয়ে উপস্থিত হত প্রাসাদ কাননে। তারপর প্রতীক্ষা করত মঞ্জরীর জন্য।

boierpathshala.blogspot.com

ধীরে ধীরে এক সময় মৃদু কথাবার্তাও শুরু হল তাদের দুজনের মধ্যে। চম্পক জানতে পারল মঞ্জরী অষ্টাদশ বর্ষীয়া। মঞ্জরী লিখতে পড়তে জানে। তার মাতা বাল্যকালেই প্রয়াত হয়। পিতা ছিলেন একজন সামন্ত সর্দার। অর্থাৎ ছোট ভূস্বামী। অম্বররাজ যখন তাদের গ্রাম লুঠ করতে যান তখন মঞ্জরীর পিতা মঞ্জরীকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধরেছিলেন। মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাতে তিনি শিরচ্ছেদ করেছেন মঞ্জরীর পিতার। তার আর কেউ নেই। মঞ্জরীর প্রতি কেমন যেন একটা মমত্ববোধও জেগে উঠতে শুরু করেছিল যুবক ভাস্কর চম্পকের মনেও। মমত্ববোধ তো ভালোবাসারই এক রূপ। কিন্তু মঞ্জরীও যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে ভাস্কর চম্পক বুঝে গেল একদিন।

মূর্তি নির্মাণের কাজ তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কোমরের ওপরের অংশ, বক্ষ, গ্রীবা, মুখমণ্ডল রচিত হয়েছে। শুধু কোমর থেকে নীচের অংশ নির্মাণ বাকি। প্রতিদিনের মতো সেদিনও সূর্য ডুবতে চলেছে। লৌহ শলাকার আঘাতে কোমল মর্মর পাথরের গায়ে মঞ্জরীর নাভিমূল খোদাই করছিল চম্পক। হঠাৎ তাকে মঞ্জরী প্রশ্ন করল, 'কাজ শেষ হতে আর কতদিন লাগবে?'

পাথরের গায়ে খোদাই করতে করতে চম্পক জবাব দিয়েছিল 'আর বেশি দিন নয়। নিম্নাঙ্গে তো বেশি কাজ নেই। শুধু তোমার নিতম্ব, পদযুগল রচনা আর ঘাগরার অলঙ্করণ। আশা করছি, একপক্ষকাল আর সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই নির্মাণ সম্পন্ন করব।'

জবাব শুনে মঞ্জরী বলল, 'কাজটা আর একটু ধীর গতিতে করা যায় না ভাস্কর?'

'কেন, ধীর গতিতে কেন?' কাজ থামিয়ে, মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে জানতে চাইল চম্পক।

দিন শেষের রক্তিম আভা এসে পড়েছে মঞ্জরীর মুখে। চম্পককে অবাক করে দিয়ে মঞ্জরী জবাব দিল, 'তখন তো আর আমাকে তোমার প্রয়োজন হবে না ভাস্কর। আমার আর তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না। তুমি হয়তো আর এখানে আসবে না। এই প্রাসাদ আর কানন ছেড়ে বাইরে যাবার অনুমতি নেই আমার।'

এরপর একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'জানো, ইচ্ছা করলেই দ্বিপ্রহরের পরই আমি এখানে চলে আসতে পারি। আমার তো ভোরে আর সন্ধ্যায় পুষ্প চয়ন করে মালা গাঁথা ছাড়া অন্য কোনও কাজ থাকে না। তাছাড়া, তুমি যে আমাকে দেখে মূর্তি রচনা করছো তা আমি মহারানির প্রধান পরিচারিকাকে জানিয়েছি, যার অধীনে আমরা নানা শ্রেণির দাসীরা কাজ করি। কথাটা তাকে আগাম জানিয়েছি কারণ, ভবিষ্যতে ব্যাপারটা গোপন থাকবে না। অতিথিশালাতে এ মূর্তি স্থাপিত হলেই সবাই চিনতে পারবে এ মূর্তি কার। তখন আমাকে বিড়ম্বনায় পড়তে হত, হয়তো বা শাস্তির মুখেও। তাই আগাম জানাতে হয়েছে ব্যাপারটা। দ্বিপ্রহরে তোমার কাছে আসতে কেউ বাঁধা দিত না আমাকে। কারণ, মহারানি, প্রধান পরিচারিকার মাধ্যমে এ খবর জানার পর আমাকে এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন। তবুও আমি ভয়ে আসিনি পাছে তুমি দ্রুত কাজ সেরে ফেল সে জন্য।' কথাগুলো বলে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল মালিনী মঞ্জরী।

হতভম্ব ভাস্কর চম্পক। সে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মঞ্জরী তার সঙ্গ লাভের জন্য তার কাছে আসে! মঞ্জরীর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না ভাস্কর চম্পকের। বিস্মিত ভাবে সে বলল, 'তুমি আমার জন্য এখানে আসো!'

মঞ্জরী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তুমি যখন তন্ময় হয়ে মর্মর পাথরের গায়ে আমার ছবি ফুটিয়ে তোলো তখন আমিও তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি তোমার দিকে।'

boierpathshala.blogspot.com

এই বাক্যালাপের পর নিশ্চুপ ভাবে পরস্পরের মুখোমুখি বেশ কিছুক্ষণ তারা দুজন দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অম্বর প্রসাদের আড়ালে সূর্য ডুবে গেল। তার ছায়া এসে পড়ল মালিনী মঞ্জরীর মুখমণ্ডলে। যাবার সময় সে শুধু বলে গেল, 'কাল দ্বিপ্রহরেই আমি আসব। কিন্তু দোহাই ভাস্কর, আরও ধীর গতিতে আমার মূর্তি রচনা কোরো তুমি। আমি আরও কিছুদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

মঞ্জরী এ কথা বলে চলে যাবার পর বুকের ভিতর প্রবল এক উচ্ছ্বাস নিয়ে চম্পকও রওনা হল তার গৃহ অভিমুখে। সেরাতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না চম্পক। তার কানে শুধু বাজতে লাগল মঞ্জরীর বলা কথাগুলো, চোখে ভেসে উঠতে লাগল রাঙা আলোতে দেখা মঞ্জরীর করুণ মুখমণ্ডল—যেখানে জেগে ছিল ভাস্কর চম্পকের প্রতি প্রেমের আকুতি। মঞ্জরীরও কেউ নেই, চম্পকেরও কেউ নেই। এমনটা কী হতে পারে না যে অম্বর থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধল তারা? হ্যাঁ, এমন তো হতেই পারে। কিন্তু মঞ্জরী কি রাজি হবে তার প্রস্তাবে? এ সব ভাবতে ভাবতেই সে রাত কেটে গেল চম্পকের।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সে উপস্থিত হল প্রাসাদ কাননে। সে সেখানে উপস্থিত হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হল মঞ্জরী। ভাস্কর চম্পক তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'তোমার ভয় নেই মঞ্জরী। অতি ধীর গতিতেই মূর্তি নির্মাণ করব আমি। প্রতিদিন শুধু একবার শলাকার আঘাত হানব মূর্তির গায়ে। আর তাতে কাজ শেষ হতে হয়তো পক্ষকাল নয়, বৎসরও অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।' ভাস্কর চম্পকের কথা শুনে হাসল মালিনী মঞ্জরী। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চম্পক বলল, 'কিন্তু তুমি আমাকে কোনওদিন ছেড়ে যাবেনা তো মঞ্জরী?'

নিস্তব্ধ দুপুরে আম্রকুঞ্জ থেকে একটা কোকিলের ডাক ভেসে এল। 'কী করে যাব? তুমি যে আমাকে বেঁধে ফেলেছ আমার এই মূর্তির মধ্যে। আমার যদি কোনওদিন মৃত্যুও হয়, তবুও যুগ যুগ ধরে আমি ওই মূর্তির মধ্যে অবস্থান করব তোমার হাতের ছোঁয়াতে, ভালোবাসাতে গড়ে তোলা ওই মূর্তির মধ্যে। তুমি আমাকে স্পর্শ করলেই আবার জীবন্ত হয়ে উঠব আমি। মৃত্যুও আমাকে কেড়ে নিতে পারবে না তোমার থেকে।'

কথাটা শুনেই চম্পক তার হাত স্পর্শ করে বলল, 'না, না, এসব মৃত্যুর কথা মুখে এনো না তুমি। আমি যে ঘর বাঁধতে চাই তোমার সঙ্গে। বাঁধবে?'

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জরী। তারপর বিষণ্ণ ভাবে বলল, 'সে ঘর তো স্বপ্নে বাঁধা ছাড়া উপায় নেই। অম্বররাজ তো সে অনুমতি দেবেন না আমাদের।'

ভাস্কর চম্পক চারপাশে তাকিয়ে কেউ নেই দেখে জবাব দিল, 'অনুমতির দরকার নেই। অম্বর রাজ্য ছেড়ে দূরে কোথাও পালাব আমরা। এক বণিকের মুখে শুনছিলাম গুর্জর প্রদেশে নাকি এক প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার চলছে। প্রচুর শিল্পীর প্রয়োজন সেখানে। তেমন হলে সেখানেও পালানো যেতে পারে।

ভাস্করের কথায় যেন আশার আলো ফুটে উঠল মঞ্জরীর চোখে। সে বলল, 'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। প্রাসাদের বন্দি জীবনে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' এই বলে সে প্রচণ্ড আবেগে আলিঙ্গন করল চম্পককে। কাঁপতে থাকল তাদের শরীর প্রথম প্রেমের আলিঙ্গনে।

এদিনের পর থেকে প্রতিদিনই দ্বিপ্রহরে বাগিচায় আসতে শুরু করল মঞ্জরী। ফিরত সেই সূর্য ডোবার পর। সে ফিরে যাবার আগে মূর্তির গায়ে একটা মাত্র আঁচড় কাটত শিল্পী

boierpathshala.blogspot.com

চম্পক। দ্বিপ্রহর থেকে দিন শেষের সময়টুকু তারা ডুবে থাকতে লাগল প্রেমালাপে। তাদের মনে হতে লাগল জন্মজন্মান্তর যেন এমনই প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ তারা। তবে দিনের আলোতে উন্মুক্ত বাগিচাতে শরীরের ঘনিষ্ঠতা, মিলন সম্ভব ছিল না। মনের মিলন ঘটত তাদের। সময় এগিয়ে চলল। এক পক্ষকাল থেকে দু-ই পক্ষকাল, তিন, চার...

কিন্তু সাত পক্ষকাল পর একদিন প্রাসাদের প্রধান স্থপতি চম্পককে ডেকে জানিয়ে দিলেন আর কালক্ষেপ করা যাবে না। অতিথি এসে পড়লেন বলে! যে ভাবেই হোক আর এক পক্ষকালের মধ্যে মূর্তি নির্মাণ শেষ করে প্রাসাদের অতিথিশালাতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

সেদিন দ্বিপ্রহরে মালিনী মঞ্জরী উপস্থিত হতেই চম্পক কথাটা জানাল মঞ্জরীকে। ম্লান হয়ে গেল মঞ্জরীর মুখ। ভাস্কর চম্পক অবশ্য ততদিন খোঁজখবর নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিল যে, হ্যাঁ, মঞ্জরীকে নিয়ে সে গুর্জর প্রদেশেই পালাবে। বণিকদের থেকে সেখানে পৌঁছবার পথের হদিশও পেয়েছে চম্পক। মঞ্জরীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে তাকে আশ্বস্ত করে চম্পক বলল, 'এ সংবাদে তোমার শঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। বরং এখন এক অর্থে মূর্তি নির্মাণ শেষের পর বিকানিরে ফিরে আমার ক্ষুদ্র সম্পত্তি বিক্রি করলে আরও কিছু রৌপ্য মুদ্রা আসবে আমার হাতে। তারপর সেই মুদ্রা নিয়ে গুর্জরে পালাব আমরা। নতুন জায়গাতে ঘর বাঁধার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হবে আমাদের।

মঞ্জরী জানতে চাইল, 'বিকানির গিয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে তোমার? আমি যে মালা হাতে তোমার পথ চেয়ে থাকব?'

ভাস্কর চম্পক জবাব দিল, 'এক পক্ষকাল। তার মধ্যে সেই অতিথি এসে ফিরে চলে যাবেন। প্রাসাদের নজরদারীও শিথিল হবে কিছুটা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোনও এক রাতে অম্বরের সীমানা পেরিয়ে প্রথমে দিল্লির দিকে রওনা হব আমরা। তারপর সেখান থেকে ঘোড়ায় চেপে গুর্জরের পথ ধরব। আমার কণ্ঠে পরানো থাকবে তোমার মালা।'

এরপর এই পরিকল্পনা মতোই এগিয়ে চলছিল সব কিছু। ক'দিনের মধ্যেই মূর্তি রচনার কাজ সম্পন্ন করল ভাস্কর চম্পক। মালা হাতে মালিনী মঞ্জরীর অপূর্ব সুন্দর মর্মর মূর্তি। আকারে, উচ্চতায় অবিকল সে মঞ্জরীর মতোই। সেই শ্বেত পাথরের মালিনী মূর্তি যেন দু-হাতে একটা ফুলের মালা তুলে পরিয়ে দিতে চাইছে তার সামনে যে দাঁড়াবে তার গলাতে। সবাই চমৎকৃত হল সেই জীবন্ত মূর্তি দেখে। মূর্তি স্থাপন করা হল অতিথিশালাতে। প্রাপ্য পারিতোষিক একশ স্বর্ণমুদ্রাও মিলে গেল শিল্পী চম্পকের। আর তার পরদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জরীর থেকে বিদায় নিয়ে বিকানিরের উদ্দেশে রওনা হল চম্পক। অশ্রু সজল চোখে, তাকে বিদায় জানালো মালিনী।

—বিছানাতে উঠে বসল চম্পক। অন্ধকার তখন অনেকটাই কেটে গেছে। জ্যোৎস্নার আলো ঢুকছে ঘরে। কিন্তু মঞ্জরী এখন কোথায়? আর সেই বা এই অপরিচিত কক্ষে কীভাবে এল? ভাবার চেষ্টা করতে লাগল চম্পক।

৩

প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল চম্পক। অস্পষ্ট কিছু ভাবনা তার মনের মধ্যে ফুটে উঠছে ঠিকই, কিন্তু তা যেন গাঢ় কুয়াশার চাদরে মোড়া! ভাবতে ভাবতে চম্পকের রগগুলো দপদপ করতে লাগল। প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

boierpathshala.blogspot.com

সেই মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য চম্পক পালঙ্ক থেকে নেমে সেই লৌহ শলাকা স্থাপিত বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়াল। ভাস্কর চম্পক যে কক্ষে অবস্থান করছে তা বাটিকার দ্বিতলে অবস্থিত। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত বাইরের পৃথিবী। সুউচ্চ প্রাকার বেষ্টিত উদ্যান শোভিত এই প্রাসাদোপম বাটিকা। চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। নিস্তব্ধ পৃথিবীতে মোম জ্যোৎস্না যেন চুঁইয়ে পড়ছে তাদের গা বেয়ে।

গবাক্ষ দিয়ে নীচের উদ্যানের দিকে তাকাল চম্পক। তার দৃষ্টি ছুঁয়ে যেতে লাগল কাননের প্রাচীন বৃক্ষগুলোকে। হঠাৎই একটা গাছের দিকে তাকিয়ে চম্পকের চোখ আটকে গেল। যে গাছের মাথাটা ঠিক যেন একটা ছাতার মতো। তার ছায়া আধো অন্ধকার সৃষ্টি করেছে বাড়ির চারপাশে। তবু মধ্যে চম্পক দেখতে পেল একজন দাঁড়িয়ে আছে সেই অন্ধকারে! মনে হচ্ছে কোনও এক নারী মূর্তি! গাছের নিচে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সেও যেন তাকিয়ে আছে দ্বিতলের এই গবাক্ষের দিকে। ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে চম্পক বুঝতে পারল, হ্যাঁ, সে একজন নারী! কিন্তু কে এই নারী? তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা যেন বিশেষ পরিচিত ভাস্কর চম্পকের কাছে! আর এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চম্পক চিনে ফেলল তাকে। ও যে মঞ্জরী! চম্পকের জন্যই প্রতীক্ষা করছে সে!

যে কুয়াশার চাদরে চম্পকের স্মৃতি আবৃত ছিল তা যেন চকিতে সরে গেল। চম্পকের মনে পড়ে গেল তার ভুলে যাওয়া অতীতের বাকি অংশটুকু, বর্তমান সবকিছু। এ স্থান রাজপুত ভূমি অম্বর বা বিকানির নয়। এ হল বঙ্গদেশ, আর এ প্রাসাদ শ্রেষ্ঠী মোতি সিংহের প্রাসাদ। অম্বররাজ যার কাছে মালিনী মঞ্জরীকে তুলে দিয়েছিল!

ঝড়ের গতিতে ভাস্কর চম্পকের মনে পড়ে যেতে লাগল সব ঘটনা। মঞ্জরীকে অম্বরে রেখে বিকানিরে গেছিল চম্পক। বিকানির থেকে অম্বরে ফিরেও এসেছিল নির্দিষ্ট সময়তেই। কিন্তু বিকানিরে ফিরে সে সেই ভয়ঙ্কর খবরটা পায়। মঞ্জরীর যে প্রস্তরমূর্তি অনেক যত্নে, ভালোবাসাতে ভাস্কর চম্পক নির্মাণ করেছিল সেই মূর্তিই সর্বনাশ ঘটিয়েছে চম্পক আর মঞ্জরীর জীবনে।

চম্পক বিকানির রওনা হবার দু-দিনের মধ্যেই অম্বর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী মোতি সিংহ। অতিথিশালাতে প্রস্তর মূর্তিটা দেখে তিনি জানতে চান যে এই সুন্দর নারী মূর্তি কি শুধুই মনের কল্পনা, নাকি কোনও নারীকে দেখে রচনা করা হয়েছে? ব্যাপারটা সবারই জানা ছিল, তাই অতিথির সামনে হাজির করা হয় মালিনী মঞ্জরীকে। অম্বররাজ নিজেও তখন অতিথি সৎকারের জন্য অতিথিশালায় উপস্থিত ছিলেন। মঞ্জরীকে, অতিথির মনে ধরেছে বুঝতে পেরে অম্বররাজ তাকে বলেন যে তিনি মালিনীকে উপহার স্বরূপ প্রদান করবেন শ্রেষ্ঠীকে। সেই নারীরত্ন উপহার নিয়ে বঙ্গদেশে রওনা হয়েছেন ধনাঢ্য মোতি সিংহ। শুধু মঞ্জরীই নয় তার মূর্তিটাও তার সঙ্গে গেছে। কারণ, মঞ্জরী নাকি কিছুতেই মোতি সিংহের সঙ্গীনী হতে রাজি হচ্ছিল না। সে নাকি তার মূর্তিটাকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক অনুরোধ, শাস্তির ভয় দেখাবার পরও যখন মালিনীকে পালকিতে বসাতে রাজি করানো গেল না। তখন মূর্তি সমেত তাকে হাতির শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে বঙ্গদেশের পথে রওনা হন শ্রেষ্ঠী।

খবরটা যেন বজ্রপাতের মতো আঘাত হেনেছিল ভাস্কর চম্পকের ওপর। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর চম্পক অম্বর ত্যাগ করে রওনা হয় বঙ্গদেশের দিকে। সে যাত্রাপথ যেন অনন্ত এক যাত্রাপথ! কত ঘটনা দুর্ঘটনা। কখনও সে ঠগীদের খপ্পরে পড়েছে, কখনও রাজপ্রহরীদের, কখনও সে আবার আশ্রয় পেয়েছে কোনও অচেনা

boierpathshala.blogspot.com

জায়গাতে এক একজন অপরিচিত মানুষের গৃহে। তারপর এক সময় সে এসে পৌঁছেছে এই বঙ্গদেশে।

বঙ্গদেশে কোনও ক্ষুদ্রদেশ নয় যে সঙ্গে সঙ্গে মিলে যাবে মোতি সিংহের বাড়ির ঠিকানা। বঙ্গদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সে ছুটে বেড়িয়েছে মঞ্জরীর খোঁজে। কখনও মুর্শিদাবাদে নবাবের ভৃত্যের কাজ, কখনও সুতানুটিতে মৃৎ শিল্পীর কাজ, আলীনগরে ফিরিঙ্গি কোঠীতে গোমস্তার কাজ। মনে হয় যেন এসব এক-একটা আলাদা আলাদা জন্মের ঘটনা। কত মানুষ তার জীবনে এসেছে আবার হারিয়ে গিয়েছে। আর এসবের মধ্যেই সে খুঁজে বেড়িয়েছে তার প্রেয়সী মঞ্জরীকে। তাকে যে উদ্ধার করতেই হবে চম্পককে।

গত কয়েকদিন যাবত যে কাজটা সে করছিল, সেটা ছিল একটা শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকের কাজ। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি তাকে একদিন বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দি করা হল। সেখানে তার নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল অপরেশ। কতরকম লোক বন্দি আছে সেখানে। তাদের মধ্যে কেউ রাজা, কেউ ওমরাহ, কেউ নবাব, কেউ বণিক বলেও পরিচয় দিত নিজেদের। তাছাড়া সাধারণ মানুষ তো ছিলই। দীর্ঘদিন সেই কারাগারে বন্দি থাকার পর তিনদিন আগে সঞ্জীবন নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন এই প্রাসাদে। কিন্তু এ প্রাসাদেই যে মঞ্জরীর দেখা মিলে যাবে তা ভাবতেও পারেনি শিল্পী চম্পক।

যে গাছটার নীচে মঞ্জরী এখন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই গাছটার নীচেই বিকালবেলা উদ্যান ভ্রমণের সময় তাকে দেখতে পায় চম্পক। আশেপাশে তখন আরও অনেক লোকজন ছিল। তারা পরস্পরকে দেখতে পেলেও কেউ কোনও বাক্যালাপ করেনি পাছে অন্যদের কাছে তাদের পূর্ব পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায় সেই ভয়ে। তাদের যে পালাতে হবে বঙ্গদেশের এই সুতানুটি ত্যাগ করে। তবে তারা মুখে কোনও কথা না বললেও মঞ্জরীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব পাঠ করতে অসুবিধা হয়নি চম্পকের। যে চোখ বলছিল, 'তুমি একদিন আসবে আমি জানতাম। আমি যে তোমারই জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

লোকজনের সামনে কথা বলতে না পারলেও চম্পক একটা কাজ করে এসেছিল। একটা বার্তা লিখে সবার অলক্ষে কাগজের টুকরোটা গুঁজে দিয়েছিল মঞ্জরীর কাঁচুলির ভাজে। আর সে জন্যই এখন গাছের নীচে উপস্থিত হয়েছে মঞ্জরী। সে অপেক্ষা করে আছে তার প্রেমিকের জন্য। যেন জন্ম জন্মান্তরের প্রতীক্ষার অবসান হবে এবার। আজ রাতেই মঞ্জরীকে নিয়ে পালাবে চম্পক।

মুহূর্তের মধ্যেই যেন সব স্মৃতি ফিরে পেল চম্পক। আর দেরি করা চলবে না। মঞ্জরী দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। কক্ষের অর্গল খুলে বাইরে বেরিয়ে এল চম্পক। না, অলিন্দে অন্য কেউ নেই। নিস্তব্ধ, শূন্য অলিন্দ অতিক্রম করে সোপানশ্রেণি বেয়ে চম্পক বাটিকা প্রাসাদের উদ্যানে নেমে এল। হ্যাঁ, কিছুটা তফাতে সেই গাছের নীচে মঞ্জরী দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর চম্পক এগোল সেই গাছের দিকে।

মঞ্জরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল চম্পক। আধো অন্ধকারে একটা ফুলের মালা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে মালিনী মঞ্জরী। ঠিক যেন তার মূর্তিটার মতোই। পাতার ফাঁক গলে এক খণ্ড চাঁদের আলো এসে পড়েছে মঞ্জরীর মুখমণ্ডলে। আনত দৃষ্টি তার। ভাস্কর চম্পক তার বাহু স্পর্শ করতেই বহু দিন পর প্রেমিকের স্পর্শ পেয়ে একটু কেঁপে উঠে মুখ তুলে চম্পকের দিকে তাকাল মালিনী। তার চোখের পাতাদুটো যেন তিরতির করে আবেগে, রোমাঞ্চে নড়ে উঠল। এত দিন পর পরস্পরকে পেয়ে বেশ কিছু সময় বাকরুদ্ধ ভাবে

boierpathshala.blogspot.com

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। চাঁদ যেন হাসছে আকাশ থেকে। আশেপাশের বৃক্ষরাজী যেন নির্বাক ভাবে তাকিয়ে দেখছে এই মিলনদৃশ্য। চম্পক খেয়াল করল মালিনী মঞ্জরীর চোখের কোণ যেন চাঁদের আলোতে চিকচিক করছে। আনন্দাঅশ্রু। তা দেখে চম্পক মৌনতা ভঙ্গ করে বলল, 'আমি এসেছি মঞ্জরী। তোমার আর কোনও চিন্তা নেই। জানো, কত দিন ধরে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। মনে হয় যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তোমাকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। যেন বহুযুগ পেরিয়ে এসে আজ তোমার দেখা পেলাম।'

ভাস্কর চম্পকের কথা শুনে মঞ্জরীর ঠোঁটদুটো আবেগে কেঁপে উঠল। সে বলল, 'আমিও যে জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার জন্যই এই মালা হাতে প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম এক জন্মে না হলেও অন্যজন্মে, পরজন্মে তুমি আমার কাছে আসবেই। এই ফুলমালা তোমার কণ্ঠে পরাবই আমি। তুমি যে আমার জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসা।'

কথাগুলো বলে মঞ্জরী সেই ফুলমালা পরিয়ে দিল চম্পকের কণ্ঠে। জ্যোৎস্নার আলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঝিকিমিকি করে উঠল বহু যুগের ওপার থেকে আসা মৃত তারার দল।

চম্পক জানতে চাইল 'আমি যেমন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি তেমন কি তুমিও খুঁজে বেড়িয়েছ আমাকে?'

মঞ্জরী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, যুগ যুগ ধরে আমিও তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি আমার হৃদয়ে। তবে আমি বন্দিনী। এ প্রাসাদ কাননে আসার পর আমার আর বাইরে যাবার কোনও উপায় ছিল না। তবে আমি জানতাম আমাদের ভালোবাসা সত্যি। তুমি একদিন এখানে আসবেই আমার এ মালা কণ্ঠে ধারণ করার জন্য। তুমি যখন নিমগ্ন হয়ে আমার মূর্তি রচনা করতে তখন আমিও একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম তোমার দিকে। মনে পড়ে ভাস্কর? আমি জানতাম শেষ একবার তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবেই। তোমার গলায় ফুলমালা পরিয়ে দিয়ে মুক্তি পাব আমি। আর তুমিও মুক্তি পাবে জন্ম জন্মান্তরের এই বিরহ যন্ত্রণা থেকে। এই শেষ দেখা আমাদের।'

কথাটা শুনেই ভাস্কর চম্পক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সব কিছু মনে আছে আমার। অম্বর প্রাসাদ কাননে শেষ বিকালের সূর্যালোকে তোমাকে প্রথম দেখা থেকে শুরু করে নির্জন দ্বিপ্রহরে তোমার স্পর্শ পাওয়া প্রতিটা মুহূর্ত। কিন্তু, শেষ দেখা বলছ কেন তুমি? শেষ নয় শুরু বলো। আজ রাতেই এ স্থান ত্যাগ করে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধব আমরা। যেমন আমরা ভেবেছিলাম। তোমাকে পথে পথে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে বহু দেশ পেরিয়ে এসেছি আমি। অনেক গ্রাম-নগরী চেনা আছে আমার। নানা ধর্ম, নানা জাতের নানা ভাষার মানুষও আমার চেনা। তারা আমাদের আশ্রয় দেবে। শেষ নয়, এবার শুরু হবে আমাদের নতুন জীবন।'

কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জরী। একটা বিষণ্ণতা জেগে উঠল তার মুখমণ্ডলে। সে বলল, 'তা আর হবার নয়। আমাদের প্রেমের আখ্যান এখানেই শেষ হল।'

ভাস্কর চমকে বিস্মিত ভাবে বলল, 'শেষ হল মানে? এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে এখনই রওনা হব আমরা। রক্ষীরা সব নিদ্রামগ্ন। চলো তবে। আর এখানে থাকা আমাদের উচিত হবে না।'

মালিনী জবাব দিল, 'কিন্তু আমার যে তোমার সঙ্গে যাওয়া হবে না ভাস্কর।'

boierpathshala.blogspot.com

চম্পক উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, 'যাওয়া হবে না মানে? কত কাল ধরে তোমাকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে। তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধব বলে। কেন যাবে না তুমি?'

একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল মালিনীর ঠোঁটে। সে জবাব দিল যাওয়া যাবে না কারণ, যে যুগ যে সময় আমরা পিছনে ফেলে এসেছি সেখানে আর ফেরা যাবে না বলে। অতীতে কেউ ফিরে যেতে পারে না বলে!'

মঞ্জরী কী বলছে তা বুঝতে না পেরে চম্পক তাকিয়ে রইল তার দিকে। মালিনী মঞ্জরীর চোখের কোণ বেয়ে এবার জল নামতে শুরু করেছে। না, এ অশ্রু আনন্দের নয়, বেদনার অশ্রু, বিচ্ছেদের অশ্রু।

শেষ একবার তার প্রিয়তমর দিকে মুখ তুলে তাকাল মালিনী মঞ্জরী। তারপর বলল, 'নবজন্মে ভালো থেকো ভাস্কর। এবার তুমি আমাকে ভুলে যাবে।'

চাঁদের আলোতে চম্পকের দিকে তাকিয়ে আছে মঞ্জরী। বন্যার স্রোতের মতো তার দু-চোখ ছাপিয়ে জল নামছে।

চম্পক তাকে কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এক খণ্ড মেঘ এসে যেন ঢেকে দিল চাঁদটাকে। চারপাশে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। ভাস্কর চম্পকের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল মালিনী মঞ্জরী। চম্পক বলে উঠল, 'মঞ্জরী তুমি কোথায়?'

কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না। আর এরপরই চম্পকের মাথার ভিতরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে শুরু করল। তার মনে হতে লাগল তার মাথার ভিতর থেকে সব ভাবনা সব স্মৃতি যেন মুছে যাচ্ছে। মরুপ্রদেশের অম্বর প্রাসাদের সেই কানন, সেই প্রস্তর মূর্তি, মালিনী মঞ্জরীর মুখ, এমনকী ভাস্কর চম্পকের নিজস্ব সত্তাটুকু, আত্মপরিচয়ও যেন হারিয়ে ফেলছে সে। তার গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছে না। শরীর কাঁপছে তার। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল ভাস্কর চম্পক।

আর যখন হুশ ফিরল, তখন আবার চাঁদের আলো ফুটেছে। সে দেখল বাগানে একটা গাছের নীচে সে বসে আছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা শ্বেত পাথরের নারীমূর্তি। এই প্রাচীন বাড়িটার বাগানে নানা ধরনের মূর্তি আছে। তেমনই একটা মূর্তি এটা। তবে এত রাতে সে এখানে কেন বুঝতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তিটার দিকে একবার তাকিয়ে বাগান ছেড়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করার জন্য এগোল সে।

৪

কলকাতা শহর একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করলেও শহরের উপকণ্ঠে এ বাড়িটা বেশ প্রাচীন। বাড়ি না বলে একে ছোটখাটো একটা প্রাসাদ বলাই ভালো। নাম 'মোতি মঞ্জিল।' ডাক্তার সঞ্জীবন বসু এ বাড়ি সম্পর্কে যতটুকু শুনেছেন তাতে কলকাতা নগরী পত্তনের কিছু সময় পরই মোতি সিংহ নামের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নাকি এই প্রাসাদ ভবন নির্মাণ করান। অর্থাৎ এই বাড়িটার বয়স কমপক্ষে তিনশ বছর। নিজের দেশ রাজস্থান থেকে বেশ কিছু সুন্দর পাথরের মূর্তি এনে মোতি সিংহ সাজিয়েছিলেন বাড়িটাকে। এখনও তার বেশ কিছু দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটাতে। কিছু দিন আগে এ বাড়িটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হাতে। তাদের মাধ্যমেই প্রাচীর ঘেরা এই বাড়িটাকে মেরামত

boierpathshala.blogspot.com

করে নিয়ে এখানে একটা 'মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধার কেন্দ্র' চালান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সঞ্জীবন বসু। অর্থাৎ 'লুনাটিক অ্যাসাইলাম', লোকে যাকে চলতি কথায় পাগলাগারদ বলে, সেখান থেকে প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার আগে কিছুদিনের জন্য এই মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধার কেন্দ্রে এনে রাখা হয়।

বাড়ির ভিতর নিজের কাজের ঘরে বসেছিলেন সঞ্জীবন। বেলা দশটা বাজে। সূর্যের আলো খেলা করছে সামনের বাগানে। তিনদিন আগে তিনি অ্যাসাইলাম থেকে একজন প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীকে এনেছেন এ বাড়িতে। লোকটার নাম অপরেশ মিশ্র। লোক মানে একজন যুবক। তার কেস হিস্ট্রিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন মনোবিদ সঞ্জীবন। প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর কেস হিস্ট্রিটা বড় অদ্ভুত!

সরকারি আর্ট কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন অপরেশ। হঠাৎই তার মাথাটা কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যায়। সে দাবি করতে থাকে তার নাম নাকি চম্পক সিংহ। জয়পুরের অম্বর প্রাসাদে সে নাকি ভাস্করের কাজ করত। আদি বাড়ি তার রাজস্থানের বিকানিরে! তার প্রেমিকা মঞ্জরী নামের কোনও এক মেয়ের খোঁজে সে রাজস্থান থেকে এ-বাংলাদেশে এসেছে! অথচ তার পরিবারের দাবি রাজস্থান তো দূরের কথা অপরেশ কোনওদিন কলকাতা ছেড়ে দীঘা পর্যন্ত যায়নি। যাই হোক, সেই মঞ্জরীর খোঁজে নাকি কলকাতার রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিল অপরেশ। বাধ্য হয়ে তাকে তার বাড়ির লোকরা অ্যাসাইলামে পাঠায়। দীর্ঘদিন সেখানে থাকার পর বর্তমানে সে প্রায় সুস্থ।

কেস হিস্ট্রিটা দেখছিলেন তিনি। এমন সময় অপরেশ সে ঘরে প্রবেশ করল। গুড মর্নিং জানিয়ে সে ডাক্তার সঞ্জীবন বসুর চেম্বারে বসল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আমি কবে বাড়ি ফিরব ডাক্তারবাবু? বাড়ি ফিরে আমাকে কাজে যেতে হবে। অনেকদিন সেখানে যেতে পারিনি অসুস্থ ছিলাম বলে।'

মনোবিদ সঞ্জীবন প্রথমে হেসে জবাব দিলেন 'আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে ছেড়ে দেব।'

এ কথা বলার পর অপরেশ কতটা সুস্থ হয়েছে তা একবার পরীক্ষা করার জন্য সঞ্জীবন তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনি চম্পক সিংহ বলে কোনও নামের সঙ্গে পরিচিত?'

অপরেশ জবাব দিল 'না।'

'মঞ্জরী নামের কোনও মহিলার সঙ্গে?'

অপরেশ জবাব দিল, 'না, এ নামের কোনও মহিলাকে তো চিনি না। নামটাই প্রথম শুনলাম।'

সঞ্জীবন তাকে শেষ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি রাজস্থানে গেছিলেন কখনও? জয়পুরের অম্বর প্রাসাদে?'

সমরেশ বলল, 'দীঘা, পুরী দেখা হল না তো রাজস্থান! কলকাতার বাইরেই কখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

অপরেশের জবাব শুনে ডাক্তার সঞ্জীবন বসু বুঝতে পারলেন অপরেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার মাথার ভিতর থেকে মুছে গেছে অদ্ভুত ভাবনাগুলো।

অপরেশ এরপর তাকাল জানলার দিকে। আলো ঝলমলে সকালে জানলার বাইরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা পূর্ণাবয়ব নারীমূর্তি। যেটা

boierpathshala.blogspot.com

দেখিয়ে অপরেশ, ডাক্তারবাবুকে বলল 'মূর্তিটা খুব সুন্দর তাই না? কাল বিকালে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে দেখেছিলাম। ওটা কার মূর্তি?'

সঞ্জীবন মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভারি সুন্দর মূর্তি। প্রাচীন মূর্তি। তবে কার মূর্তি বলতে পারব না। শুনেছি মূর্তিটা নাকি রাজস্থান থেকে বহুকাল আগে আনা হয়েছিল।'

তবে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে একটা ব্যাপার তারা কেউ খেয়াল করল না। মূর্তির হাতে ধরা পাথরের তৈরি ফুলের মালাটা আর নেই। সেটা তার হাত থেকে খসে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে তার পায়ের কাছে।

মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপরেশ বলল, 'মঞ্জরী বলে কাউকে আমি না চিনলেও আপনার বলা ওই নামটা আমার বেশ লেগেছে। শিল্পী ভাস্করদের মধ্যে প্রস্তরমূর্তির নাম দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে, জানেন নিশ্চয়। আমি এই মূর্তির ভাস্কর না হলেও আমার খুব ইচ্ছে করছে সেই মূর্তিটার একটা নাম দিতে। তাই, আজ থেকে এই মূর্তিটার নাম দিলাম—"মঞ্জরী"।'

boierpathshala.blogspot.com

কর্ণসুবর্ণর কড়ি

boierpathshala.blogspot.com

এই প্রাচীন প্রত্নস্থল থেকে ছাত্রছাত্রী আর মজুরদের দল চলে যাবার পরই জায়গাটা কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। একাই এ জায়গাতে রয়ে গেছেন মানববাবু। আজ দশমী। কালই অবশ্য পুজোর ছুটি কাটিয়ে এখানে ফিরে আসবে সবাই।

জায়গাটাতে একলা দাঁড়িয়ে ছিলেন মানববাবু। চারদিকে যতদূর চোখ যায় অনাবাদি পতিত জমি। আর তারই মাঝে কচ্ছপের পিঠের মতো এই জায়গাটা। যার ভিতর থেকে বহু শতাব্দী ধরে মাটির নীচ থেকে উঁকি মারছে এক প্রাচীন কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ। ইটের তৈরি দেওয়াল, ছাদহীন কক্ষ, ইট বিছানো উঠানের মতো অংশ। মানববাবুর নেতৃত্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাততত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে খনন কার্যের ফলে গত একমাসে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে অতি প্রাচীন এই স্থাপত্য কীর্তি। বছর দশেক আগে একটু কাকতালীয় ভাবেই এ জায়গাতে মাটির নীচে যে এমন ধরনের কিছু আছে তার সন্ধান মিলেছিল। আশেপাশের পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য সেচ দপ্তর এখানে কূপ খননের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু মাটি খুঁড়তেই নীচ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে ছোট ছোট প্রাচীন ইটের টুকরো। সঙ্গে সঙ্গে সেচ দপ্তর কাজ থামিয়ে খবর দেয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে। কারণ, এ অঞ্চল সুদূর অতীতে ছিল বাংলার রাজধানী। যার নাম ছিল কানাসোনা বা কর্ণসুবর্ণ।

বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্কদেব এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক সমৃদ্ধ নগরীর। দেড় হাজার বছরের প্রাচীন সেই নগরীর কিছু কিছু নিদর্শন মাটির নীচ থেকে উঠে এসেছে এ অঞ্চলের নানা জায়গাতে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। কাজেই কূপ নির্মাণের সময় পোড়ামাটির ইটের টুকরো মাটির নীচ থেকে উঠে আসাতে এমনই কিছু থাকতে পারে। এই অনুমানের ভিত্তিতে সেচ দপ্তর তাদের কাজ থামিয়ে স্বাভাবিক কারণেই খবরটা পাঠিয়েছিল পুরাতত্ত্ব বিভাগকে। সে সময় কিছুটা খনন কার্য হয়েও আবার তা বন্ধ হয়ে যায়।

সরকার বর্তমানে আবার উদ্যোগী হয়ে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান মানববাবুর ওপর। বিভাগের কিছু ছাত্রছাত্রী আর লোকজন নিয়ে এখানে ক্যাম্প খাটিয়ে কাজে নেমে পড়েছেন মধ্যবয়সি পুরাতত্ত্ববিদ মানব চক্রবর্তী। উৎখননের ফলে বেশ কিছু প্রাচীন জিনিসও উদ্ধার হয়েছে মাটির নীচ থেকে। পোড়ামাটির তৈরি পাত্র, প্রদীপ। আর আজ সকালেই একটা কুলুঙ্গি থেকে মানববাবু খুঁজে পেয়েছেন কড়ি ভর্তি একটা মাটির ঘট। তবে এ জায়গাটা আসলে কী ছিল এখনও তা ঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেননি মানববাবু। তবে খনন কার্য এখনও অনেকটা বাকি। তা সম্পন্ন হলে হয়তো এ জায়গার পরিচয় উন্মোচিত হবে। হতে পারে এ জায়গাতে কোনো মঠ ছিল, অথবা কোনও ধনীর বাসগৃহ কিম্বা কোনও দেবদেউল। অনেক কিছু হতে পারে।

আগামী কাল দুর্গা পুজোর পঞ্চমী। তাই সবাই চলে গেল। মানববাবু রয়ে গেলেন কারণ তিনি নির্জনতা উপভোগ করতে চান। কলকাতায় তার ফ্ল্যাটের গায়েই একটা দুর্গাপুজো হয়। পুজোর ক'টাদিন সর্বক্ষণ সেখানে মাইক বাজে। দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখলেও সেই শব্দাসুরের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। ফ্ল্যাটে একাই থাকেন অকৃতদার মানববাবু। পরিবার নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোবার ব্যাপারও নেই তার। কাজেই তিনি একাই এখানে রয়ে গেছেন। যতটা পেরেছেন একলা-একলাই কাজ করেছেন একটা দিন।

দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে প্রাচীন কাঠামোর ওপর। কত যুগ মাটির নীচে ঘুমিয়ে থাকার পর আবার সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখছে এই অতি প্রাচীন স্থাপত্যগুলো। মানববাবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কোন এক সুদূর অতীতে এই সূর্যাস্তের সময় এখান

boierpathshala.blogspot.com

থেকে হয়তো ঘণ্টাধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত চারপাশে, দিবাবসানে সন্ধ্যার আগমন বার্তা ধ্বনিত হত শঙ্খনাদের মাধ্যমে, হয়তো বা নারীর দল অবগাহন সেরে পট্টবস্ত্রে, ফুলমালায় সজ্জিত হয়ে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করত। এমনকী এটা হয়তো ছিল কোনও নৃত্যশালা। হয়তো ঠিক এই সময়েই তার সামনের ওই ছাদহীন কক্ষে বসে পায়ে ঘুঙুর বাঁধত কোনও নর্তকী, অথবা বাদ্যযন্ত্রের তার বাঁধত কোনও প্রাচীন বাদ্যকার।

জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে অতীত প্রসঙ্গে নানা কথা ভাবতে লাগলেন মানববাবু। আর এসব ভাবতে ভাবতেই এক সময় সূর্য ডুবে গেল দিকচক্রবালে। মৃদু ঠান্ডা বাতাসও বইতে শুরু করল। মানববাবু এগোলেন কিছুটা তফাতে ওই প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে তার থাকার জায়গার দিকে। এই প্রাচীন কাঠামোর খানিক তফাতে তাঁবু খাটিয়ে মজদুর ও ছাত্রছাত্রীরাও রাত্রিযাপন করে। সে সব তাঁবু অবশ্য এখন গুটিয়ে রাখা হয়েছে। আর মানববাবু থাকেন এই ধ্বংসস্তূপের ভিতরেই ছাদহীন এক প্রাচীন কক্ষের ভিতর মাথার ওপর একটা ত্রিপল টাঙিয়ে। জায়গাটাকে একটা ঘরের মতো করে নিয়েছেন তিনি।

ঘরের ভিতর একটা লোহার ক্যাম্পখাটে মানববাবুর শোবার ব্যবস্থা। মানববাবুর কাজের জন্য একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও আছে ঘরে। খননকার্যের ফলে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে, সেগুলোও ও ঘরে রাখা আছে। আর আছে তার নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস। মানববাবু সেখানে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুপ করে বাইরে অন্ধকার নামল। তেলের বাতিটা জ্বালিয়ে নিলেন তিনি। তার পর ষ্টোভ জ্বেলে প্রথমে দুপুরে রান্না করা খাবার গরম করে খাওয়া সেরে নিলেন। তার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি টেবিলে বসে কাজে লেগে পড়লেন।

কড়ি ভর্তি মাটির ঘটটা রাখা আছে টেবিলের ওপরই। কড়িগুলোকে প্রথমে টেবিলের ওপর ঢাললেন তিনি। মোট ষোলোটা মাঝারি আকৃতির কড়ি। তার আটটার রং সাদা, বাকি আটটা কালচে বাদামি রঙের। তাদের গাগুলো এখনও খুব মসৃণ। সময় যেন তার উজ্জ্বল্য এখনও কেড়ে নিতে পারেনি। মানববাবু জানেন ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর বাংলাতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তারপর সমুদ্র বাণিজ্যে অধোগতির জন্য অষ্টম শতকে প্রায় উধাও হয়ে যায় স্বর্ণ মুদ্রা। সমতট হরিকেল অঞ্চলে স্বর্ণমুদ্রার বদলে ধনীরা দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যবহার করতেন রৌপ্য মুদ্রা। তবে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষরা কড়ি ব্যবহার করতেন মুদ্রার বিকল্প হিসাবে। এ কড়ি কিন্তু বাংলাদেশে পাওয়া যেত না। কড়ি আসত সুদূর মালদ্বীপ থেকে।

মানববাবু প্রথমে কড়িগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রত্যেকটা কড়ির পিঠে সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র আছে। সে যুগে কড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যমই ছিল না, অলঙ্কার হিসাবেও ব্যবহৃত হত। ছিদ্রগুলো দেখে মানববাবু ভাবলেন, এ কড়িগুলো কি তবে কোনও ছিন্ন মালার অংশ ছিল? যা শোভিত থাকত কোনো নারীর কণ্ঠে, অথবা তার কটিদেশ আবৃত করে? ইতিহাসের সেই ছিন্ন সুতোয় মালা গাঁথা ছিল, একদিন তা ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে? এমনটা তো হতেই পারে।

কড়িগুলো দেখার পর তিনি ঘটটা পরীক্ষা করতে বসলেন। পোড়া মাটির তৈরি একটা ঘট, তার গা আর মুখের কানা খুব মসৃণ। যে প্রাচীন কুম্ভকারের চাকে এই ঘটটা তৈরি হয়েছিল তার হাতের কাজের প্রশংসা করতেই হয়। নরম ব্রাশ দিয়ে ঘটটার বহিঃপৃষ্ঠ ভালো করে পরিস্কার করে আতস কাচের সাহায্যে তিনি দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন তার গায়ে কোথাও হারিয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম অলঙ্করণ, লিপি বা চিহ্ন আছে কিনা? যার থেকে

boierpathshala.blogspot.com

হয়তো ইঙ্গিত মিলতে পারে ইতিহাসের কোনও অজানা অধ্যায়ের, হয়তো বা মিলে যেতে পারে এ জায়গায় কোনও পরিচয়।

২

মানববাবু কাজ করছিলেন। হঠাৎ এক অস্পষ্ট শব্দ শুনে মুখ তুললেন তিনি। ঘরটার প্রবেশমুখের বাইরে যেন একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে! মানববাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে ওখানে?'

এবার ঘরে প্রবেশ করল একজন মাঝবয়সি লোক। তার পরনে ধুতির মতো একটা বস্ত্র জড়ানো, গায়ে একটা সাদা উড়নি। ঘরের ভিতর প্রবেশ করে একটু জড়োসড়ো হয়েই সে দাঁড়াল। কাছের গ্রামটা এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এখানে লোক এল কোথা থেকে? তাই মানববাবু মৃদু বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনি?' লোকটা প্রণামের ভঙ্গিতে হাত দুটো জড়ো করে মাথাটা মৃদু ঝুঁকিয়ে বলল, 'আমি স্থানীয় মানুষ আমার নাম মার্তণ্ড। ব্রাহ্মণ। সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। আলোক শিখা দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশত এখানে এলাম।' মানববাবু এবার খেয়াল করলেন লোকটার মস্তক মুণ্ডিত হলেও তার মাথার পিছনে একটা শিখা বা টিকি আছে। আর তাতে একটা ফুল বাঁধা আছে। ফুল বাঁধা শিখার প্রান্তদেশ লোকটার কাঁধের এক পাশে ঝুলছে। লোকটা এরপর তার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্যই তার উড়নিটা বুকের কাছ থেকে একটু সরালো। মানববাবু দেখতে পেলেন তার বুকে একটা উপবীত বা পৈতাও আছে।

অনেক সময় স্থানীয় লোকজনের মুখ থেকেও এসব জায়গার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা আভাস মেলে। কারণ, অনেক সময় লোককথা বা উপকথার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে স্থানীয় মানুষের কাছে রয়ে যায় ফেলে আসা ইতিহাসের কিছু সত্য। অনেক সময় এমনও হয় যে স্থানীয় মানুষের মুখে প্রচলিত গল্প কাহিনির ক্ষীণ সূত্র ধরে ইতিহাস গবেষকরা পৌঁছে যান হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের দোরগোড়াতে। উন্মোচিত হয় সে জায়গার ইতিহাস। বাংলার অন্যতম প্রাচীন স্থাপত্য স্থল চন্দ্রকেতুগড়ের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল। লোকটাকে দেখে আর যাই হোক চোর-ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না মানববাবুর। ভদ্রসন্তান বলেই মনে হচ্ছে। লোকটার কাছ থেকে যদি এ জায়গার সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন গল্পকাহিনি জানা যায়, সেজন্য মানববাবু তার উদ্দেশে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ারে এসে বসুন। আপনি স্থানীয় মানুষ, একটু গল্প করি আপনার সঙ্গে।'

লোকটা যেন প্রসন্ন হল তার কথায়। আবছা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। লোকটার পায়ে কোনও চটি জুতো নেই। লোকটা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। তারপর টেবিলের অন্য পাশে মানববাবুর মুখোমুখি বসল। মানববাবু এবার কাছ থেকে লোকটাকে ভালো করে দেখলেন। তার গাত্রবর্ণ গৌরব। একটু বিষণ্ণতা জেগে থাকলেও দাড়িগোঁফহীন মুখমণ্ডলে তার টিকালো নাকটা বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মণের চোখদুটোও বেশ উজ্জ্বল। চেয়ারে বসার পর লোকটা একটু ইতস্তত করে মানববাবুকে প্রশ্ন করল, 'আপনার পরিচয়টা?'

মানববাবু বললেন, 'আমার নাম মানব চক্রবর্তী।'

নাম বলার পর মানববাবু তার বাকি পরিচয়টা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নামটা শোনা মাত্রই মার্তণ্ড নামের সেই ব্রাহ্মণ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মানব! কর্ণসুবর্ণ অধিপতি শশাঙ্কদেবের পুত্র মানবদেব? রাজচক্রবর্তী মানব?'

boierpathshala.blogspot.com

মানববাবু মনে মনে ভাবলেন, লোকটার বেশ রসবোধ আছে তো! এক সময় এই কর্ণসুবর্ণর প্রথম বাঙালি অধিপতি ছিলেন শশাঙ্ক। সম্রাট শশাঙ্ক। আর তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন তার পুত্র মানবদেব। এ লোকটার তবে সে যুগের ইতিহাস সম্পর্কেও কিছুটা জানা আছে।

মার্তণ্ডর কথায় মানববাবু হেসে বললেন, 'না, আমি সম্রাট শশাঙ্কের পুত্র মানবদেব নই। আর রাজচক্রবর্তীও নই। চক্রবর্তীটা আমার উপাধি নয় পদবি। দাঁড়ালেন কেন? বসুন।'

মার্তণ্ড বললেন, 'আমি আপনার নাম শুনে ভাবলাম, আপনি রাজা মানব। রাজার সামনে তো বসা উচিত নয়, তাই উঠে দাঁড়ালাম।' কথাগুলো বলে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি।

মানববাবু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ মজা করে কথা বলতে পারেন তো আপনি! আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। এই প্রাচীন জায়গাতে যে খনন কার্য চলছে তা আমার নেতৃত্বেই চলছে।'

মার্তণ্ডর এবার চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা ঘট আর ছড়ানো কড়িগুলোর ওপর। কড়িগুলো দেখেই তার চোখ দুটো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃদু বিস্মিত ভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এ কড়িগুলো আপনি কোথায় পেলেন?'

মানব জবাব দিলেন, 'এখানে আজ সকালে একটা দেওয়ালের গা থেকে দুটো ইট খসে পড়তেই একটা ছোট কুলুঙ্গির মতো জায়গা বেরিয়ে পড়ল। তার ভিতর এই ঘটটা রাখা ছিল আর ঘটের মধ্যে কড়িগুলো। আপনি জানেন হয়তো যে এক সময় ওই প্রাচীন বঙ্গদেশে মানুষ কড়ি ব্যবহার করত পয়সা হিসাবে, আর মেয়েরা কড়ির মালাও পরত। এই কড়িগুলোর পিঠে ছিদ্র আছে। তা দেখে আমার মনে হচ্ছে এ কড়িগুলো দিয়ে মালা গাঁথা ছিল।'

কড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ প্রথমে বললেন, 'হ্যাঁ, এই কড়িগুলো এক সময় মালাদেভিপ থেকে এই কর্ণসুবর্ণে আসত...।'

গ্রাম্য ব্রাহ্মণের মুখে 'মালাদেভিপ' শব্দটা শুনে মানব একটু অবাকই হয়ে গেলেন। সংস্কৃত পুঁথিতে মালদ্বীপকে 'মালাদেভিপ' নামেই উল্লেখ করা হত প্রাচীন কালে। তার মানে এ লোকটার পড়াশোনা আছে সে যুগ সম্বন্ধে। লোকটাকে মানব যত সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন সে তত সাধারণ নয়। মানব তার উদ্দেশে প্রশংসাসূচকভাবে বললেন, 'বাঃ, আপনি অনেক কিছু জানেন দেখছি! আপনি কি এসব নিয়ে লেখা পড়া করেন?'

মার্তণ্ড বললেন, 'হ্যাঁ জানি। এই কড়িগুলোর সম্বন্ধেও জানি। এ কড়িগুলো মালায় গাঁথা ছিল না। এ কড়িগুলো হল ফুটো কড়ি বা কানা কড়ি।'

মানব বললেন, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, এগুলো হল অচল কড়ি। পয়সা হিসাবে যার কোনও দাম ছিল না।'

ব্রাহ্মণ সম্মতিসূচক মথা নেড়ে বললেন, 'পয়সা হিসাবে অচল হলেও এই কড়িগুলো কিন্তু ভিক্ষুককে রাজন, আর রাজনকে ভিক্ষুক বানিয়ে দিতে পারত।'

মানব জানতে চাইলেন, 'তার মানে?'

মার্তণ্ড উত্তর দিলেন, 'এই কানা কড়ি দিয়ে জুয়া খেলা হত। কর্ণসুবর্ণর কানা কড়ি। এ কড়ি যে কত মানুষের সর্বস্ব লুটে নিয়েছে, আবার কোনো মানুষকে জালা ভরা স্বর্ণমুদ্রা পাইয়ে দিয়েছে তার হিসাব নেই।'

boierpathshala.blogspot.com

মানব বললেন, 'সে যুগে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল জানি, কিন্তু এই কানা কড়িগুলো দিয়ে যে জুয়া খেলা হত তা জানতাম না।'

মার্তণ্ড বললেন, 'হ্যাঁ, হত। আর এ জায়গাতেই ছিল কর্ণসুবর্ণর সবচেয়ে বড় কড়ি-জুয়ার আড্ডা। শ্বেততারার প্রাসাদ। জুয়ার আড্ডা, আর তার সঙ্গে গণিকালয়।'

কথাটা শুনে মানববাবু বেশ বিস্মিতভাবে বললেন, 'এ গল্প আপনি জানলেন কীভাবে? শ্বেততারা কে?'

মার্তণ্ড বললেন, 'তার সঠিক পরিচয় জানা যায় না। অসীম রূপবতী এক কন্যা। কেউ বলে সে ব্রাহ্মণ কন্যা, নইলে এত গৌরবর্ণ সে হত না। আবার কেউ বলে সে নাকি আসলে ছিল বৌদ্ধ। শ্বেততারা নাম সে সময় বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শ্বেততারার শৈশবে তার পিতা-মাতাকে নাকি রাজা শশাঙ্ক হত্যা করেছিলেন। আবার তার ক্ষীণ কটিদেশ, শঙ্খের মতো স্তন, আর মৃগনয়ন দেখে কেউ কেউ বলত সে আসলে ছিল সেই কড়ির দেশের মেয়ে, অর্থাৎ মালদেভিপের মেয়ে। তার পরিচয় যাই হোক না কেন, সে ঠিক এ জায়গাতে একটা তালপাতার কুটির বানিয়ে প্রথমে একটা জুয়ার আসর খুলে বসেছিল। যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল ইষ্টক নির্মিত প্রাসাদে। সেদিনের ঘটনা আমি জানি।'

মানববাবু বললেন, 'বাঃ বেশ ভালো গল্প তো! বলে যান।'

মার্তণ্ড বললেন, 'না, না, এ গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। আচ্ছা, আপনাকে আমি একটা জিনিস দেখাব। তাহলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন আপনি। কড়িগুলোকে ঘটের মধ্যে নিয়ে একটু বাইরে চলুন।'

লোকটা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেও তাকে খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে না। স্থানীয় মানুষ এ লোকটা। হয়তো সত্যি তার কিছু দেখানোর থাকতে পারে। এ কথা ভেবে তার কথামতো কড়িগুলোকে ঘটের মধ্যে ভরে ঘটটা নিয়ে লোকটার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন মানববাবু।

বাইরে চাঁদ উঠেছে। আধফালি চাঁদ হলেও ধুলো ধোঁয়াহীন আকাশ বলে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে মাটির গভীর থেকে জেগে ওঠা চারপাশে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন ইটের কাঠামোগুলোর ওপর। অতীতের ওপর যেন আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। বলছে 'জেগে ওঠো, জেগে ওঠো'। চারপাশে তাকিয়ে বেশ ভালো লাগল মানববাবুর। তার মনের ভাষা যেন পড়তে পারল লোকটা। তিনি বললেন, 'পূর্ণিমা না হলেও আলোটা বেশ সুন্দর। জানেন, এক সময় সারা রাত প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত এ প্রাসাদ। সারা রাত ধরে কত মানুষের আনাগোনা হত এখানে। ওই যে আপনার ডান পাশে যে সমতল জায়গাটা দেখছেন, ওখানে অতিথিদের অশ্ব বাঁধা থাকত, আর তারও কিছুটা তফাতে যে অনুচ্চ প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন তার গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত জুয়াড়ি খদ্দেরদের আশায় রূপজীবীদের দল। কড়ির জুয়ায় জিতে মুদ্রার থলি নিয়ে কেউ বাইরে বেরোলেই মধুমক্ষিকার মতো ছেঁকে ধরত ওই বারবণিতার দল। ভাঁড়ের দলও এখানে আসত রঙ্গ তামাশা দেখাবার জন্য। বেতের ঝুড়ি নিয়ে পিষ্টক বিক্রেতা আর পিঠে চামড়ার থলেতে মদ্য নিয়ে প্রাসাদের বাইরে ঘুরে বেড়াত ভ্রাম্যমান মদ্য বিক্রেতা। তাছাড়া আসত জুয়াড়িদের পাওনাদারের দলও। তাদের ফাঁকি দেবার জন্য জুয়াড়িরা অনেক সময় আপনার পশ্চিম দিকে ওই যে খিড়কির দরজা—ওখান দিয়ে পালাত। ওদিক

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে নদীর দিকে যাবার রাস্তা ছিল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেরে যাওয়া সেই সব জুয়াড়িরা পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য নৌকা নিয়ে কর্ণসুবর্ণ ত্যাগ করত...।'

মানববাবুকে নিয়ে সেই প্রাচীন ইতিহাসের চিহ্নগুলোর মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে লোকটা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে যেন তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন সে সব দিন।

৩

লোকটা এসে থামল চারপাশে ছড়ানো এই প্রাচীন স্থাপত্যের ঠিক মাঝখানে একটা ইট বিছানো জায়গাতে। দৈর্ঘ্য প্রস্থে হাত কুড়ি মতো হবে জায়গাটা। তার চারপাশে খনন কার্যের ফলে দেওয়ালের ক্ষীণ চিহ্ন জেগে আছে। সম্ভবত এ জায়গাতে কোনও একটা ঘর ছিল। মানববাবুর অনুমান সত্য করে মার্তণ্ড বললেন, 'ঠিক এ জায়গাতেই বসে কড়ির জুয়া খেলত শ্বেততারা। প্রাসাদের নানা ঘরেই জুয়ার আড্ডা বসত, কিন্তু শ্বেততারা জুয়া খেলত এ কক্ষে বসেই। সাধারণ মানুষরা অবশ্য এ কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পেত না। সে সামর্থও তাদের ছিল না। কারণ, শ্বেততারার সঙ্গে প্রতিবার খেলার জন্য একশো স্বর্ণমুদ্রা বাজি রাখতে হত। একমাত্র রাজপুরুষ, অভিজাত বণিক আর ধনী ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই এ কক্ষে বসে জুয়া খেলত শ্বেততারা।'

কথাগুলো বলে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়লেন মার্তণ্ড। তারপর সেই ইট বিছানো মেঝের ওপর হাত ঘষে ঘষে ধুলো সরাতে লাগলেন। তিনি ব্যাপারটা কী করতে চাইছেন তা বোঝার জন্য মানববাবুও ঝুঁকে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ধুলোর আস্তরণের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল মেঝের গায়ে খোদিত একটা ছক। সেই ছকটা দেখতে অনেকটা বাঘবন্দি খেলার ছকের মতো। কিছুটা স্পষ্ট হলেও ছকটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। ছকটার মধ্যে সমান্তরাল খোপ আছে, সেগুলো আবার কোনাকুনি ভাবে বিভক্ত। হাজার বছরের সেই প্রাচীন জুয়ার ছকটা দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলেন মানববাবু। লোকটা এ ছকের কথা জানল কীভাবে? আর এরপরই মানববাবুর খেয়াল হল, বছর দশেক আগে খনন কার্য শুরু হবার পর প্রথম উন্মোচিত হয়েছিল এই জায়গাটাই। তারপর মাঝের দশবছর অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল এ জায়গা। কোনও সময় এসে হয়তো সন্ধান পেয়েছিল এই ছকের আর এটা দেখেই এখন সে মানববাবুকে চমক দেবার চেষ্টা করছে। জুয়ার আড্ডা সম্বন্ধে গল্প ফাঁদছে। তবে এই ছকের ব্যাপারটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে এই প্রত্নস্থলে ওই ছকটা ছাড়া মানববাবু অন্য কোনও চিহ্ন বা ছবি খুঁজে পাননি। লোকটার মাধ্যমে এটার খোঁজ পেলেন তিনি। হয়তো এর সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে এ জায়গার আসল পরিচয় জানা যাবে। তবে আপাতত লোকটার কথাতে বিশ্বাস দেখানো ভালো। লোকটা হয়তো তাকে আরও এমন কিছুর সন্ধান দিতে পারে। এ সব ভেবে নিয়ে মানববাবু লোকটা এরপর কী বলে বা কী করে তার প্রত্যাশায় রইলেন।

মার্তণ্ড ধুলো ঝেড়ে ছকটা ভালো করে পরিষ্কার করে বললেন, 'কড়িগুলো আমাকে দিন। খেলাটা আপনাকে বোঝাই।'

মানববাবু ঘটটা তার হাতে দোবার পর মার্তণ্ড কড়িগুলোকে বার করে প্রথমে মাটিতে রাখলেন। তারপর কড়িগুলো সাদা আর কালোতে ভাগ করে আটটা করে কড়ি ছকটার

boierpathshala.blogspot.com

দু-পাসে সাজিয়ে মানববাবুকে বললেন, 'নিন ভালো করে বসুন। খেলাটা প্রথমে আপনাকে একবার ভালো করে বুঝিয়ে দিই তারপর এক হাত খেলাও যেতে পারে।'

মানববাবু লোকটার কথায় আপত্তি করলেন না। খেলুড়েদের মতোই কালের গর্ভ থেকে জেগে ওঠা সেই প্রাচীন ছকের দু-পাশে বাবু হয়ে তারা দুজন বসলেন ঠিক বহু শতাব্দী আগে এই ছকের দু-পাশে বসা মানুষদেরই মতো।

মানববাবুকে প্রথমে খেলাটা বুঝিয়ে দিলেন মার্তণ্ড। খেলাটা সরল, অনেকটা বাঘবন্দি খেলার মতোই। কোনাকুনি টপকে অপরের কড়ি গিলতে হয়। শেষ পর্যন্ত যে অপর পক্ষের কড়ি খেয়ে ফেলতে পারে তার জিত হয়।

খেলাটা বুঝে নেবার পর মানববাবু বললেন, 'আপনি তো বলছেন এ জায়গা ওই সুন্দরী নারী শ্বেততারার জুয়ার আড্ডা ছিল। এই ছকটাতে কড়ির জুয়া খেলত শ্বেততারা। এ জায়গা সম্বন্ধে আপনি আর কী জানেন?'

লোকটা বললেন, 'অনেক কিছু জানি। আসুননা এক হাত খেলতে খেলতে সে গল্প আপনাকে করি।'

মানববাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা খেলা যেতেই পারে। আপনার কথা শুনতে চাই আমি। বেশ লাগছে কিন্তু।'

মার্তণ্ড বললেন, 'কী বাজি রেখে খেলবেন বলুন। বাজি ছাড়া তো খেলা যাবে না। এ ছক শ্বেততারার জুয়ার ছক বলে কথা।'

মানববাবু এবার কিন্তু লোকটার কথা শুনে থমকে গেলেন। তিনি কোনও দিন কারো সঙ্গে বাজি ধরেন না। জুয়া খেলার তো কোনো প্রশ্নই নেই। বাজি ধরে মানববাবুর কাছ থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেবার মতলব নেই তো লোকটার। এ কথা ভেবে লোকটার দিকে মৃদু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন মানববাবু।

লোকটা মনে হয় তার মনের ভাব পাঠ করতে পারলেন। তিনি বললেন, 'না, না বেশি টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। একটা মাত্র মুদ্রা, অর্থাৎ একটা টাকা বাজি ধরে খেলব আমরা। হাজার হোক এক সময় এটা শ্বেততারার জুয়ার আড্ডা ছিল। এই কড়ি আর এই ছকে জুয়া খেলা হত একদিন। বাজি ধরে খেললে এ জায়গার স্থান মাহাত্ম্য উপভোগ করতে পারবেন।'

লোকটা অবশ্য এ কথাটা মিথ্যে বলেনি। রেসের মাঠে যারা জীবনে এক দিনের জন্য রেস দেখতে যায়, অথবা নেপালে বেড়াতে গিয়ে ক্যাসিনো দেখতে যায়, তারা সেখানে গিয়ে জুয়াড়ি না হয়েও অল্প পয়সা বাজি ধরে সে জায়গার উত্তেজনা, স্থান মাহাত্ম্য উপভোগ করার জন্য।'

মার্তণ্ডর কথা শুনে মানববাবু বললেন, 'ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন এখন বাজি ধরেই খেলব। তবে ওই একটা টাকাই কিন্তু, তার বেশি নয়।'—এ কথা বলে পকেট থেকে হাতড়ে তিনি একটা কাঁচা টাকা অর্থাৎ একটা কয়েন বার করে ছকের পাশে রাখলেন।

মার্তণ্ডও এরপর তার কোমরের ভাঁজ থেকে একটা কাঁচা টাকা বার করে ছকের অন্য পাশে রাখলেন।

কিন্তু মার্তণ্ডর রাখা কয়েনটার আকৃতি বাজারে প্রচলিত এক টাকার কয়েনের থেকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হল মানববাবুর। একটু ইতস্তত করে মুদ্রাটা তিনি হাতে তুলে

boierpathshala.blogspot.com

নিতেই বুঝতে পারলেন তার অনুমান সঠিক। লোকটার মুদ্রাটা নকল নাকি। কিন্তু চাঁদের আলোতে মুদ্রাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। মুদ্রার একপাশে ফুল পাতার অলঙ্করণ আর অন্যপাশে খোদিত আছে ষণ্ড বা ষাঁড়ের ছবি। এই প্রাচীন মুদ্রা মানববাবু মিউজিয়ামে দেখেছেন!

ভালো করে মুদ্রাটা দেখার পর বিস্মিত মানববাবু প্রশ্ন করলেন, 'এ মুদ্রা আপনি কোথায় পেলেন? এ যে ষণ্ড প্রতীক খোদিত সম্রাট শশাঙ্কের মুদ্রা! স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা না হলেও টাকার হিসাবে ওর দাম নির্ধারণ করা যাবে না। অমূল্য ঐতিহাসিক জিনিস!'

মার্তণ্ড হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এটা রাজাধিরাজ শশাঙ্কের মুদ্রা। এখান থেকেই পাওয়া।'

মানববাবু বলে উঠলেন, 'তার মানে এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই মুদ্রাটা পেয়েছেন আপনি? তার মানে এ জায়গা যে শশাঙ্কের আমলের বা তার পরবর্তীকালে শশাঙ্কের কাছাকাছি সময়ের সে ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহই রইল না।'

মার্তণ্ড বললেন, 'খেলায় যদি আপনি জিতে যান তবে এই মুদ্রাটা আপনারই হবে। নিন, এবার খেলা শুরু করা যাক। খেলতে খেলতে কথা বলি।'

মানববাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবার সত্যি বিস্মিত বোধ করছি আমি। খেলতে খেলতে এ জায়গা সম্বন্ধে যে সব গল্প জানেন তা বলুন। আচ্ছা, এ খেলার চাল দেবার জন্য কি নির্দিষ্ট সময় আছে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'তা নেই। তবে রাতের মধ্যে খেলা শেষ করতে হবে। যার দিকে সাদা কড়ি থাকে সে প্রথম চাল দেয়। আর তারপর যার হাতে কালো কড়ি থাকে সে প্রথমবার পর পর দুবার চাল দেবার সুযোগ পায়। আপনার কাছে সাদা কড়ি। আপনিই চাল দিন প্রথমে।'

মানববাবু প্রথম চাল দিলেন, 'খেলা শুরু হয়ে গেল।'

নিয়মমতো মার্তণ্ডও ধীরে সুস্থে দুটো কড়ি এগিয়ে দিলেন।

মানববাবু এরপর কী চাল দেবেন ভাবতে ভাবতে মার্তণ্ডকে বললেন, 'নিন, শুরু করুন আপনার কথা—'

মার্তণ্ড বলল, 'হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান। আপনার কাছে আগুন আছে? আমার আবার তামাকের নেশা।'

তার কথা শুনে পকেট থেকে দেশলাই বার করলেন মানব। লোকটাও তার ট্যাঁক হাতড়ে কয়েকটা লম্বা কাঠির মতো জিনিস বার করলেন। দেখতে সেগুলো বিড়ির মতো হলেও আকারে বেশ লম্বা। সেগুলোর একটা মানববাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মার্তণ্ড বলল, 'আপনার একটা চলবে নাকি? তামাক কাঠি। খেয়ে দেখুন বেশ লাগবে।'

মানববাবু ধূমপান করলেও, বিড়ি খান না। তবে লোকটা সেটা দিচ্ছে দেখেই ভদ্রতাবশত তিনি সেটা হাতে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠোঁটে দিলেন। মার্তণ্ডও একটা তামাক কাঠি মুখে গুঁজল। তারপর দেশলাই দিয়ে প্রথমে নিজেরটা জ্বালিয়ে সেটা মানববাবুর মুখে ধরল। আগুনটা ধরার পর মানববাবু দুটো টান দিতেই তার মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল। ঠোঁট থেকে তামাক কাঠিটা নামিয়ে মানববাবু বললেন, 'বেশ কড়া তামাক তো।'

boierpathshala.blogspot.com

মার্তণ্ডও তামাক কাঠিতে বেশ লম্বা দুটো টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। কেমন যেন নীলচে ধোঁয়া।' ছকের দিকে তাকিয়ে মার্তণ্ড শুরু করল তার কথা—

৪

'হ্যাঁ, আমরা তবে সে সময়ে ফিরে যাই। বাঙালির গৌরব কর্ণসুবর্ণর গৌরব তখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে বলা চলে। রাজাধিরাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মানব কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে বসে নিহত হলেন। আর তার মৃত্যুর সঙ্গে অন্ধকার নামল বঙ্গদেশে। মালবরাজের পর বেশ কয়েকজন রাজা এলে গেল কিন্তু কেউই ধরে রাখতে পারল না এ রাজ্যকে। উত্থান হল ছোট ছোট গোষ্ঠীপতির। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে 'রাজা' ঘোষণা করে টুকরো টুকরো করে ফেলল এ দেশটাকে। যে ভূখণ্ডের ওপর যে নরপতির অধিকার সেখানেই সে অত্যাচার নামিয়ে আনল। আইনের শাসন মানে তখন শুধু ধনীর শাসন, তাদের অত্যাচারে গরিবের প্রাণের মূল্য কানাকড়ি। রোজ কত মানুষের যে প্রাণ যেত আর কত স্ত্রীলোক যে ধর্ষিতা হত তার কোনও হিসাব ছিল না। আর বিচারের তো কোনও প্রশ্নই নেই। শাসক, ধনাঢ্য, ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ভয়ে ফাঁকা হতে লাগল কর্ণসুবর্ণর সাধারণ পল্লীগুলো। শৃগাল, কুকুর, সর্পের আস্তানায় পরিণত হতে লাগল সেসব ধীরে ধীরে।

নগরীর বাইরে আশেপাশে যেসব গ্রাম ছিল, যেখানে ধানের গোলাতে গোধূলি বেলায় শঙ্খধ্বনি শোনা যেত, সেখানে দিনমানেও শোনা যেতে লাগল শৃগালের চিৎকার। সোনার ধানের ক্ষেতগুলো ঘন জঙ্গলে ভরে গেল। এক অদ্ভুত আঁধার নেমে এল এ বাংলাতে। লোকে বলে 'মাৎসন্যায়'।

কাহিনির ভূমিকা বলে মৃদু হেসে তামাক কাঠিতে টান দিল মার্তণ্ড।

মানববাবু একটা চাল দিয়ে তামাক কাঠিতে আবার একটা টান দিলেন। এবার আর তার মাথা ঝিমঝিম করল না। বরং যেন এক অদ্ভুত আবেশ লাগল তার।

মার্তণ্ড আবার শুরু করল, 'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। অনেকেই এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেও সবাই তো আর পালিয়ে যেতে পারে না। তাই বহু মানুষ এখানেও রয়ে গিয়েছিল। যখন কোনও রাজ্যে অন্ধকার নেমে আসে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে মাথা চাড়া দেয় মানুষের মনের অন্ধকার প্রবৃত্তিগুলো। কারণ মানুষ তখন আর মানুষ থাকে না। হয়তো বা পরিস্থিতিই তখন মানুষকে এমন করে তোলে। এই কর্ণসুবর্ণে যত অন্ধকার নামতে শুরু করল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল জুয়ার আড্ডা আর বেশ্যালয়ের রমরমা। মানুষ সহজেই ধনী হতে চায়, আর ধনী হলেই তো সব কিছু তার হাতের মুঠোতে। ক্ষমতা, নারী সবকিছুই। আর সে জন্যই দিনে দিনে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল শ্বেততারার জুয়ার আড্ডার আলো। সাধারণ ভিক্ষু থেকে শুরু করে, অভিজাত মানুষ তাদের ভাগ্য ফেরাবার জন্য অথবা আরও ধনাঢ্য হবার জন্য আসা-যাওয়া করত এই জুয়ার আড্ডাতে। এমনকী ভিনদেশী বণিকরাও ভাগীরথীর বুক বেয়ে ময়ূরপঙ্খীতে উপস্থিত হত এখানে।

আগেই আপনাকে বলেছি শ্বেততারা কোথা থেকে এখানে এসেছিল, কেন এখানে এসেছিল, তার বংশপরিচয় কী ছিল তা কেউ জানে না। তাকে এসব ব্যাপারে কেউ জিগ্যেস করলে সে শুধু সেই উৎসুক মানুষটাকে হেসে বলত, 'আমার নাম শ্বেততারা।

boierpathshala.blogspot.com

কড়ির জুয়া খেলি। ভিক্ষুককে রাজা বানাই, রাজাকে ভিক্ষুক। আমার এই পরিচয় যথেষ্ট নয় কি?'

জুয়ার আড্ডায় যারা আসে তাদের মনোরঞ্জন করার জন্য এই বাটিকা সংলগ্ন অঞ্চলে শ্বেততারা একটা গণিকালয় স্থাপন করলেও শ্বেততারা নিজে কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি করত না। এই ছকে বসে কড়ির জুয়া খেললেও সে তার শরীর স্পর্শ করতে দিত না কাউকে। মাথার ওপর ঝুলন্ত প্রদীপের আলোতে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ছকে চাল দেবার সময় অনেক সময়ই সামনে বসে থাকা খেলুড়ের চোখের সামনে প্রস্ফুটিত হত শ্বেততারার গভীর বক্ষবিভাজিকা। তা হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চিত ভাবেই প্রলুব্ধ করত, কামের উদ্রেক ঘটাত খেলুড়ের মনে। কিন্তু ব্যাস এ পর্যন্তই। কিন্তু শ্বেততারাকে স্পর্শ করার অধিকার তার ছিল না। বরং ওই শ্বেতশুভ্র বক্ষবিভাজিকার দিকে তাকিয়ে কোনও সময় ভুল চাল দিয়ে হেরে বসে থাকত সেই মূর্খ জুয়াড়ি। কেউ কেউ অবশ্য বলত যে এটাও নাকি শ্বেততারার একটা চাল ছিল বিপক্ষকে তার মনোসংযোগ নষ্ট করানোর জন্য। যে কারণে এই জুয়ার ছকে বসার সময় উড়নি দিয়ে বক্ষ বিভাজিকা আড়াল করার চেষ্টা করত না সে। তবে যে যাই বলুক শ্বেততারাকে কড়ির জুয়াতে কেউ কোনওদিন হারাতে পারত না। এভাবেই সময় এগিয়ে চলছিল।

রোজ দ্বিপ্রহরে ভাগীরথীতে শিবিকা চেপে স্নানে যেত শ্বেততারা। ভাগীরথী তখন এ বাটিকার খুব কাছেই ছিল। ওই যে পশ্চিম দিকে কিছুটা এগোলেই ছিল নদী। স্নানের সময় শ্বেততারা কিন্তু পালকি বা শিবিকা থেকে নামত না। বেহারার দল জলে নেমে শ্বেততারা সমেত পালকি জলে চুবিয়ে আবার উঠিয়ে আনত। একদিন হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। ভরা আষাঢ়ে নদী ফুঁসছে কদিন ধরে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। প্রতিদিনের মতোই চারজন বেহারা এ প্রাসাদ থকে দুপুরবেলা শ্বেততারার শিবিকা নিয়ে রওনা হল নদীর দিকে। নদীর পাড়ে যখন তারা উপস্থিত হল তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। শিবিকাটাকে কয়েক বার জলে চুবিয়েই রোজকার মতো উঠে আসবে বেহারারা। তারা পাল্কিসমেত জলে নামল। ঠিক সেই সময় ঘটনা বা দুর্ঘটনাটা ঘটল।

প্রচণ্ড জলস্রোতের ধাক্কাতে অথবা জলের নীচের কাদামাটিতে হড়কে গেল কোমর সমান জলে নামা বেহারাদের পা। জলে ছিটকে পড়ল কাঠের পালকি তারপর তীব্র জলস্রোতে সেই পালকি শ্বেততারাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল নদীবক্ষে। কিছুটা দূরেই একটা ঘূর্ণি আছে। পালকিটা ছুটে চলল সেদিকেই। আর সে ঘূর্ণিতে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যাবে পালকি।

নদীর তখন উন্মাদিনী রূপ। শ্বেততারা সাঁতার জানত না। যে কারণে সে পালকি সমেত স্নান করত। পালকির ভিতর থেকে আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল শ্বেততারা। পালকি বেহারারা তখন নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত। আর ওই পালকি ধরার জন্য সাঁতার দেওয়া মানে তো নির্ঘাত মৃত্যু। যে ওর পিছু ধাওয়া করবে তাকেও টেনে নেবে ঘূর্ণি। শ্বেততারার পালকি তখন ঘূর্ণির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। শ্বেততারার চোখের সামনে স্পষ্ট ঘূর্ণিটা। পাক খেতে খেতে পাটকিলে রঙের জল সেখানে পাতালে নেমে যাচ্ছে।

পালকি সমেত শ্বেততারাও হয়তো পাতালে নেমে যেত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শ্বেততারার পালকির সামনে ঘোলা জলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা মাথা আর একটা হাত। সেই হাতটা হ্যাঁচকা টানে শ্বেততারাকে পালকির ভিতর থেকে টেনে বার করে আনল। আর এর পরমুহূর্তেই শূন্য পালকিটা ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ল। বারকয়েক পাক খয়ে চোখের নিমেষে পালকিটা হারিয়ে গেল নদী গর্ভে পাতালের দিকে। আর সেই

boierpathshala.blogspot.com

হাতটা প্রবল জলস্রোতের মধ্যে দিয়েও শ্বেততারাকে নিয়ে চলল পাড়ের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে পাড়ে উঠে এল শ্বেততারা। পাড়ে সে উঠল ঠিকই তবে তখন তার সংজ্ঞাহীন অবস্থা।

নিশ্চিত মৃত্যুকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কে উত্তেজনাতে হাতটা ধরে তাকে টানার মুহূর্তেই সে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। যে লোকটা তাকে উদ্ধার করেছিল সে শ্বেততারাকে পাড়ে উঠিয়েই বুঝতে পারল শ্বেততারা জ্ঞান হারিয়েছে। ভালো করে সে তাকাল শ্বেততারার দিকে। জলে ভেজা শ্বেততারার শরীর। উদ্ধারকর্তার চোখের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে সিক্ত-সংজ্ঞাহীন শ্বেততারার যৌবন। সিক্ত কাঁচুলির ভিতর থেকে প্রকাশিত তার বৃন্ত যুগল, বসন সরে গেছে শ্বেততারার কোমর থেকে। আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির জল যেন শুষে নিচ্ছে শ্বেততারার গভীর নাভিকূপ, কদলীবৃক্ষের মতো শ্বেততারার উরুদুটো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। শ্বেততারার সিক্ত যৌবনের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন হতবাক হয়ে গেল লোকটা। এত সৌন্দর্য ওই শরীরে! কিন্তু এরপরই লোকটা নিজেকে সংযত করে ফেলল। শ্বেততারার উদরের দিতে তাকিয়ে সেটা কিছুটা স্ফিত মনে হল লোকটার।

নদীতে পড়ে কিছুটা জল খেয়েছে শ্বেততারা। একটু ইতস্তত করে লোকটা শ্বেততারার জ্ঞান ফেরাবার জন্য তার বুকে পিঠে চাপ দিতে শুরু করল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই একরাশ জল বমন করে শ্বেততারা উঠে বসল। তার সামনে বসে আছে অপরিচিত একজন লোক। শ্বেততারার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল নিজের ভাবনা-চিন্তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে। তারপর সে দ্রুত তার সিক্ত স্খলিত বসন যথাসম্ভব ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল সেই লোকটাও। তার কোমর সিক্ত শুভ্র বস্ত্রখণ্ড দিয়ে আচ্ছাদিত। গলায় উপবীত আছে তা দেখে শ্বেততারা অনুমান করল লোকটা ব্রাহ্মণ। শ্বেততারা তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমি কাশ্যপ। ব্রাহ্মণ। অনেক দূর থেকে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। নদীতে অবগাহন করতে নেমেছিলাম। দেখলাম পালকিটা ঘূর্ণির দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর তাই...'

শ্বেততারা জানতে চাইল, 'দূর দেশ মানে কোন দেশ?'

'কামরূপের সীমানাতে রূপনগর নামে ছোট্ট এক জনপদ থেকে। নরেন্দ্রদেব শশাঙ্কের রাজত্বে ওই গ্রামই ছিল বঙ্গদেশের শেষ সীমানা।' জবাব দিল কাশ্যপ।

'তুমি যে ওই ঘূর্ণিস্রোতে ঝাঁপ দিলে তাতে তোমার ভয় করল না?' প্রশ্ন করল শ্বেততারা।

কাশ্যপ হেসে বলল, 'পথে নেমে বুঝতে পেরেছি আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে মৃত্যু সব সময় অনুসরণ করে চলেছে। অরণ্য পথে ব্যাঘ্র বা সর্প রূপে, গলি পথে তস্কর, দস্যু রূপে আর রাজপথে রাজা বা ভূস্বামীর সেনা রূপে। যে কোন সময় নানা রূপে মৃত্যু এসে হানা দিতে পারে। পদব্রজে আসার সময় আমি বেশ কয়েকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। তাই আর কোনও কিছু না ভেবেই এগিয়ে গিয়েছিলাম ঘূর্ণির দিকে।'

শ্বেততারা কাশ্যপের কথা শুনে বলল, 'এবার তোমার গন্তব্য কোথায়?'

কাশ্যপ বলল, 'এই অপরিচিত জায়গাতে আমার বর্তমানে একটা আশ্রয় দরকার। যেখানে বিনা পয়সাতে থাকা যাবে ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে। বর্তমানে আমি কপর্দকহীন। সামান্য সে ক'টা কড়ি আমার কাছে ছিল, এমনকী আমার প্রাচীন বস্ত্র সমেত পুটুলিটা

boierpathshala.blogspot.com

পর্যন্ত গত রাতে কেড়ে নিল একদল লোক! এখানে যে এত অরাজক পরিস্থিতি তা আমার জানা ছিল না!'

কাশ্যপের কথা শুনে শ্বেততারা বুঝতে পারল যে তার উদ্ধারকর্তা এই অচেনা পরিবেশে যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছে। কাশ্যপ তার প্রাণরক্ষাকারী। তাই একটু ভেবে নিয়ে শ্বেততারা ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে বলল, 'আমার নাম শ্বেততারা। আমার এখানে একটা প্রাসাদোপম বাটিকা আছে। সেখানে একটা জুয়াখানা চালাই আমি। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমার বাটিতে গিয়ে থাকতে পারো। আহারের ব্যবস্থাও আমিই করব। যাবে?'

এই সুন্দরী রমণী জুয়ার আড্ডা চালায় শুনে বেশ অবাক হয়ে গেল কাশ্যপ। তবে কাশ্যপের তখন নিঃস্ব অবস্থা। আশ্রয় পাবার ক্ষেত্রে স্থান-কাল বিচার করলে চলবে না। রাস্তায় থাকলে হয়তো পরনের বসনটাও কেউ খুলে নিয়ে যাবে! মুহূর্ত খানেক ভেবে নিয়ে কাশ্যপ বলল, 'হ্যাঁ, আমি যাব।'

ভার্গব শ্বেততারাকে নদী থেকে তুলে যে জায়গাতে উঠিয়েছিল সে জায়গা স্নান ঘাট থেকে বেশ কিছুটা তফাতে। জায়গাটা হোগলা পাতার জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেই জঙ্গল ভেঙে শ্বেততারা কাশ্যপকে নিয়ে এগিয়ে চলল তার প্রাসাদের উদ্দেশে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে নিয়ে এই প্রাসাদে ফিরে এসেই এক অদ্ভুত দৃশ্যের সম্মুখীন হল শ্বেততারা। পালকি বেহারার দল ফিরে এসে খবর দিয়েছে যে পালকি সমেত শ্বেততারা ঘূর্ণিতে ডুবে গেছে। আর খবরটা শোনা মাত্রই তার কিছু কর্মচারীরা লুঠপাট শুরু করেছে প্রাসাদে। কেউ আসবাবপত্র টেনে বার করার চেষ্টা করছে, কেউ বা আবার অনুসন্ধান করছে কোথায় রাখা আছে শ্বেততারার হিরা-জহরত-সোনার মোহর। শ্বেততারাকে বাটিকাতে প্রবেশ করতে দেখে তারা সবাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠে এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা করতে লাগল, আবার কেউ তার পা জড়িয়ে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। লাথি মেরে তাদের হটিয়ে দিয়ে শ্বেততারা এগোল তার শয়নকক্ষের দিকে। সেখানে সিন্দুকের ভিতর বেশ কিছু অলঙ্কার ছিল তার। আসল সম্পদ অবশ্য সে লুকিয়ে রাখে অন্য এক গোপন স্থানে। তার হদিস লুণ্ঠনকারীরা পাবে না।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে শ্বেততারা দেখতে পেল তার সেই লৌহ সিন্দুকটাকে খোলার চেষ্টা করছে একজন। সে লোকটাকে শ্বেততারা সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে জুয়োর আড্ডাতে কড়ি রক্ষক আর মুদ্রা সংগ্রাহকের কাজ দিয়েছিল। লোকটার নাম কুক্কুট। আর সেই কিনা শ্বেততারার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার সিন্দুক ভাঙছে! এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারল না শ্বেততারা। একটা পিতলের ভারী প্রদীপদণ্ড রাখা ছিল কক্ষের ভিতর। সেটা সে ছুড়ে মারল কুক্কুটকে লক্ষ্য করে। সেটা আছড়ে পড়ল কুক্কুটের মাথায়। রক্তাক্ত অবস্থায় কুক্কুট কোনওরকমে সেই কক্ষ ত্যাগ করে পালালো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের সব কর্মচারীদের এক জায়গাতে সমবেত করল সে। কুক্কুটসমেত সেই পালকিবেহারারা ও আরও কিছু লোককে সেই মুহূর্তেই এ বাটিকা ও তার জুয়ার আড্ডার পরিধি থেকে বহিষ্কার করল শ্বেততারা। তারপর শ্বেততারা একজন লোককে নির্দেশ দিল ব্রাহ্মণ কাশ্যপের থাকার ব্যবস্থা করতে। এ প্রাসাদেরই এক কক্ষে স্থান হল ব্রাহ্মণ কাশ্যপের। প্রাসাদের এই আকস্মিক অব্যবস্থার জন্য সেদিন রাতে প্রাসাদে জুয়ার আড্ডা বন্ধ রইল।

তবে এ ঘটনা থেকে শ্বেততারা একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পারল যে তার একজন বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন। যদি কোনও সময় শ্বেততারার কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় তবে সে যার হাতে প্রাসাদ আর জুয়ার আড্ডার দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারবে, এমন একজন

boierpathshala.blogspot.com

লোক। কিন্তু এই অন্ধকারের রাজত্বে শ্বেততারা কোথায় খুঁজে পাবে তেমন লোক? ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তার মনে পড়ল নবাগত কাশ্যপের কথা। লোকটা তার জীবন রক্ষা করেছে। তাকে দেখে খারাপ লোক বলে মনে হয়নি শ্বেততারার। মানুষের জীবনটাই তো জুয়ার ছকের মতো। কখন তাতে কোন বাজি লাগিয়ে জিতে যায় তা কেউ বলতে পারে না। লোকটা যদি রাজি থাকে তবে তাকে দায়িত্ব দিয়ে পরখ করে দেখা যেতে পারে। এ কথা ভেবে নিয়ে শ্বেততারা পরদিন সকালে ডেকে পাঠাল কাশ্যপকে।

শ্বেততারা কাশ্যপকে প্রথমে জিগ্যেস করল, 'ব্রাহ্মণ তুমি হিসাব জান? মুদ্রা, কড়ি এসবের হিসাব?'

কাশ্যপ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, জানি। আঁক কষতেও জানি, লিখতেও জানি।'

শ্বেততারা বলল, 'শোনো ব্রাহ্মণ। আমার একজন কড়ি রক্ষক ও মুদ্রা রক্ষকের প্রয়োজন। যার কাজ হল, যে জুয়াড়িরা এখানে খেলতে আসে তাদের খেলার কড়ি বণ্টন করা এবং খেলা শেষে সেই কড়ি আর প্রাপ্য অর্থ বুঝে নেওয়া। জুয়াতে যে পরিমাণ অর্থ কেউ জেতে তার এক পঞ্চমাংশ তাকে এখানে আমাকে দিয়ে যেতে হয়। অনেক সময় জুয়াড়ি নগদ অর্থ নিয়ে এখানে খেলতে না এসে অলঙ্কার নিয়ে আসে। সেই অলঙ্কার জমা রেখে তার মূল্যের পাঁচ শতাংশ কেটে তাকে মুদ্রা মূল্য প্রদান করা হয়। এটাও একটা কাজ। সর্বোপরি এই জুয়ার আড্ডার যাবতীয় হিসাব রাখতে হবে। এ কাজ তুমি করবে? মাসিক দশ রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে বেতন দেব আমি। তোমার আহার আর আশ্রয় যে বিনামূল্যে তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া অনেক সময় যখন কোন জুয়াড়ি বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করে তখন সে খুশি হয়ে কড়ি রক্ষককে মুদ্রা প্রদান করে, সে মুদ্রা তোমারই থাকবে।'

কাশ্যপের কোনও পিছুটান ছিল না। পরিবার, বাপ-মা কেউ ছিল না। অনেক দূর দেশে ফেলে আসা গ্রামে তার একটা ভাঙা কুঁড়ে ছিল মাত্র। কাজেই সে শ্বেততারার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। কাশ্যপ বহাল হয়ে গেল কাজে। শ্বেততারাই তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিল সব কাজ। রোজ সন্ধ্যায় সে উপস্থিত জুয়াড়িদের কড়ি বন্টন করে, তাদের থেকে শ্বেততারার প্রাপ্য গ্রহণ করে, তার পরদিন দ্বিপ্রহরে শ্বেততারা যখন স্নান সেরে ফিরে আসে তখন সে আগের দিনের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেয় শ্বেততারাকে। সময় এগিয়ে চলল, বছরও এগিয়ে চলল আর তার সঙ্গে প্রত্যহ কড়ির জুয়া দেখতে দেখতে খেলাটাকেও বেশ রপ্ত করে ফেলল কাশ্যপ। কখনও কখনও সে নিজেই জুয়ার ছকে বসত এবং সে বসত অন্য জুয়ারিদের মতো শ্বেততারাকে তার ন্যায্য পাওনা দিয়েই। কোনওদিন এক পয়সা ঠকাত না শ্বেততারাকে। এই সময়ের আরও একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছিল সেই ব্রাহ্মণ কাশ্যপের মনে। সে যেন ভিতরে ভিতরে ক্রমশ অনুরক্ত হয়ে পড়ছিল শ্বেততারার প্রতি। দ্বিপ্রহরে সে যখন শ্বেততারাকে হিসাব বোঝাতে যেত ঠিক তার কিছু পূর্বেই শ্বেততারা ফিরত নদীতে অবগাহন করে। তার সিক্ত কেশের দিকে তাকালেই কাশ্যপের কেন জানি মনে পড়ে যেত সেই প্রথম দিনের কথা। নদীর পাড়ে তার সামনে পড়ে আছে সিক্ত, স্খলিত বসনা এক নারী। শ্বেততারা কি কিছু অনুমান করতে পেরেছিল কাশ্যপের ভাবনার ব্যাপারে? এ পর্যন্ত গল্প বলে থামল মার্তণ্ড। মানববাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'কি আমার কথা কেমন লাগছে?'

মার্তণ্ডর দেওয়া তামাক কাঠিটা শেষ করার পর কেমন যেন একটা ঝিম ভাব লাগছে মানববাবুর। তিনি বললেন 'বেশ লাগছে!'

boierpathshala.blogspot.com

মার্তণ্ড খুশি হয়ে হাসলেন মানববাবুর জবাবে। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কড়ির চাল দিলেন তারা। দুজনেই দুজনের কয়েকটা কড়ি খেলেন। চাঁদের আলোতে সেই প্রাচীন ইতিহাসের এক টুকরো চিহ্নের ওপর বসে মার্তণ্ড আবার শুরু করলেন তার কথা।

৫

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাশ্যপের এমন ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল কর্ণসুবর্ণর এই জুয়ার আড্ডাতে। দিন কাটছিল শ্বেততারারও। জুয়ার ব্যবসা দিন দিন আরও ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল তার। আগের কড়ি রক্ষক সেই কুক্কুট নামের লোকটা পয়সা সরাত, কিন্তু কাশ্যপ প্রত্যেকটা কড়ি বুঝিয়ে দেয় শ্বেততারাকে। কাজেই শ্বেততারার মুনাফা চলল বেড়ে চলল আরও।

এটা যে সময়ের ঘটনা সে সময় এ অঞ্চল শাসন করছিলেন রাজা শ্যেন নামের এক ব্যক্তি। লোকটা 'শ্যেন পক্ষী' অর্থাৎ বাজ পাখির মতোই হিংস্র, ধূর্ত ছিল। তার প্রশ্রয়েই যেন আরও আঁধার নেমেছিল কর্ণসুবর্ণর বুকে। বেশ্যালয় থেকে জুয়ার আড্ডার মালিকরা সবাই নিয়মিত অর্থ পঠাত তাকে। শ্বেততারাও পাঠাতো। তাই তার দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না শ্বেততারার। তবে একটা ব্যাপার অজ্ঞাত ছিল শ্বেততারার। সেই কুক্কুট কী ভাবে যেন গিয়ে ভিড়েছিল সেই অন্ধকারের রাজা শ্যেনের কাছে। রতনে রতন চেনে। অচিরেই সে শ্যেনের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে শুরু করল।

যে কোনও জুয়ার আড্ডাতেই ছোটখাটো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট মাঝে মধ্যেই হয়। খেলাতে চুকি অর্থাৎ জুয়াচুরি নিয়ে ঝগড়া, তর্কাতর্কি, পাওনাদারের সঙ্গে হাতাহাতি, বেশ্যাদের সঙ্গে গোলোযোগ এসব হয়েই থাকে।

সেবার তখন জষ্টিমাস চলছে। একদিন সকালে এক অন্যরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হল শ্বেততারার দরজাতে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। তার জিজ্ঞাস্য গত রাতে তার পুত্র এই জুয়ার আড্ডাতে এসেছিল কিনা? বৃদ্ধের মুখ থেকে তার পুত্রের বিবরণ শুনে বোঝা গেল গতরাতে সে আড্ডাতে এসেছিল। বছর পনেরোর এক বালক। এক থলে রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে সে এসেছিল এবং একজন পাকা জুয়াড়ির সঙ্গে খেলতে বসে সে জুয়াতে হেরে পুরো মুদ্রাগুলি খুইয়ে বসেছে। ব্যাপারটা জানানো হল সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে। জুয়ার আড্ডাতে এসব ঘটনা তো প্রায়শই ঘটে থাকে। খবরটা শুনে ব্রাহ্মণ হায় হায় করে উঠে বললেন, 'আমার সব গেল! আমি এখন কী করব? ওটুকুই যে আমার সারা জীবনের সঞ্চয় ছিল। দেখি ছেলেটা কোথায় গেল?' এই বলে ব্রাহ্মণ তার উড়নির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

অন্যদিনের মতোই সেদিন সকাল দুপুরটাও একইভাবে কেটে গেল। যথারীতি নদীতে স্নান করতে গেল শ্বেততারা। সে ফিরে আসবার পর কাশ্যপ তাকে আগের দিনের মতোই টাকা কড়ির হিসাব বোঝাতে বোঝাতে কল্পনা করল নদীতীরে দেখা শ্বেততারার সেই সিক্তবসনা শরীর। বিকাল হল এক সময়। তারপর শুরু হল রাতের জন্য প্রস্তুতি। প্রদীপের সলতে পাকাতে শুরু করল দাসীর দল, মশালে পাট জড়িয়ে তেলের পাত্রে নিমজ্জিত করা হল। সূর্য ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু-চার জন করে জুয়াড়িরা হাজির হতে শুরু করল শ্বেততারার এই প্রাসাদের বাইরে।

মশাল আর প্রদীপের আলো জ্বলে উঠতে লাগল প্রাসাদে। কড়ি রক্ষক কাশ্যপ স্নান সেরে প্রস্তুত হল তার কানাকড়ির থলেগুলো নিয়ে। নতুন পট্টবস্ত্র আর অলঙ্কারে সজ্জিত

boierpathshala.blogspot.com

হল শ্বেততারাও। এদিন এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর জুয়া খেলতে আসার কথা।

অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্যপ তার কানাকড়ির থলে নিয়ে এগোলেন প্রাসাদের বৃহৎ কক্ষটার দিকে। সেখানে সার বেঁধে বসে সারা রাত ধরে কড়ির জুয়া খেলে জুয়াড়িরা। সে কক্ষও তখন জুয়াড়িদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রতিটা ছকের দু-পাশে পাতা হয়েছে তালপাতার যামল। একটা করে বড় তেলের প্রদীপ রাখা হয়েছে প্রতিটা ছকের পাশে। কুন্দ ফুলের মালা আর মদিরা, তাম্বুলের পাত্র নিয়ে জুয়াড়িদের আমন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত দাসী আর ভৃত্যরা। সে কক্ষে প্রবেশ করতে যাবে কাশ্যপ, এমন সময় বাইরে থেকে একটা গোলোযোগের শব্দ কানে এলো! কী ব্যাপার? খেলা শুরুর আগেই জুয়াড়িদের মধ্যে কোন গোলোযোগ শুরু হল নাকি? ব্যাপারটা দেখার জন্য কাশ্যপ এগোল প্রবেশ তোরণে দিকে।

তোরণ খুলে দেওয়া হয়েছে তখন। তোরণের কিছুটা তফাতে জুয়াড়িরাও সমবেত হয়েছে প্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য। কিন্তু তারা এগোতে পারছে না। তোরণের সামনের অংশ সামান্য অপরিসর। সেখানে দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে একজন শিখাধারী জুয়াড়িদের উদ্দেশে বলছে, 'তোমরা ফিরে যাও, ফিরে যাও। নইলে তোমরা একদিন ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে।' লোকটাকে চিনতে পারল কাশ্যপ। এই সেই ব্রাহ্মণ, যে প্রাতঃকালে তার পুত্রের সন্ধানে এসেছিলেন। দেউড়িতে যে প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল তাকে কাশ্যপ ব্যাপারটা জিগ্যেস করতেই সে বলল, 'ব্রাহ্মণের পুত্র নাকি জুয়াতে হেরে গিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে রজ্জুর ফাঁসে। আর এ ঘটনা শোনা মাত্রই ব্রাহ্মণের স্ত্রীও নাকি আত্মহনন করেন। স্ত্রী-পুত্র বিয়োগে উন্মাদ হয়ে গেছেন ব্রাহ্মণ। জুয়ার আড্ডাতে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না।'

ঘটনাটা যে দুর্ভাগ্যজনক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে জুয়ার ধর্মই এই। কানাকড়ি কাউকে ধ্বংস করে তেমনই কাউকে রাজা বানায়। এইতো ক'দিন আগে একজন ভিক্ষুক খেলতে এসেছিল ভিক্ষালব্ধ কয়েকটা মাত্র কড়ি নিয়ে। কিন্তু ফিরে গেল অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে। এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার থাকে না শ্বেততারা বা কাশ্যপদের।

জুয়াড়িদের উদ্দেশে চিৎকার করছিল ব্রাহ্মণ। কিন্তু এরপর হঠাৎ করে নজর পড়ল তোরণে দণ্ডায়মান কাশ্যপের দিকে।

উদভ্রান্ত, পাগলের মতো চেহারা তার। কাশ্যপকে তিনি বললেন, 'বন্ধ করো, বন্ধ করো এই জুয়ার আড্ডা। এই অন্ধকার বঙ্গদেশের আরও অন্ধকার নামিয়ে এনোনা তোমরা। বন্ধ করো শ্বেততারার জুয়ার আসর। এখনও যে ক'জন মানুষ এই অন্ধকারের রাজত্বে কোনওরকমে বেঁচে আছে তাদেরকে তোমরা বাঁচতে দাও। তোরণ বন্ধ করো বন্ধ করো।'

কাশ্যপ, ব্রাহ্মণকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'শ্বেততারার এ প্রাসাদের জন্য আমার সব কিছু ধ্বংস হল! আরো কতজন নিঃস্ব হবে, ধ্বংস হবে কে জানে? তোমার শরীরে ব্রাহ্মণের উপবীত আছে। এ পাপের অংশীদার তুমি হয়ো না।'

ঠিক এই সময় শ্বেততারাও চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনে নিজের কক্ষ থেকে হাজির হল সেখানে। তাকে দেখেই তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, 'সর্বনাশিনী, হয় আমার পুত্র আর ব্রাহ্মণীকে ফিরিয়ে দে, নইলে বন্ধ কর তোর জুয়ার আড্ডা। বন্ধ কর, বন্ধ কর...।'

boierpathshala.blogspot.com

যাই ঘটুক না কেন, জুয়ার আড্ডা কি বন্ধ করা যায়? তবে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কীভাবে শান্ত করা যায় বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শ্বেততারা। ঠিক এমন সময় একদল পাইক নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল সেই শ্রেষ্ঠী। যার আসার প্রতীক্ষাতে ছিল শ্বেততারা। শ্রেষ্ঠী বয়সে তরুণ। তাকে দেখে ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, 'তুমি এ প্রাসাদে প্রবেশ কোরো না। এ প্রাসাদ সর্বনাশের পথে নিয়ে যায় মানুষকে। এ প্রাসাদে প্রবেশ করার আগে তুমি একবার তোমার পিতামাতার কথা ভাবো। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা ভাবো। যুবক শ্রেষ্ঠী এই প্রথম পা রাখতে চলেছে শ্বেততারার প্রাসাদে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনে সে থমকে গেল। ব্রাহ্মণের কথা শুনে সে হয়তো ভাবার চেষ্টা করতে লাগল যে সত্যি সে কাজটা ঠিক করতে চলেছে কিনা। শ্বেততারা এবার প্রমাদ গুনল। যুবক যদি ফিরে যায় তবে সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যুবকের উদ্দেশে সে বলল, 'আপনি ভিতরে প্রবেশ করুন।'—কথাগুলো বলে সে চোখের ইশারা করল দ্বার রক্ষকদের। অমনি তারা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জাপটে ধরে এক পাশে সরিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ চিৎকার করতে থাকলেন, 'বন্ধ করো, বন্ধ করো এই কড়ির জুয়া।'

সেই তরুণ শ্রেষ্ঠীকে এরপর প্রায় হাত ধরেই প্রাসাদের ভিতর ঢুকিয়ে নিল শ্বেততারা। তোরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় এরপর সাধারণ জুয়াড়িরাও প্রবেশ করতে লাগল প্রাসাদে। ব্রাহ্মণের চিৎকারে কি আর কড়ির জুয়ার অমোঘ আকর্ষণ থামানো যায়? এখন আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না কাশ্যপের। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে নিজের কাজে মনোনিবেশ করল কাশ্যপ। সারা রাত ধরে প্রতি রাতের মতোই জুয়া খেলা চলল। নিজের কক্ষে বসে সেই ধনাঢ্য যুবকের সঙ্গে জুয়া খেলে বিপুল অর্থ লাভ হল শ্বেততারার। শেষ রাতে খেলা শেষে সেই যুবক আর অন্য জুয়াড়িরা প্রাসাদ ত্যাগ করল।

সূর্যের আলো তখন ফুটব ফুটব করছে। সদর দরজাতে খিল দিয়ে এসে এক দ্বাররক্ষী শ্বেততারাকে জানালো সেই ব্রাহ্মণ নাকি স্থান ত্যাগ করেননি। দেউড়ির চাতালে শুয়ে আছেন। শ্বেততারা ঘটনাটা শুনে কাশ্যপকে নির্দেশ দিলেন ব্রাহ্মণকে কিছু মুদ্রা আর আহারাদি দিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত পাঠাবার জন্য। তার নির্দেশ পালন করার জন্য একটু বেলার দিকে দেউড়ির বাইরে বেরিয়ে এল কাশ্যপ। চাতালে শুয়ে আছেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাশ্যপ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ বললেন, 'অর্থ সাহায্য গ্রহণ করার তো কোনও প্রশ্নই নেই, জুয়ার আড্ডা যদি বন্ধ না হয় তবে তিনি কোনওরূপ খাদ্য বা পানীয় স্পর্শ করবেন না। অনাহারে এই স্থানেই প্রাণ ত্যাগ করবেন। কাশ্যপ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে শ্বেততারাকে খবরটা জানাতে সে বলল, 'ঠিক আছে সে যখন শুয়ে আছে থাক। কাউকে যদি প্রাসাদে ঢুকতে সে বাঁধা দান না করে তবে তাকে এখন জোর করে সরাবার দরকার নেই, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

সেই বৃদ্ধ জুয়ার আড্ডাতে এরপর যেমন কাউকে ঢুকতে বাঁধা দিলেন না তেমনই সেই দেউড়ির চাতাল ছেড়ে নড়লেন না। খাদ্য পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না। তিনটে রাত কেটে গেল এ ভাবেই। যে সব জুয়াড়িরা আসা যাওয়া করল তাদের মধ্যে অনেকেই পরিহাস করে নানা কথা বলল বৃদ্ধকে। কেউ আবার তাকে ভিক্ষুক ভেবে উচ্ছিষ্ট খাবার ছুড়ে মারল তার গায়ে। সব কিছুই নীরবে হজম করলেন সেই ব্রাহ্মণ। চতুর্থ দিন সূর্যাস্তের কিছু আগে দ্বার রক্ষক এসে খবর দিল, 'ওই বৃদ্ধ মনে হয় মরতে চলেছে।'

কথাটা শুনে কাশ্যপ গিয়ে উপস্থিত হল বৃদ্ধের কাছে। ব্রাহ্মণের তখন প্রায় শেষ সময়। কাশ্যপকে দেখে তিনি নিজের উপবীতটা ধরে বললেন, 'আমি যদি সত্যি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে থাকি, জীবনে যদি কোনও অসৎ আচরণ না করে থাকি, তবে আমি বলে যাচ্ছি এ

boierpathshala.blogspot.com

জুয়ার আড্ডা, এ প্রাসাদ সব কিছু ধ্বংস হবে। আর তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে এই পাপ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছ! তুমি এখন পতিত হয়ে গেছ। এ জায়গা থেকে এ পাপপুরী থেকে কোনও দিন মুক্তি ঘটবে না তোমার। আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম।'—এ কথা বলার পরই পট করে ছিঁড়ে গেল উপবীত আর ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো থেমে গেল।

কাশ্যপ এসে খবরটা দিল শ্বেততারাকে। ব্যাপারটা শুনে শ্বেততারা বলল, 'ব্রাহ্মণের মড়া বাসি করা চলে না। তাছাড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই জুয়াড়িরা আসতে শুরু করবে। মৃতদেহ দর্শন করলে সংস্কারবশত ফিরে যেতে পারে। আজ রাতে জুয়াড়িদের ব্যাপারটা আমি সামলে নিচ্ছি।' শ্বেততারার কথামতো কাশ্যপ কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ দাহ করতে চলল।

নদীতীরে তারা যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার নেমে গেছে। কাঠ ইত্যাদি জোগাড় করতে কিছুটা সময় লাগল। তারপর চিতাতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেহটাকে শুইয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হল। পুড়তে লাগল দেহটা। যাদের কাঠের চিতাতে মৃদদেহ দাহ করার অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন যে পুড়তে পুড়তে অস্থি মজ্জাতে টান ধরাতে অনেক সময় জ্বলন্ত মৃতদেহ উঠে বসে। চিতার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটার তদারকি করছিল কাশ্যপ। হঠাৎই ব্রাহ্মণের জ্বলন্তদেহ উঠে বসল চিতাতে। কাশ্যপের মনে হল আগুনে মাংস খসে পড়া ব্রাহ্মণের মুখটা যেন দন্ত বিকশিত করে হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। তার একটা হাত যেন উত্থিত হল নদীর দিকে। আর এরপরই অবশ্য একজন লোক কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে আঘাত করে ব্রাহ্মণের জ্বলন্ত দেহটাকে আবার শুইয়ে দিল। দাহকাজ সম্পন্ন করে কাশ্যপ মধ্যরাতে শ্বেততারার প্রাসাদে ফিরে এল।'—এ পর্যন্ত বলে আবারও থামলেন মার্তণ্ড। একটা চাল দিয়ে তিনি মানববাবুকে বললেন, 'ব্রাহ্মণের কাহিনিটার সঙ্গে আমার কাহিনির বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে তাই বললাম।'

মানববাবুও নিঃশব্দে একটা চাল দিলেন। ইতিমধ্যে মানববাবু আর মার্তণ্ড দুজনেই অপরপক্ষের বেশ কয়েকটা কড়ি গিলেছেন। মানববাবুর চাল দেবার পর মার্তণ্ড আবার বলতে শুরু করলেন।

৬

পরদিন একটু বেলার দিকে শ্বেততারার কাছে সংবাদ এল নদীর পাড়ে নাকি একটা বড় ময়ূরপঙ্খী এসেছে। কার ময়ূরপঙ্খী? এদিকে সচরাচর নাও বা বাণিজ্য তরী আসে না লুঠ হয়ে যাবার ভয়ে। উত্তর থেকে যারা নদীপথে দক্ষিণে সমুদ্র মোহনার দিকে যায় তারা গঙ্গার আর এক শাখা পথ ধরে যায়। ভাগীরথীর দু-পাশের গ্রামগুলো তো এখন অধিকাংশই জনশূন্য, জঙ্গলাকীর্ণ, তস্কর-দস্যুর আশ্রয় স্থল। তাই এ পথ মাড়ায় না কোনও বাণিজ্যও তরী। খবরটা কৌতূহলের উদ্রেক ঘটালো শ্বেততারার মনে।

বিশস্ত সহযোগী কাশ্যপকে নিয়ে সে উপস্থিত হল নদীর তীরে। হ্যাঁ, বেশ বড় একটা ময়ূরপঙ্খী দাঁড়িয়ে আছে মাঝনদীতে। ময়ূরপঙ্খী থেকে ছিপ নৌকা নিয়ে ইতিমধ্যে পাড়েও নেমেছে বেশ কিছু লোকজন। শ্বেততারা ও কাশ্যপ সেখানে উপস্থিত হতেই একজন লোক তাদের দিয়ে এগিয়ে এল। তার পরনে জরিবোনা মখমলের পোশাক, মুক্তাহার শোভিত মস্তকবন্ধনী। দিনের আলোতে ঝলমল করছে তার হাতের বহুমূল্য পাথর শোভিত স্বর্ণাঙ্গুরীয়গুলো। তাকে দেখে শ্বেততারা ও কাশ্যপও যেমন বিস্মিত হল তেমনই সেই গৌরবর্ণের যুবকও সম্ভবত বেশ বিস্মিত হল অতীব সুন্দরী ললনা

boierpathshala.blogspot.com

শ্বেততারাকে সেই প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ নদীতটে দেখে। কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সেই সম্ভ্রান্ত যুবক প্রশ্ন করল, 'এ কোন জায়গা?'

শ্বেততারা জবাব দিল, 'কর্ণসুবর্ণর তট।'

কথাটা শুনে যুবক মৃদু চমকে উঠে বলল, 'কর্ণসুবর্ণ! তাই গত দু'দিন দূরে নদীতটের দু-পাশে কোনও জনবসতি চোখে পড়েনি। এ পথে আমার আসার কথা ছিল না।'

যুবকের মৃদু চমকে ওঠা দেখে কাশ্যপ আর শ্বেততারা দুজনেই অনুমান করল যে আগন্তুক কর্ণসুবর্ণর বর্তমানে 'সুখ্যাতি'র কথা শুনেছে। শ্বেততারা তাকে প্রশ্ন করল, 'তবে এ পথে এলে কেন? তোমার পরিচয় কী?'

যুবক জবাব দিল, 'আমার নাম রৈবতক। কাশী নগরীর বাসিন্দা। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে বাণিজ্য করে ঘরে ফিরছিলাম। চারদিন আগে ঝড়ের কবলে পড়ে রাস্তা ভুল করে ভাগীরথীর নদীখাতে প্রবেশ করেছিলাম। গত তিনদিন আশপাশে কোনও জনমানব চোখে পড়েনি। নদী থেকে যে দু-চারটে গ্রাম চোখে পড়েছে তা সবই জনশূন্য। গত রাতে দূর থেকে এখানে একটা আলোক বিন্দু দেখতে পেলাম। ভাবলাম এখানে কোনও বন্দর আছে। অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে নৌকাকে তার উপস্থিতি জানানো হচ্ছে যেমন জানানো হয়ে থাকে। কিন্তু এসে দেখলাম তেমন কিছু নয়, উল্টে বিপদগ্রস্থ হলাম।'

কাশ্যপ বণিক রৈবতকের কথা শুনে অগ্নিকুণ্ডের রহস্য বুঝতে পারল। গতরাতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দাহ করার জন্য যে চিতা জ্বালানো হয়েছিল সে আগুনই চোখে পড়েছিল ময়ূরপঙ্খীর নাবিকের।

নাবিক আবার বলল, 'তোমাদের পরিচয়?'

শ্বেততারা জবাব দিল, 'আমি শ্বেততারা। এখানে আমার প্রাসাদ আছে। কড়ির জুয়ার আড্ডা চালাই। আমার সঙ্গী এই ব্রাহ্মণের নাম কাশ্যপ। আপনি এখন কী করবেন? পুনরায় যাত্রা শুরু করবেন?'

রৈবতক বলল, 'তাই তো করতাম। কিন্তু বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছি আমি। নদীর এ অংশে বর্তমানে নাব্যতা যে এত কম তা অন্ধকারে ঠাহর করতে পারিনি। আমার ময়ূরপঙ্খী আটকে পড়েছে বিশাল পাথরখণ্ডের মতো। জোয়ারের জলেও নড়ছে না।'

শ্বেততারা বলল, 'গ্রীষ্মে এবার এক বিন্দু বৃষ্টি হয়নি তাই নদীর এই হাল।'

রৈবতক বলল, 'বর্ষা নামতে তো এখনও অন্তত এক পক্ষকাল দেরি। নদীর জল না বাড়লে আমি ফিরতে পারব না। একগণ্ডা মানুষ আমরা। যদি ক'টা দিনের জন্য এখানে কোনও আশ্রয় পাই তার জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করতে আমি রাজি আছি। পান্থশালা গোছের কিছু একটা।'

তার কথা শুনে শ্বেততারা হেসে বলল, 'নগরী বেশি দূর নয়, তবে যে কর্ণসুবর্ণ নগরীর কথা তোমরা শুনে এসেছ তা আজ প্রায় জনমানবহীন। যে মন্দির, বৌদ্ধ মঠ, রাজকীয় পান্থ নিবাসগুলিতে পথিক-বণিকদের আশ্রয় দেওয়া হত সে সবই আজ শৃগাল-কুকুরের আবাসস্থল।'

'তবে কী করা যায়?' চিন্তার স্পষ্টভাব ধরা দিল যুবকের গৌরবর্ণের মুখমণ্ডলে।

শ্বেততারা প্রথম দর্শনেই যুবকের প্রেমে পড়েছিল কিনা জানা নেই। সে রৈবতকের উদ্দেশে বলল, 'তুমি ইচ্ছা করলে ক'টা দিন আমার বাটিকাতে কাটাতে পারো। তবে

boierpathshala.blogspot.com

একগণ্ডা লোকের স্থান সঙ্কুলান সেখানে হবে না।'

শ্বেততারার প্রস্তাব শুনে যুবক প্রথমে বলল, 'জুয়ার আড্ডাতে! না, না, আমি জুয়া খেলি না। আমি তবে নাওতেই রাত্রিবাস করব।'

তার আশঙ্কা বুঝতে পেরে শ্বেততারা মৃদু হেসে বলল, 'জুয়ার আড্ডা চালালেও আমি দস্যু বা তস্কর নই। তোমাকে জুয়া খেলতে আমি সেখানে আহ্বান জানাচ্ছি না। তুমি বিপদগ্রস্থ তাই প্রস্তাবটা দিলাম। তুমি তোমার নাওতে রাত্রিবাস করতে পারো ঠিকই তবে সেটা তোমার পক্ষে সুরক্ষিত নাও হতে পারে। বিশেষত যখন তুমি একজন বণিক এবং বাণিজ্য সেরে ফিরছ, তোমার কাছে অর্থ সম্পদ থাকবে তা যে কোনও লোকের পক্ষেই অনুমেয়। তোমার হাতের ওই একটি অঙ্গুরীয় অপেক্ষা অনেক কম মূল্যের, সামান্য কয়েকটা রৌপ্য মুদ্রার জন্য মানুষের প্রাণ যায় এখানে। এখানে আইনের কোনও শাসন নেই, অভিযোগ জানাবার কোনও স্থান নেই, কোথাও জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা নেই। যার হাতে ক্ষমতা আছে, অস্ত্র আছে সে যে-কোনও মানুষকে হত্যা করতে পারে, নারী বা অর্থ যে-কোনও কিছু লুণ্ঠন করতে পারে। এবার ভেবে দেখো তুমি কী সিদ্ধান্ত নেবে?'

শ্বেততারার কথা শুনে বণিক রৈবতক বলল, 'ব্যাপারটা আমি কিছুটা শুনেছিলাম বটে। যে কারণে সমুদ্রযাত্রা করা বণিকরা ভাগীরথীর পথ ধরে না। তবে ব্যাপারটা সত্যি যে এমন ভয়াবহ তা জানা ছিল না।'

শ্বেততারা বলল, 'হ্যাঁ, এখন এখানে দিনের বেলাতেও অন্ধকারের রাজত্ব বিরাজমান। লোকে বলে—মাৎসন্যায়!'

বণিক একবার মনে হয় কিছুক্ষণ চিন্তা করল তার বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে, তারপর শ্বেততারাকে বলল, 'তোমার বাটিকা কতদূরে?' একবার দেখে আসা যেতে পারে?'

শ্বেততারা বলল, 'কাছেই। ওই যে দেখো ওই গাছের মাথার ওপর দিয়ে আমার বাটিকার শীর্ষদেশের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই দেখে আসতে পারো।'

বণিক রৈবতক দুজন সঙ্গীকে নিয়ে শ্বেততারা আর কাশ্যপের সঙ্গে রওনা হল শ্বেততারার প্রাসাদ অভিমুখে। শ্বেততারার বাটিকাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করল সকলে। শ্বেততারা দই ও পিষ্টক দিয়ে আপ্যায়ন করল রৈবতককে। দুরাগত অতি ধনাঢ্য জুয়ারিদের রাত্রিবাসের জন্য শ্বেততারার প্রাসাদ সদৃশ বাটিকাতে একটা কক্ষ আছে। সেটি দেখানো হল বণিককে। সেই কক্ষ প্রাকার বেষ্টিত, দেউড়িতে রক্ষক শোভিত বাটিকা বাসস্থান হিসাবে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে হওয়াতে শ্বেততারার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল বণিক। সে নিজেই বলল সপ্তাহ শেষে সে দশটি করে রৌপমুদ্রা দেবে বাটিকাতে থাকার জন্য।

বণিক রৈবতক এরপর প্রাসাদ ছেড়ে নদীর দিকে ফিরে চলল তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রাসাদে আনার জন্য। তার সঙ্গে কাশ্যপ আর একজন লাঠিধারী রক্ষককে পাঠাল শ্বেততারা।

বণিক রৈবতক কিন্তু বেশি সামগ্রী বহন করে আনল না তার ময়ূরপঙ্খী থেকে। সে আনল একটা পোশাকের গাঁটরি আর দুটো মখমলের মেটাসোটা থলে। গাঁটরিটা সে লাঠিধারী রক্ষকের কাছে দিলেও থলে দুটোকে সে তার নিজের কাছেই রাখল। তা দেখে কাশ্যপ অনুমান করল যে বণিকের বাণিজ্য লব্ধ অর্থ সম্পদ তার বুকে আগলে রাখা ওই মখমলের থলের মধ্যেই আছে। জুয়ার আড্ডাতে ফেরার পথে রৈবতকের সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

আলাপচারিতাতে কাশ্যপ জানতে পারল যে রৈবতক সমুদ্রতে মৃগনাভি আর পট্টবস্ত্র নিয়ে চম্পা নগরীর বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। সমুদ্র যাত্রা তার ফলপ্রসূ হয়েছে। বণিক রৈবতক অবিবাহিত। কাশী নগরীতে তার শ্বেততারার প্রাসাদ অপেক্ষা অনেক বড় উদ্যান শোভিত বাটিকা রয়েছে গঙ্গানদীর তীরে।

বণিক রৈবতকের এ ভাবেই প্রবেশ ঘটল শ্বেততারার জুয়ার আড্ডাতে। বর্ষা নামার প্রতীক্ষাতে সেখানে বাস করতে শুরু করল রৈবতক। সকাল বেলা উঠে নদীর পাড়ে ময়ূরপঙ্খীতে থাকা তার লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত রৈবতক। তারপর বিকালের আগেই আবার শ্বেততারার প্রাসাদে ফিরে আসত।

শ্বেততারার আশঙ্কা যে সত্যি ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হল। এক রাতে ছিপ নৌকা নিয়ে সেখানে হানা দিল একদল সশস্ত্র লোক। বাণিজ্য লব্ধ অর্থ ময়ূরপঙ্খীতে কিছু না থাকলেও নাবিকদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত সামান্য অর্থ যা ছিল তা লুঠপাট করল তারা। তাদের অভীষ্ট সম্পদ আর ময়ূরপঙ্খীর 'অধিকারী' অর্থাৎ রৈবতককে না পেয়ে নাবিকদের প্রচণ্ড মারধর করত তারা। শ্বেততারার বুদ্ধিমত্তা ও আশ্রয়দানের ফলেই যে রৈবতক রক্ষা পেয়েছে তা বুঝতে পেরে শ্বেততারার ওপর আস্থা বেড়ে গেল রৈবতকের।

আর শ্বেততারা? কাশ্যপ কিছু দিনের মধ্যেই লক্ষ করল যে শ্বেততারা যেন বেশি যত্নবান হয়ে পড়েছে রৈবতকের প্রতি। মিষ্টান্ন বিক্রেতাদের কাছ থেকে নানা ধরনের মিষ্টান্ন কিনছে নাবিকের জন্য। কখনও বা নিজ হাতে পরমান্ন রন্ধন করছে নাবিকের জন্য। শ্বেততারা যখন নদীতে অবগাহন করে ফেরে তখন রৈবতকও তার পালকির সঙ্গেই ফেরে নদীতট থেকে। রৈবতককে প্রশ্রয় দেবার পিছনে শ্বেততারার কি কোনও অভিসন্ধি আছে? নাকি নাবিকের প্রেমে পড়েছে শ্বেততারা। কাশ্যপ একদিন শ্বেততারার জীবন রক্ষা করেছে ঠিক কিন্তু কোনও নারীর কাছে যে মধ্যবয়সি ব্রাহ্মণ কাশ্যপ অপেক্ষা যুবক রৈবতক বেশি আকর্ষণীয় হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যাপারটা কাশ্যপের মনে মৃদু ঈর্ষার জন্ম দিলেও সে ভাবল, 'আরতো মাত্র ক'টাদিন। বর্ষা নামলে নদীতে জল বাড়লে তো ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দেবে নাবিক রৈবতক। আর রৈবতকের সঙ্গে শ্বেততারার যদি ক্ষণিকের জন্য প্রেমের সম্পর্ক গড়েও ওঠে তবে শ্বেততারা নিশ্চয় তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই জুয়ার আড্ডা ছেড়ে ময়ূরপঙ্খীতে চেপে বসবে না? আর রৈবতক নিশ্চয়ই শ্বেততারার টানে এই অন্ধকারের দেশে রয়ে যাবে না?

দিন কাটতে লাগল নিজের নিয়মে। শ্বেতাতারার জুয়ার আড্ডা যেমন চলছিল তেমন চলতে লাগল। আষাঢ় মাসের প্রথম দিনেই ঠিক বর্ষা নামল।

এ পর্যন্ত বলে থামলেন মার্তণ্ড কারণ, হঠাৎই মানববাবুদের চারপাশে কেমন যেন অন্ধকার নেমে এল! একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে চাঁদটাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মার্তণ্ড হেসে বললেন, 'দেখলেন যেই বর্ষার কথা বললাম, অমনি কেমন মেঘ এসে গেল! এ মেঘ কিন্তু জলভরা মেঘ। নইলে এমনভাবে চাঁদকে ঢাকতে পারত না।'

মানববাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আজকাল তো প্রতিবছর দুর্গা পুজোর সময় বৃষ্টি নামে।'

মেঘটা চাঁদটার ওপর থেকে সরে যাবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল মানববাবুদের। তারপর মেঘটা চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল। আবার আলোকিত হয়ে উঠল ছকটা। বেশ কয়েকটা চাল খেলার পর মানববাবু বললেন, 'নিন আবার শুরু করুন। বর্ষা নামার পর কী হল?'

boierpathshala.blogspot.com

সেই ধ্বংসস্তূপের কোথা থেকে যেন একপাল শেয়াল ডেকে উঠে প্রহর ঘোষণা করল। মার্তণ্ড বললেন, 'হ্যাঁ, বলছি। এই প্রাচীন প্রাসাদের আসল কাহিনি এবার শুরু হবে—

৭

আষাঢ়ের প্রথম দিনই সকাল থেকে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে মধ্যরাতে গিয়ে থামল। সে রাতে জুয়ার আড্ডা তেমন জমল না। পরদিন সকালে নাবিক রৈবতক নদীর অবস্থা দেখে বেশ খুশি মনেই প্রাসাদে ফিরে এল। কাশ্যপের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বলল, 'আর সাতদিন এমন বৃষ্টি হলেই ময়ূরপঙ্খী ভাসাতে পারব।'

কথাটা শুনে কাশ্যপ তাকে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ ভালো খবর। ফিরে যেতেই হবে তোমাকে। এ জায়গার পরিবেশ, পরিস্থিতি তো তুমি জেনেই গেছ। যত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারো ততই মঙ্গল। হয়তো তাতে আমাদের খারাপ লাগবে। কিন্তু কী আর করা যাবে?' আর মনে মনে কাশ্যপ বলল, 'যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় হয় ততই ভালো। শ্বেততারা যেন তোমার প্রতি একটু বেশিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।'

কাশ্যপের অনুমান মিথ্যা ছিল না। সে খেয়াল করে দেখেছিল এত দিন পর বর্ষা নামাতে শ্বেততারার মুখমণ্ডলে আনন্দের পরিবর্তে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার আভাস।

এই দ্বিতীয় দিন বিকাল থেকেই আবার প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হল। এমন বর্ষণ যে একজন জুয়াড়িও সেদিন উপস্থিত হল না জুয়ার আড্ডাতে। অন্য রাতগুলো জেগেই কাটাতে হয় কাশ্যপকে। শেষ রাতে জুয়ারিরা ফিরে গেলে কাশ্যপ তখন নিদ্রা যায়। দ্বিপ্রহরে সে ঘুম থেকে উঠে শ্বেততারাকে পূর্বদিনের হিসাব বোঝাতে যায়। এ কাজের মাধ্যমে তার দিন শুরু হয়। বর্ষা নামাতে আর রৈবতকের ফিরে যাবার সংবাদে মনটা বেশ খুশি ছিল কাশ্যপের। বহু দিন বাদে সে রাতে ঘুমাতে গেল। বাইরে থেকে ভেসে আসা বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ আর ভেকের কলতান ঘুম নামিয়ে আনল কাশ্যপের চোখে।

শেষ রাতের দিকে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল কাশ্যপ। সে প্রথমে দেখল নদী তটে তার সামনে শুয়ে আছে এক সিক্তবসনা নারী শ্বেততারা। প্রস্ফুটিত তার অঙ্গসৌষ্ঠব। সিক্তবসনের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে তার গভীর অতলান্ত নাভিকূপ। বৃষ্টির ফোঁটাকে শুষে নিচ্ছে সেই নাভি। সুডৌল স্তন যুগল ও তার জামফলের মতো স্তনবৃন্ত দুটো যেন চেয়ে আছে কাশ্যপের দিকে। কদলি কাণ্ডের মতো দেখতে মসৃণ উরু দুটো গিয়ে মিশেছে শ্বেততারার অনন্ত যৌবনের আধারে।

ঘুমের মধ্যে কাশ্যপ কিন্তু শ্বেততারার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করল না। সে চেয়ে রইল তার দেহের দিকে। উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করল কাশ্যপের শরীর। কামনার আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার রক্তে। সে আগুন আর এক সময় সহ্য করতে পারল না কাশ্যপ। সে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হল শ্বেততারাকে। কিন্তু হঠাৎই যেন চারপাশে অন্ধকার নেমে এল, আর তারপরই জ্বলে উঠল অন্য এক আগুন। কাশ্যপ দেখল তার সামনে থেকে উধাও হয়েছে শ্বেততারা, আর তার কিছুটা তফাতেই একটা চিতা জ্বলছে! আর সেই চিতার মধ্যে জ্বলন্ত শরীর নিয়ে বসে আছে সেই স্ত্রী-পুত্রহারা ব্রাহ্মণের শব। কাশ্যপের দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন, 'তুই পতিত হয়েছিস। তোর কোনওদিন মুক্তি হবে না এ নরক থেকে। মুক্তি হবে না, মুক্তি হবে না...।'

এ পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখেই ঘুম ভেঙে গেল কাশ্যপের। সকাল হয়েছে। মেঘ সরে গেছে, বৃষ্টি আপাতত বন্ধ। ঘুম থেকে উঠে কাশ্যপ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করল সেই অদ্ভুত

boierpathshala.blogspot.com

স্বপ্নের কথা। তারপর সে নিজের কাজে মন দিল। আগের দিন কোনও জুয়াড়ি না এলেও পুরোনো একটা হিসাব বাকি ছিল। শ্বেততারা স্নান সেরে ফেরার পর মুদ্রার থলি আর হিসাব নিয়ে শ্বেততারার কক্ষে পৌঁছল কাশ্যপ।

মাটিতে বিছানো মাদুরে থলি থেকে মুদ্রা ঢেলে কাশ্যপ, শ্বেততারার মুখোমুখি বসল। সদ্য স্নান সেরে এসেছে শ্বেততারা। তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তার কেশদামের প্রান্তদেশ বেয়ে। শ্বেততারার মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ। শ্বেততারা টাকা গুনছে, কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক লাগছে তাকে। হয়তো বা বণিক এবার দেশে ফিরে যাবে বলে সত্যি বেশ কাতর সে। আর এরপরই হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করল সে। শ্বেততারার নিমাঙ্গের বস্ত্র এক পাশের হাঁটুর অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। দুধের মতো সাদা মসৃণ উরু প্রায় পুরোটাই দৃশ্যমান কাশ্যপের চোখের সামনে। এমনকী শ্বেততারার সব থেকে গোপনাঙ্গের মৃদু আভাসও যেন বর্তমান তার বস্ত্রের ফাঁক গলে! শ্বেততারা ইতিপূর্বে কোনওদিন কাশ্যপকে ইচ্ছাকৃতভাবে শরীর প্রদর্শন করেনি।

কাশ্যপ বুঝতে পারল শ্বেততারার অসতর্কতার কারণেই ব্যাপারটা ঘটেছে। কাশ্যপের মনে পড়ে গেল প্রথম দিন দেখা, গতরাতে দেখা শ্বেততারার সেই সিক্তদেহ। কাশ্যপ কিছুতেই চোখ সরাতে পারল না শ্বেততারার সেই উন্মুক্ত উরু থেকে। কাশ্যপের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল আদিম রিপুর বাসনা। দুর্বার এক কাম তাড়না যেন তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। কাশ্যপের হাত কি তার নিজের অজান্তেই স্পর্শ করতে যাচ্ছিল শ্বেততারার মাখন সদৃশ সেই উরু? ব্যাপারটা জানা নেই কাশ্যপের। কিন্তু হঠাৎই শ্বেততারা এরপর এক ঝটকাতে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার উরু আবৃত করে বলে উঠল, 'আমার মুদ্রা গণনা শেষ।'

কথাটা শুনে সম্বিত ফিরে পেয়ে কাশ্যপ চমকে উঠে তাকাল শ্বেততারার দিকে। শ্বেততারার মুখ গম্ভীর। শ্বেততারার কাছে যে সে ধরা পড়েছে তা বুঝতে পারল কাশ্যপ। হিসাব বোঝানো হয়ে গেছে তাই শ্বেততারার কক্ষ ত্যাগ করল কাশ্যপ। সেদিনও দ্বিপ্রহরের পর থেকে আগের দিনের মতনই কালো মেঘে ঢেকে যেতে লাগল আকাশ। তারপর বৃষ্টি নামল। জুয়ার নেশাতে এদিন দু-পাঁচ জন জুয়ার আড্ডাতে এল ঠিকই, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়াতে মাত্র কয়েকদান জুয়া খেলেই তারা ফিরে গেল।

আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। বাতি নিভে গেল শ্বেততারার প্রাসাদে। নিজের কক্ষে শুয়ে পড়ল কাশ্যপ। কিন্তু ঘুমে জাগরণে কাশ্যপের চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠতে লাগল শ্বেততারার সেই ধবল উরু, আর তারও গভীরে শ্বেততারার একান্ত গোপন স্থানের আহ্বান। কাশ্যপের মনে হতে লাগল যে কোনও মূল্যে তাকে স্পর্শ করতে হবে শ্বেততারার ওই উরু, তাকে পেতেই হবে, পেতেই হবে শ্বেততারার শরীর। নইলে কাশ্যপের পুরুষ জন্ম বৃথা।

পর দিন সকালে কাশ্যপ যখন শয্যা ত্যাগ করল তখন সারারাত বর্ষণ সমাপ্ত করে শান্ত হয়েছেন বরুণদেব। রোজই এমন হচ্ছে গত ক'দিন ধরে। সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার থাকছে। তারপর আকাশের দখল জল ভরা মেঘের দলের। ক'দিন ধরে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে শ্বেততারার বাটিকার ভিতর কেমন যেন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তার থেকে মুক্ত হবার জন্য একটু বেলার দিকে কাশ্যপ দেউড়ির বাইরে সূর্য কিরণে এসে দাঁড়াল। তবে তার স্বপ্নর রেশ যেন কিছুতেই কাটছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখল নদীর দিক থেকে রৈবতক আসছে। রোজ প্রত্যুষে সে নদীর জল দেখতে যায়। কাশ্যপের সামনে এসে বণিক রৈবতক হাসি মুখে বলল, 'নদীর জল হু-হু করে বাড়ছে।

boierpathshala.blogspot.com

আমার ময়ূরপঙ্খী নাও মৃদু মৃদু কাঁপতে শুরু করেছে। জলের তোড়ে নদীর তলদেশের পলি খসতে শুরু করেছে। আর দু-রাত এমন বর্ষণ হলেই আমার নাও ভেসে উঠবে। যাত্রা শুরু করব আমি।'

কাশ্যপ বলল, 'ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করি, বরুণদেবের কাছে প্রার্থনা জানাই তোমার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়।'

কাশ্যপের কথা শুনে প্রাসাদে প্রবেশ করার আগে রৈবতক বলল, 'ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত বাণী ফলবে বলেই আমার মনে হয়।'

বণিক রৈবতক 'ব্রাহ্মণ' বলতে কাশ্যপকে বোঝালেও কথাটা শুনে কাশ্যপ মৃদু চমকে উঠল। তার হঠাৎই মনে পড়ে গেল সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা! ওই যে দেউড়ির গায়ের চাতালে শুয়ে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে যে কাশ্যপকে অভিশাপ দিয়েছিল তার মুক্তি ঘটবে না বলে! কথাটা মনে পড়তেই কাশ্যপের মনটা একটু তেতো হয়ে গেল। সত্যি কি নিষ্ঠাবান কোনও ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলে? এ নিয়ে ভাবতে লাগল কাশ্যপ।

সূর্যের তাপে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ঘর্মপাত হবার উপক্রম হল কাশ্যপের। সে আবার দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় অশ্বখুরধ্বনি কানে এল তার। কারা যেন অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে। শব্দটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাশ্যপ। কিছুক্ষণের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে শ্বেততারার প্রাসাদের সামনে আবির্ভূত হল পাঁচজন লোক। চর্ম বর্মে আবৃত তাদের দেহ। কারো কোমরে তলোয়ার বা কিরিচ গোঁজা, কারও বা হাতে ধরা বল্লম। একটা লোক, সেই মনে হয় অশ্বারোহীদের দলপতি। কৃষ্ণবর্ণের চেহারা, চোয়ালের হাড়টা বেশ উঁচু, কপালে একটা কাটা দাগ আছে। সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কাশ্যপকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পর্যবেক্ষণ করে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'প্রভু শ্যেনের সেবক আমরা। শ্বেততারা কোথায়?'

কাশ্যপ জবাব দিল, 'সে নিজের কাজে ব্যস্ত আছে। কী প্রায়োজন?'

লোকটা বলল, 'প্রয়োজন আছে। প্রভু একটা পত্র দিয়েছেন তার উদ্দেশে। পত্রও বলতে পারো, আবার নির্দেশও বলতে পারো।' এই বলে ধূর্ত চাহনিতে হেসে লোকটা তার কোমরবন্ধ থেকে তালপাতার একটা পত্র বার করল। পত্রটা কাশ্যপের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার সময় বলল, 'তুমি তো সেই ব্রাহ্মণ যে কড়ি রক্ষকের কাজ করো তাই না? কী যেন নাম তোমার?'

পত্রটা হাতে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেই কাশ্যপ।'

লোকটা হেসে বলল, 'পত্রটা খুব জরুরি। এটা এখনই গিয়ে তোমার প্রিয়তমাকে দাও। তাকে বলো কুক্কুট এই পত্র নিয়ে এসেছে। রাজনির্দেশ পালন না করলে বিপদ ঘটবে।'

লোকটার কথা শুনে একসঙ্গে হেসে উঠল তার সঙ্গীরা। কাশ্যপকে এরপর আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল লোকটা।

কুক্কুটকে একবারই রক্তাক্ত অবস্থায় এ প্রাসাদ ছেড়ে পালাতে দেখেছিল কাশ্যপ। সেই প্রথম দিনের পর সে কোনওদিন কুক্কুটকে দেখেনি। তাই সে প্রথম দর্শনে তাকে চিনতে পারেনি। তার পরিচয় জানার পর কাশ্যপের মনে পড়ল বণিক রৈবতকের ময়ূরপঙ্খীতে যারা লুঠপাট চালিয়েছিল তাদের দলপতির কপালেও নাকি একটা কাটা দাগ ছিল। তবে প্রভু শ্যেনই কি তার অনুচর কুক্কুটকে ময়ূরপঙ্খী লুণ্ঠনের জন্য পাঠিয়েছিল?

boierpathshala.blogspot.com

অশ্বখুরের শব্দ মিলিয়ে গেল। কাশ্যপ দেউড়ির ভিতর ঢুকে এগোল শ্বেততারার কক্ষের দিকে।

৮

শ্বেততারা তখন নদীতে স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছিল। কাশ্যপ তার দরজার কপাটে গিয়ে ঘা দিতেই দরজা খুলে এই অসময়ে কাশ্যপকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। তালপাতার পত্রটা সে শ্বেততারার হাতে দিয়ে বলল, 'প্রভু শ্যেনের কাছ থেকে ওই কুক্কুট এসেছিল। সে ওই পত্র দিয়ে গেছে।'

কুক্কুটের নাম শুনেই শ্বেততারা বলল 'সেই পামর, তস্কর কুক্কুট। যাকে আমি প্রদীপদণ্ড দিয়ে আঘাত করে বিতাড়িত করেছিলাম?'

কাশ্যপ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সে এসেছিল। তার কপালে একটা শুষ্ক কাটা দাগ আছে।'

কথাটা শুনেই সুতো দিয়ে বাঁধা তালপাতার বাঁধন খুলে সেটা নীরবে পাঠ করতে শুরু করল শ্বেততারা। কাশ্যপ খেয়াল করল পত্রটা পাঠ করতে করতে কেমন যেন একটা শঙ্কার ভাব নেমে এল তার মুখমণ্ডলে। পত্র পাঠের পর সেটা আবার গুটিয়ে ফেলে নিশ্চুপ ভাবে চৌকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল সে। শ্বেততারার মুখমণ্ডলে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ভাব লক্ষ করে কাশ্যপ একটু ইতস্ততভাবে জানতে চাইল 'পত্রে কী লেখা আছে?'

শ্বেততারা জবাব দিল 'দু-রাত পর অর্থাৎ পরশু সূর্যাস্তের পর রাজা শ্যেন তার প্রতিনিধি হিসাবে কুক্কুটকে আমার এখানে জুয়া খেলতে পাঠাবেন আমার অথবা আমার কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে। জুয়ার শর্তও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন।'

'কী শর্ত?' জানতে চাইল কাশ্যপ।

শ্বেততারা চিন্তাক্লিষ্টভাবে বলল, 'কুক্কুট যদি পরাজিত হয় তবে আমি পাব মাত্র একশো রৌপ্য মুদ্রা। আর আমি যদি পরাজিত হই তবে এই প্রাসাদ, জুয়ার আড্ডা সব তুলে দিতে হবে রাজপ্রতিনিধি কুক্কুটের হাতে। সেদিন প্রাসাদে অন্য জুয়াড়িদের প্রবেশ বা রক্ষীদের উপস্থিতিও নিষেধ বলে পত্রে জানানো হয়েছে!'

শ্বেততারার কথা শুনে কাশ্যপ বলল, 'কিন্তু শর্ত দেখে মনে হচ্ছে এই জুয়ার আড্ডার দখল নিতে চাচ্ছেন শ্যেন। কুক্কুট যে প্রভু সেনের আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছিল তা আমার জানা ছিল না। সেই নিশ্চয় প্ররোচিত করেছে শ্যেনকে। আমি এতদিন ধরে শ্যেনকে নিয়মিত ভাবে তার প্রণামী পাঠিয়ে আসছি। তিনি হঠাৎ আমাকে বিব্রত করতে জুয়া খেলার জন্য কুক্কুটকে পাঠাবেন কেন? কুক্কুটের কপালের ওই ক্ষতচিহ্ন আমার আঘাতেই সৃষ্ট। সম্ভবত কুক্কুটই হানা দিয়েছিল ময়ূরপঙ্খীতে।' কাশ্যপও এবার অনুমান করল রাজা শ্যেনের এই পত্রের মধ্যে কোনও একটা দুরভিসন্ধি আছে। কুক্কুট কোনওভাবে হয়তো শ্বেততারার ওপর তার আঘাতের বদলা নিতে চায়। কুক্কুটের মুখমণ্ডলে যেন তেমনই কিছুর একটা আভাস ছিল। শ্বেততারা এরপর কাশ্যপকে বলল, 'ঠিক আছে তুমি এখন যাও। পালকি বেহারাদের জানিয়ে দাও আমি আজ আর ভাগীরথীতে যাব না।'

শ্বেততারার কক্ষ থেকে নিজের কক্ষে ফিরে এল কাশ্যপ। সে ভাবতে লাগল প্রভু শ্যেনের সত্যি কি এই জুয়ার আড্ডার দখল নেবার উদ্দেশ্য আছে?

শ্বেততারা আর কাশ্যপ, দুজনেরই অনুমান সত্যি ছিল। শ্বেততারা কুক্কুটের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রদীপ দণ্ডের আঘাতে তাকে বিতাড়ণের কিছু দিনের মধ্যেই কুক্কুট এক

boierpathshala.blogspot.com

পরিচিত জুয়াড়ির মারফত গিয়ে হাজির হয়েছিল প্রভু শ্যেনের কাছে। রাজা শ্যেনের নিজস্ব এক বাহিনী আছে। যাদের কাজ হল দস্যুবৃত্তি, গুপ্তহত্যা, লুণ্ঠন এসব করা। লুণ্ঠনের বৃহদংশ তারা জমা দেয় রাজকোষে। প্রভু শ্যেনের মনোরঞ্জনের জন্য তারা নারী হরণও করে। নারী হরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, শুদ্র, কোনও ভেদাভেদ থাকে না। শুধু সুন্দরী নারী হলেই হল। পুরুষের কাছে নারী শরীর শুধুমাত্র সম্ভোগের আধার। নারী শরীরের কোনও জাত হয় না।

প্রভু শ্যেনের সেই লুণ্ঠন বাহিনীতেই প্রথমে গিয়ে যোগ দিয়েছিল কুক্কুট। সে খেয়াল করে দেখেছিল অর্থ অপেক্ষা সুন্দরী সদ্য-যৌবনে পদার্পণ করা নারী পেলেই বেশি আনন্দ লাভ করেন প্রভু শ্যেন। আর ব্যাপারটা খেয়াল করে কয়েক বছর ধরে কুমারী, যুবতী-সুন্দরী নারীদের হরণ করে কুক্কুট তাদের তুলে দিয়েছে প্রভু শ্যেনের কাছে। আর এছাড়া লুণ্ঠিত অর্থ তো আছেই। প্রভু শ্যেনের বড় বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে কুক্কুট। আর সেই সঙ্গে কুক্কুট তীব্র ঘৃণা পুষে রেখেছিল শ্বেততারার প্রতি। শ্বেততারার প্রতি তার ঘৃণা ক্রমশ বেড়েই চলছিল।

বণিক রৈবতকের ময়ূরপঙ্খীতে হানা দিয়ে প্রায় কিছুই পায়নি কুক্কুট। চর মারফত সে জানতে পারল ময়ূরপঙ্খীর অধিকারী বণিক রৈবতক শ্বেততারার জুয়ার আড্ডাতে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। ময়ূরপঙ্খীতে যখন বাণিজ্যলব্ধ কোনও ধনসম্পদ পাওয়া যায়নি তখন নিশ্চয়ই বণিক তার সম্পদ স্বর্ণমুদ্রা বা দুর্মূল্য রত্নরাজি নিয়ে শ্বেততারার প্রাসাদের ঠাঁই নিয়েছে। এ ব্যাপারটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি কুক্কুটের। সে যখন সঙ্গীদের নিয়ে ময়ূরপঙ্খীতে হানা দিয়েছিল তখন একজন নাবিক আতঙ্কে বলে ফেলেছিল যে চম্বা নগরীদের সঙ্গে বাণিজ্য করে মৃগনাভির বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে দুর্মূল্য কিছু রত্ন সংগ্রহ করেছে বণিক।

মুখের গ্রাস শ্বেততারার প্রসাদে চলে যাওয়াতে শ্বেততারার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কুক্কুট। তাছাড়া শ্বেততারার প্রতি তার পুরোনো অপমানের জ্বালা তো আছেই। সে তার প্রভুর কাছে গিয়ে বুঝিয়েছিল যে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে শ্বেততারার প্রাসাদে অবস্থান করছে নাবিক। আর শ্বেততারার জুয়ার আড্ডারও এবার দখল নেওয়া প্রয়োজন। বহু সম্পদ লুকানো আছে শ্বেততারার কাছে। রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা, হিরা, জহরত দীর্ঘ দিন ধরে উপার্জন করে এসেছে শ্বেততারা। কুক্কুট যেহেতু শ্বেততারার কড়ি রক্ষক ছিল তাই সে এ ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত। জুয়াড়িদের থেকে প্রাপ্ত বহু সম্পদ সে নিজেই তুলে দিয়েছে শ্বেততারার হাতে। প্রভুকে শ্বেততারা যে উপঢৌকন পাঠায় তা শ্বেততারার উপার্জনের কণা মাত্র। শ্বেততারা কোনওদিন সে সম্পদ নিয়ে কর্ণসুবর্ণ পরিত্যাগ করার আগেই তার প্রাসাদের দখল নিতে হবে।

প্রাথমিক অবস্থাতে রাজা শ্যেন মৃদু ইতস্তত করছিলেন কুক্কুটের প্রস্তাবে। শ্বেততারা নিয়মিত ভাবে অর্থ দেয় প্রভু শ্যেনকে। কিন্তু শ্যেন যখন এরপর কুক্কুটের কাছে শুনল যে শ্বেততারার জুয়ার আড্ডার দখল নেবার পর সেটা কুক্কুটই পরিচালনা করতে সমর্থ এবং তার জন্য সে শ্বেততারার তিনগুণ অর্থ প্রদান করবে প্রভুকে তখন শ্যেন রাজি হয়ে গেল ধূর্ত কুক্কুটের প্রস্তাবে। রাজা শ্যেন পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব দিলেন কুক্কুটের ওপরই। কিন্তু তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে 'দেখতে হবে শ্বেততারার প্রাসাদ দখল করলে তাদেরও প্রাসাদ দখল হতে পারে এই আশঙ্কাতে অন্য জুয়ার আড্ডার অধিকারীরা রাজ্য ছেড়ে না পালায়।'

boierpathshala.blogspot.com

কুক্কুট বলল, 'তা হবে না। আমি আপনার প্রতিনিধি হয়ে সেখানে জুয়া খেলতে যাব। আমি শুধু শ্বেততারার কড়ি রক্ষকই ছিলাম না, কড়ির জুয়াতে আমারও হাত বেশ পাকা। বাজির শর্তটা শুধু আপনি ঠিক করে দেবেন শ্বেততারাকে। তাতে বলা থাকবে শ্বেততারা পরাজিত হলে সে প্রাসাদ ছেড়ে দেবে।'

কথাটা শুনে প্রভু শ্যেন বললেন 'কিন্তু আমি তো শুনেছি শ্বেততারা কোনও দিন কড়ির জুয়াতে হারে না?'

কুক্কুট বলল 'সে জন্যই তো আমি খেলতে যেতে চাইছি। শ্বেততারা আমার সঙ্গে খেলতে চাইবে না বলেই মনে হয়। শ্বেততারা তার নিজের কড়ি ওন্য কাউকে দেয় না। সে যদি আমার সঙ্গে খেলতে না চেয়ে অন্য কাউকে খেলতে বসায় তবে তাকে আমি পরাজিত করতে পারব বলেই আমার ধারণা। আর, শ্বেততারা বা তার প্রতিনিধি যেই খেলতে বসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত যদি আমি পরাজিত হই তখন বলপূর্বক প্রাসাদের দখল নেব। অন্য জুয়ার আড্ডার অধিকারীদের কাছে জানানো হবে শ্বেততারা জুয়ার বাজিতে পরাজিত হয়ে প্রাসাদ ছাড়তে না চাওয়ার কারণে বলপূর্বক প্রাসাদের দখল নেওয়া হয়েছে।'—এ কথাগুলো বলে মার্তণ্ড বললেন, 'কুক্কুটের কড়ির জুয়া খেলতে আসার পিছনে যা বললাম তা একটা অনুমান মাত্র। নইলে প্রভু শ্যেন তো সৈন্য পাঠিয়েই প্রাসাদের দখল নিতে পারতেন।'

মানববাবু বললেন, 'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, ফাঁদে পড়া মূষিককে মারার আগে মার্জার যেমন তাকে অনেক খেলিয়ে খেলিয়ে মারে তেমনই শ্বেততারাকে প্রাসাদ থেকে উৎখাত করার আগে তাকে একটু খেলিয়ে নিতে চেয়েছিল কুক্কুট, তার অপমানের বদলা নেবার জন্য?'

মানববাবুর কথা শুনে ব্রাহ্মণ মার্তণ্ড তার মুখের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন 'বাঃ। এ কথাটা তো আগে কোনওদিন আমার মাথায় আসেনি! আপনার মাথায় এল কীভাবে?'

মানববাবু বললেন, 'আপনার কাহিনি শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছে যে আমিই যেন সেই সময়তে পৌঁছে গেছি! এ কাহিনি যেন আমারও চেনা!'

কথাটা মিথ্যা বললে না মানববাবু। কেন জানি তার মনে হচ্ছে এ কাহিনি তার জানা। অবশ্য অনেক সময় অচেনা কাহিনিও চেনা লাগে মানুষের।

ব্রাহ্মণ মার্তণ্ড কড়ির ছকের দিকে তাকিয়ে রইলেন নিশ্চুপভাবে। তারপর একটা চালে মানববাবুর একটা কড়ি খেলেন। মানববাবুও পাল্টা চালে মার্তণ্ডর একটা কড়ি গিললেন। দীর্ঘক্ষণ খেলা চলছে। উভয়ই বিপক্ষের অনেকগুলো করে কড়ি খেয়েছেন। মাত্র চারটে কড়ি আছে ছকে। মাঝে-মাঝেই আলো কমে যাচ্ছে। খণ্ড খণ্ড মেঘ চাঁদের গায়ের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়ে জমা হচ্ছে আকাশের এক কোণে। সেদিকে তাকিয়ে মানববাবু বললেন 'বৃষ্টি আসবে নাকি?' কথাটা শুনে মার্তণ্ড বললেন, 'হতে পারে। খেলাও শেষ হতে চলল। আমার গল্পটা শেষ করি—

৯

শ্বেততারা তো সেদিন আর স্নানে গেল না। কাশ্যপও ফিরে এসেছিল তার কক্ষে। গত ক'দিনের মতোই বিকাল হতেই মেঘে ঢাকতে শুরু করল আকাশ। তারপর সন্ধ্যার

boierpathshala.blogspot.com

আগেই বৃষ্টি শুরু হল। বরুণদেব যেন ঠিকই করে ফেলেছেন বণিক রৈবতকের ময়ূরপঙ্খীকে ভাসিয়ে তুলবেনই। এমন বর্ষণ কোনওদিন দেখেনি কেউ। আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে! আর তার সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা। প্রদীপ জ্বালানো যাচ্ছে না। অন্ধকারে নিমজ্জিত শ্বেততারার জুয়ার আড্ডাতে সেদিনও একজনও জুয়াড়ি এল না। শ্বেততারাও নিজের কক্ষ ত্যাগ করল না।

রাতে বিছানাতে শুয়ে আগের দিনের মতোই কাশ্যপের মনে পড়তে লাগল শ্বেততারার উন্মুক্ত উরু, নদী তীরে সিক্ত বস্ত্রের আড়াল থেকে প্রস্ফুটিত স্তনবৃন্তের কথা। বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল শ্বেততারার প্রাসাদে কাটিয়েছে কাশ্যপ, কিন্তু এতদিন শ্বেততারার শরীরের প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেনি কাশ্যপ। শ্বেততারার শরীর পাবার জন্য যেন পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। যাইহোক সারা রাত কখনও জেগে কখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে শ্বেততারার শরীরের কথা ভেবে কাটিয়ে দিল কাশ্যপ। ভোরের আলো ফুটল এক সময়। তবে কাশ্যপ তার কক্ষ ত্যাগ করল আরও বেশ কিছু সময় পর। আগের দিনের মতোই বাটিকার বাইরে গিয়ে সে দাঁড়াল সূর্যের উত্তাপ গ্রহণের জন্য। কুক্কুটের জুয়া খেলতে আসার অভিসন্ধির ব্যাপারে ভাবতে শুরু করল কাশ্যপ। তার ওপরও নিশ্চয়ই কুক্কুটের ক্রোধ আছে। শ্বেততারা কুক্কুটকে বিতাড়িত করে কাশ্যপকেই স্থলাভিষিক্ত করেছিল তার জায়গাতে। কাশ্যপের ওপরও কোনও দুর্যোগ নেমে আসবে না তো? কর্ণসুবর্ণতে পদার্পণ করার পর শ্বেততারার এ প্রাসাদেরই অঙ্গ হয়ে গেছে কাশ্যপ। শ্বেততারার ওপর যদি সত্যি কোনও দুর্যোগ নামে তবে কাশ্যপের ওপর সেই দুযোÅগ নেমে আসবে।

নানা কথা ভাবছিল কাশ্যপ। আগের দিনের মতোই হঠাৎ সে দেখতে পেল নদীর দিক থেকে রৈবতক আসছে। তার চোখ মুখ বেশ উজ্জ্বল। দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করার আগে একটু দাঁড়িয়ে সে কাশ্যপকে বলল, 'যাক, ব্রাহ্মণের বলা কথা শেষ পর্যন্ত ফলেছে। ময়ূরপঙ্খী ভেসে উঠেছে। কোনও চিন্তা নেই। পাল তুলে নোঙর ওঠালেই তরতর করে নাও ভেসে যাবে।'

কাশ্যপ তার কথা শুনে বলল, 'আপনার যাত্রা যেন শুভ হয়।'

বেশ কিছুক্ষণ দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রৌদ্রকিরণ গায়ে মেখে কক্ষে ফিরে এল কাশ্যপ।

কাশ্যপের এদিন আর শ্বেততারার কাছে দৈনন্দিন হিসাব বোঝাবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দ্বিপ্রহরে একজন খবর দিল শ্বেততারা তাকে ডাকছে। কাশ্যপ মৃদু বিস্মিত হয়ে শ্বেততারার কক্ষের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে দেখল দুয়ারের সামনেই শ্বেততারা দাঁড়িয়ে আছে। আজও সে নদীতে যায়নি। কাশ্যপকে তার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়ে ভিতর থেকে খিল তুলে দিল শ্বেততারা। মুখোমুখি বসল শ্বেততারা ও কাশ্যপ।

শ্বেততারা কিছু সময় কাশ্যপের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'শোন কাশ্যপ, কুক্কুটের মনে যে একটা দুরভিসন্ধি আছে সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার ওপর তার প্রচণ্ড ক্রোধ আছে। এক সঙ্গে খেলতে বসলে বিপত্তি ঘটতে পারে। আবার রাজা শ্যেনের নির্দেশ অমান্য করলে ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে আসতে পারে।'—এই বলে থামল শ্বেততারা।

কাশ্যপ বলল, 'তবে কী করবে তুমি?'

একটু চুপ করে থেকে কাশ্যপের কথার জবাবে শ্বেততারা বলল, 'আমি চাই আমার হয়ে কুক্কুটের সঙ্গে তুমি কড়ির জুয়া খেলতে বসবে।'

boierpathshala.blogspot.com

‘আমি খেলব?’ বিস্মিত ভাবে বলে উঠল কাশ্যপ।

শ্বেততারা শান্ত ভাবে বলল, ‘হ্যাঁ, তুমি। ইতিমধ্যে এ কয় বছরে কড়ির জুয়াতে বেশ পটু হয়ে উঠেছ তুমি। তাছাড়া আমার কড়ি আমি দিয়ে যাব তোমাকে। আমার খেলার কক্ষে বসে আমার কড়ি দিয়ে কুক্কুটের সঙ্গে খেলবে তুমি। এ কড়ি কোনও দিন হারে না। শুধু তুমি যখন খেলবে তখন কালো কড়ি নিয়ে খেলবে। বিপক্ষকে সাদা কড়ি দেবে।’ কাশ্যপ তার কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে বলল, ‘তোমার কড়ি আমাকে দেবে! কড়ি দিয়ে তুমি কোথায় যাবে?’

শ্বেততারা বলল, ‘আমি প্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় নেব বণিক রৈবতকের ময়ূরপঙ্খীতে। এ প্রাসাদ থেকে নদী তীর পর্যন্ত একটা ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ আছে। খেলা শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে সুড়ঙ্গ পথে আমি নদী তীরে পৌঁছে নাও-এ গিয়ে উঠব। খেলা শেষে যদি তুমি জয়ী হও তখন পরিস্থিতি বুঝে ওই সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আর যদি কোনও কারণে পরাজিত হও তবে কুক্কুটের হাতে প্রাসাদ তুলে দিয়ে ও পথেই আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমার সঙ্গে বণিকের পরামর্শ হয়েছে। সে আমাদের কর্ণসুবর্ণর সীমানার বাইরে কোনও নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দেবে।’

কাশ্যপ বলল, ‘কিন্তু এমনও তো হতে পরে যে জুয়াতে আমার হার বা জিত যাই হোক না কেন কুক্কুট আমাকে বন্দি করল বা হত্যা করল?’

শ্বেততারা বলল, ‘আমার ধারণা প্রাসাদ হস্তগত করার পরই কুক্কুট প্রথমেই খুঁজে দেখার চেষ্টা করবে কোথায় কী ধন সম্পদ আছে। সে লোভী। কুক্কুট চেষ্টা করবে তার একটা অংশ প্রভু শ্যেনের হাতে তুলে না দিয়ে আলাদা করে সরিয়ে ফেলার। তবে সেসব সে পাবে না। তার আগেই আমি সেসব সরিয়ে ফেলব বণিকের ময়ূরপঙ্খীতে। তবে তোমার আশঙ্কাও আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। সেটুকু ঝুঁকি অবশ্য তোমাকে নিতে হবে। কিন্তু মনে রেখো যদি তুমি কুক্কুটের সঙ্গে জুয়া খেলাতে অংশ নাও, ফলাফল যাই হোক না কেন, আমার কাছে ফিরে গেলে তুমি যা পুরস্কার পাবে তা এই কর্ণসুবর্ণর বহু ধনাঢ্য মানুষ কামনা করেই পায়নি। স্বয়ং রাজা শ্যেনও পাবেন না।’

‘কী পুরস্কার?’ জানতে চাইল কাশ্যপ।

একটু চুপ করে থেকে কাশ্যপকে চমকে দিয়ে শ্বেততারা বলল, ‘আমার এই শরীর।’

কাশ্যপ যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বলে উঠল, ‘আবার বলো, কী বললে তুমি?’

শ্বেততারা বলল, ‘তুমি ঠিকই শুনেছ। আমি জানি তুমি প্রবল ভাবে কামনা করো আমাকে। তোমার চোখের দৃষ্টি বলে দেয় সে কথা। আমার অনুরোধ রক্ষা করলে এ শরীর তুমি পাবে। এমন হতে পারে যে কুক্কুট পরাজিত হবার পর রাজা শ্যেন এ পরাজয় মেনে নিলেন, আমরা আবার এ প্রাসাদে ফিরে এলাম, জুয়ার আড্ডা আবার চালু হল তবে সে ক্ষেত্রে এ প্রাসাদ ও আয়ের অর্ধাংশও তোমার হবে। ভেবে দেখো কাশ্যপ, তোমার মতো একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে এত সব পাওয়া কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। এত কিছু পাওয়ার জন্য একটা ঝুঁকি তুমি নিতে পারবে না কাশ্যপ? একদিন তো তুমি এর থেকে বড় ঝুঁকি নিয়ে ভাগীরথীর ঘূর্ণী থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিলে।’

শ্বেততারার প্রাসাদের অংশীদার হওয়াটা কাশ্যপের কাছে বড় ব্যাপার ছিল না। অর্থ-সম্পদের ওপর বড় একটা লোভ কাশ্যপের কোনও দিনই তেমন ছিল না। কিন্তু শ্বেততারার শরীর? যে শরীরকে দিন রাত কামনা করে চলেছে কাশ্যপ। যে শরীর বসে

boierpathshala.blogspot.com

আছে তার সামনে। একটা ঝুঁকি নিলেই কাশ্যপ স্পর্শ করতে পারবে সে শরীরকে। শেষ পর্যন্ত আর শ্বেততারার এ আহ্বান অস্বীকার করতে পারল না কাশ্যপ। তার উদগ্র কামনা তাকে দিয়ে বলিয়ে নিল, 'হ্যাঁ, আমি কুক্কুটের সঙ্গে জুয়া খেলতে বসব।'

কথাটা শুনে হাসি ফুটে উঠল শ্বেততারার মুখে। সে বলল, 'আমি জানতাম তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হবে। কথা রাখব আমি। এখন আমাদের বেশ কিছু জরুরি কাজ করতে হবে। তার জন্য প্রাসাদ থেকে আজই সবাইকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টি হোক বা না হোক আজ আর কাল জুয়ার আড্ডা বসবে না। তোমাকে আমি প্রথমে সুড়ঙ্গটা দেখাই।'

এ কথা বলার পর দরজার খিল খুলে শ্বেততারা, কাশ্যপকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল ঠিক এই স্থানে অর্থাৎ শ্বেততারা যে কক্ষে বসে জুয়া খেলত। সেই বিরাট কক্ষের ঠিক মাঝখানে মেঝেতে খোদাই করা শ্বেততারার এই জুয়ার ছক। শ্বেততারা কাশ্যপকে দেখাল সুড়ঙ্গতে প্রবেশ করার গোপন পথ। এ দেখে বেশ অবাক হল কাশ্যপ। বহুবার শ্বেততারার জুয়া খেলার এ কক্ষে প্রবেশ করেছে কাশ্যপ। কিন্তু সে কোনওদিন ভাবতেই পারেনি এ কক্ষে এ ভাবে একটা সুড়ঙ্গ থাকতে পারে! সেই গুপ্ত পথটা দেখাবার পর শ্বেততারা বলল, 'খেলাতে যদি কুক্কুট জয় লাভ করে তবে সে নিশ্চয়ই প্রথমে আমার শয়নকক্ষের দিকে ছুটবে আমার সিন্দুক লুঠ করার জন্য। সেই সুযোগটাই পালাবার জন্য কাজে লাগাবে তুমি। খেলার পরিণাম যাই হোক না কেন তুমি কুক্কুটকে এ কক্ষ ছেড়ে যাবার জন্য বাধ্য করবে। আর কুক্কুট যদি এ কক্ষে তোমাকে বন্ধ করে রেখে আমার শয়ন কক্ষ বা প্রাসাদের অন্যত্র ধনরত্নের সন্ধানে যায় তবে পালানোর ব্যাপারটা আরও সহজ হবে তোমার পক্ষে।'

সুড়ঙ্গ পথটা দেখে আর শ্বেততারার কথা শুনে কাশ্যপের মনে হল, পালানোর ব্যাপারটা যতটা কঠিন বলে মনে হচ্ছিল হয়তো তা নয়। মনের শঙ্কা অনেকটাই দূর হয়ে গেল কাশ্যপের।

১০

কাশ্যপকে সুড়ঙ্গ দেখাবার পর সে কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে অন্য কাজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল শ্বেততারা। প্রথমে সে তার প্রাসাদের সবাইকে এক জায়গায় ডেকে তাদের পাওনা মিটিয়ে জানিয়ে দিল, বিশেষ কারণবশত তাদের সূর্যাস্তের পূর্বেই প্রাসাদ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হবে। তিনদিন পর তারা যেন আবার প্রাসাদে আসে। আপাতত জুয়ার আড্ডা বন্ধ থাকবে। ব্যাপারটা শুনে তার বিস্মিত হলেও শ্বেততারাকে তার কারণ জিগ্যেস করার সাহস পেল না। অনেকে আবার আনন্দিতও হল। কারণ, ছুটি বিশেষ মেলে না তাদের। শুধু একজন লোককে দেউড়ির বাইরে মোতায়েন করা হল জুয়াড়িদের সেই সংবাদ জানানোর জন্য।

বিকালের মধ্যেই শ্বেততারার প্রাসাদ ফাঁকা হয়ে গেল। নিজের হাতে সদর দরজা বন্ধ করল শ্বেততারা। এরপর প্রথম যে কাজটা শ্বেততারা করল তা হল কাশ্যপকে ডেকে তার হাতে সে তার কড়ির ভাণ্ড তুলে দিল। ভাণ্ডটা হাতে নিয়ে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করল কাশ্যপ। এই সেই কড়ি। লোকে বলে এ কড়ি নাকি মন্ত্রপুতঃ। এ কড়ি নিয়ে খেলতে বসলে কেউ কোনওদিন হারে না। শুধু নিজের দিকে রাখতে হয় কালো কড়ি। শ্বেততারার এই কড়ির ঘটই তো তার যাবতীয় সম্পদের আধার!—মার্তণ্ডর এ কথা শুনে মানববাবু

boierpathshala.blogspot.com

হেসে বললেন, 'ও এ জন্য আপনি আমাকে সাদা কড়ি দিয়ে নিজে কালো কড়ি খেলছেন বুঝি।'

মার্তণ্ড মৃদু হেসে বললেন, 'হয়তো তাই। জিততে কে না চায়? আমি দেখতে চাই হাজার বছর পরও শ্বেততারার কড়ির সে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে কিনা?'

মানববাবুর কথার জবাব দিয়ে মার্তণ্ড আবার ফিরে গেলেন তার কাহিনিতে—

কাশ্যপের কাছে কড়িভাণ্ড সমর্পণ করে শ্বেততারা শুরু করল তার আসল কাজ। বণিক রৈবতককেও ডেকে আনা হল। কাশ্যপ আর রৈবতককে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের নানান গুপ্ত স্থান থেকে নানা স্বর্ণালঙ্কার, হিরা জহরত দুর্মূল্য রত্ন উদ্ধার করে এক কক্ষে জমা করতে লাগল শ্বেততারা। তার এই সম্পদ দেখে কাশ্যপ এমনকী ধনাঢ্য রৈবতকও প্রচণ্ড বিস্মিত হয়ে গেল। এত সম্পদ রৈবতক নিজেও কোনওদিন চাক্ষুস করেনি। জুয়ার আড্ডা থেকে সংগৃহীত শ্বেততারার সারা জীবনের সম্পদ। অলঙ্কারগুলো এক জায়গাতে জড়ো করার প্রথমে তাদের গা থেকে দুর্মূল্য পাথরগুলো আলাদা করে একটা থলেতে রাখা হল। এরপর একটা বিশেষ পাত্র আনল শ্বেততারা। তার মধ্যে রয়েছে 'ভীষণ অম্ল'। যার স্পর্শে সোনা, রূপা, লোহা যে কোন ধাতু গলে যায়। কোনও মানুষের মাথায় যদি সেই 'ভীষণ অম্ল' এক ফোঁটা দেওয়া যায় তবে তা তার দেহ ফুঁড়ে মাটিতে পৌঁছে যাবে, এমনই তার তেজ। সোনা গলাবার পদ্ধতি জানা ছিল শ্বেততারার। বাইরে ততক্ষণে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গী দুজনকে নিয়ে সোনা গলাতে বসল শ্বেততারা। কাজ শেষ হতে হতে মধ্যরাত হয়ে গেল। বেশ কয়েকটা স্বর্ণ গোলক তৈরি হল। সেগুলোকেও আবার অন্য একটা থলের মধ্যে রাখা হল। পরদিন ভোরে সেগুলো রেখে আসা হবে ময়ূরপঙ্খীতে।

কাজ মেটার পর যে যার শয়নকক্ষে ফিরে গেল তারা। কাশ্যপ শয়ন করল ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। উত্তেজনা চেপে ধরতে লাগল তাকে। পরদিন কুক্কুটের সঙ্গে কড়ির জুয়াতে কী হবে? শেষ পর্যন্ত শ্বেততারার শরীর পাবে তো? বিছানাতে শুয়ে উত্তেজনাতে ছটফট করতে লাগল কাশ্যপ। এক সময় তার মনে হল বাইরে গিয়ে একটু পায়চারী করে এলে হয়তো বা তার উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হবে। এই ভেবে শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এল কাশ্যপ।

নিঝুম রাত্রি, নিস্তব্ধ প্রাসাদ। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বণিক রৈবতকের অতিথিশালার কাছাকাছি নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেল কাশ্যপ। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা ছায়ামূর্তি আসছে শ্বেততারার শয়নকক্ষের দিক থেকেই। হ্যাঁ, সে শ্বেততারাই! শ্বেততারা কোথায় যাচ্ছে? কাশ্যপ একটা থামের আড়ালে এসে দাঁড়াল। শ্বেততারা কাশ্যপকে অন্ধকারে খেয়াল করল না। সে এসে সোজা প্রবেশ করল রৈবতকের কক্ষে। অস্পষ্ট একটা শব্দ হল। আর সে শব্দ শুনে কাশ্যপ বুঝতে পারল কক্ষে প্রবেশ করে দোর বন্ধ করে দিল শ্বেততারা।

কিন্তু এত রাতে শ্বেততারা বণিকের কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার বন্ধ করল কেন? তবে কি শ্বেততারা বণিকের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হতে এসেছে? নাকি কোন গোপন শলা করতে এসেছে? প্রাসাদে তো এই মুহূর্তে তারা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ নেই। দ্বার বন্ধ করার অর্থ কি তবে কাশ্যপের থেকে নিজেদের গোপন করা? ব্যাপারটা দেখে প্রচণ্ড কৌতূহল জেগে উঠল কাশ্যপের মনে। মার্জারের মতো নিঃশব্দে লঘু পায়ে গিয়ে উপস্থিত হল সেই কক্ষের সামনে। তারপর কান পাতল বন্ধ দরজার কপাটে। সে শুনতে পেল শ্বেততারা আর বণিকের কথোপকথন—

boierpathshala.blogspot.com

বণিক রৈবতক বলছে, 'তোমার ওই অমূল্য কড়িগুলো তুমি কেন কাশ্যপের হাতে তুলে দিলে? ধরো যদি কুক্কুট ওই কড়ি কেড়ে নেয় কাশ্যপের থেকে? ওই কড়ির ক্ষমতা নিশ্চয়ই কুক্কুট জানে। যদি সে চিনে ফেলে কড়িগুলো?'

রৈবতকের কথা শুনে শ্বেততারা যেন মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'প্রাণ থাকতে এ কড়ি আমি কাউকে কোনওদিন দেব না, দিতে পারব না। ওই কড়িগুলো দিয়েই তো আমি সামান্য পর্ণ কুটির থেকে এত বড় প্রাসাদ বানিয়েছি। এত সম্পদ সঞ্চয় করেছি যে তা নিয়ে এমন আরও একশত প্রাসাদ তৈরি করা যায়। কাশ্যপকে যে কড়ি আমি দিয়েছি তা আসল কড়ি নয়। হুবহু একইরকম দেখতে অন্য কড়ি। তবে কুক্কুটের কড়ি চেনার কথা নয়। ও কড়ি কোনওদিন তাকে দেখাইনি।'

বণিক বলল, 'তবে আসল কড়িগুলো কোথায়?'

শ্বেততারা বলল, 'যথাস্থানেই আছে। আমার শয়নকক্ষে বৃষমূর্তির পটের আড়ালে কুলুঙ্গিতে। সে মূর্তিকে আমি নিত্য পূজা করি। কাল প্রাসাদ ত্যাগ করার সময় কুলুঙ্গি থেকে কড়ির ক্ষুদ্র থলেটা আমি বুকে করে নিয়ে যাব। কাশ্যপ আর কুক্কুটের খেলাতে কাশ্যপ যদি জয়লাভ করে, যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তবে আবার এ প্রাসাদে ফিরে এসে আড্ডা চালু করব। আর পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় তবে তোমার সঙ্গে ভেসে গিয়ে ওই কড়িগুলো দিয়ে নতুন ভাবে আবার জুয়ার আড্ডা খুলব। আমার ওই কড়ির দৌলতে ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।'

এরপর আরও বেশ কিছু আলোচনা হল তাদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত রৈবতক এক সময় বলল, 'দেখা যাক কাল কী হয়। অযথা দুশ্চিন্তা করে বাকি রাতটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এসো আমরা রাতটা উপভোগ করি।'

শ্বেততারা আর বণিকের কথোপকথন শোনার পর হতভম্ব হয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কাশ্যপ। তারপর সে তার কর্তব্য ঠিক করে নিল। সারা রাত জেগেই কাটিয়ে দিল কাশ্যপ।

সূর্যদেব উদয় হলেন এক সময়। ভোর হল। শেষ রাতে বৃষ্টি থেমেছে। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরীর ভাগীরথীর সন্নিকটে শ্বেততারার প্রাসাদের গায়ে। দিনের আলো ফোটার কিছুক্ষণের মধ্যে তারা তিনজন নদীর উদ্দেশে রওনা হল শ্বেততারার সব সম্পদ নিয়ে। বণিক রৈবতক আর ফিরবে না, সে তার ময়ূরপঙ্খীতেই থেকে যাবে। তাই সেও তার সম্পদ সঙ্গে নিল।

নদী তীরে পৌঁছল তারা। ক'দিনের তুমুল বর্ষণে প্রাণ ফিরে পেয়েছে ভাগীরথী। ভরা যৌবনবতী হয়ে উঠেছে সে। চর মুছে গিয়ে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। স্রোতের তালে দুলছে ময়ূরপঙ্খী। পাল তোলারও হয়তো দরকার হবে না। নোঙর তুললেই বাঁধনহারা হয়ে ছুটে চলবে ময়ূরপঙ্খী। একজন লোক ছোট ডিঙি নিয়ে পাড়ে অপেক্ষা করছিল বণিক রৈবতকের জন্য। সেই ডিঙিতে চেপে তারা তিনজন গিয়ে উঠল বণিকের নাওতে। বেশ বড় ময়ূরপঙ্খী। রৈবতক তার সঙ্গীদের বলল, 'আজ রাতেই হয়তো যাত্রা শুরু করতে হবে, প্রস্তুতি শুরু করো।'

অধিকারীর নির্দেশমতো তার অনুচররা, কেউ পাল ঠিক করতে, দড়িদড়া গোটানোর কাজে নেমে পড়ল। নাবিক শ্বেততারাকে তার সম্পদ সহ নিয়ে চলল তার শয়নকক্ষের দিকে। সেখানে সিন্দুকের মধ্যে রাখা হবে স্বর্ণপিণ্ড, হিরা জহরত। তারা সেদিকে যাবার

boierpathshala.blogspot.com

আগে কাশ্যপ বলল, 'আমি কোনওদিন ময়ূরপঙ্খীতে উঠিনি। ময়ূরপঙ্খীটা একবার ঘুরে দেখব।'

বণিক রৈবতক হেসে বলল, 'হ্যাঁ, দেখো, আমার কোনও আপত্তি নেই,' হয়তো বা সে মনে মনে হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, দেখে নাও, আর তো সুযোগ হবে না দেখার।'

বণিকের সম্মতি পেয়ে হয়তো বা মনে মনে হেসেছিল কাশ্যপও। শ্বেততারাকে নিয়ে রৈবতক চলে গেল তার কক্ষের দিকে। আর কাশ্যপও ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। ওপরটা দেখা হয়ে যাবার পর ময়ূরপঙ্খীর খোলে নেমে এল কাশ্যপ। সেখানে আর কেউ নেই। ওপরে কাজে ব্যস্ত সবাই। বিশাল খোল। তার নিচের অংশটা অর্থাৎ জলের ওপর ভেসে থাকা অংশটা লৌহ চাদরে মোড়া। এই খোলেই পণ্য নিয়ে বাণিজ্যতে যায় ময়ূরপঙ্খী। এখনও বেশ কিছু পণ্য ঠাসা চটের বস্তা রাখা আছে লৌহপাতে মোড়া মেঝেতে। তারই একটা বস্তা একবার সরাল কাশ্যপ। কিছুক্ষণের মধ্যে কাশ্যপ বস্তাটা আবার ঠিক করে রেখে খোল ছেড়ে ওপরে উঠে এল। সূর্য যখন মাথার ওপর উঠল তখন শ্বেততারা নাবিকের কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ডিঙিটা এরপর শ্বেততারা আর কাশ্যপকে নিয়ে পৌঁছে দিল পাড়ে। প্রাসাদে ফিরে এল তারা দুজন।—এ কথা বলে থামলেন মার্তণ্ড।

গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। আকাশে মেঘ ডাকতে শুরু করেছে! চাঁদ যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানববাবু বললেন, 'ও মশাই এ যে বৃষ্টি নামবে দেখছি। উঠে পড়তে হবে যে।'

মার্তণ্ড বললেন, 'আর একটু দাঁড়ান। খেলা তো শেষের মুখে। আর আমার গল্পও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'—কথাগুলো বলে মার্তণ্ড একটা চাল দিলেন। মানববাবুও চাল দিলেন। দ্রুত দুজনেই বেশ কয়েকটা চাল দিয়ে পরস্পরের একটা করে কড়ি গিললেন। ছকের ওপর রইল শুধু মানববাবুর একটা সাদা কড়ি আর মার্তণ্ডর একটা কালো কড়ি। হ্যাঁ, খেলার ফয়সলা হতে বেশি দেরি নেই। জুয়ার ছকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ দুজনেরই। শেষ কড়িটা খাবার জন্য চাল দিতে শুরু করলেন দুজনেই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মার্তণ্ড শুরু করলেন তার কাহিনির অন্তিম অংশ—

১১

প্রাসাদে ফিরে কাশ্যপ আর শ্বেততারা দুজনেই তাদের নিজেদের কক্ষে ফিরে গেল বিশ্রাম নেবার জন্য। কেউ কাউকে বুঝতে দিল না তাদের মনের ভাবনা। সময় এগিয়ে চলল বিকালের দিকে। এদিনও বিকালে বৃষ্টি নামল। সূর্য ডোবার কিছু আগে নিজেদের কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে মিলিত হল শ্বেততারা আর কাশ্যপ। তারা কুক্কুটের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ঠিক যখন অন্ধকার নামল তখন প্রত্যাশা মতোই দেউড়ির বাইরে শব্দ শোনা গেল। তারপর কে যেন ঘা দিল সদর দরজাতে। একটা মশাল নিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল কাশ্যপ। তার পিছনে শ্বেততারা। তোরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে কুক্কুট। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। তাদের একজন তালপাতার ছত্র ধরে আছে কুক্কুটের মাথাতে। লোকগুলো সশস্ত্র। কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার ঝুলছে। সঙ্গীদের নিয়েই প্রাসাদে প্রবেশ করতে উদ্যাত হল কুক্কুট। কিন্তু শ্বেততারা বলল, 'প্রভু শ্যেনের পত্রে লেখা আছে শুধুমাত্র তুমি জুয়া খেলতে আসবে। তুমি নিশ্চই জানো যে জুয়াড়ি ছাড়া অন্য কাউকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না?'

শ্বেততারার কথা শুনে ধূর্ত কুক্কুটের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে। ইশারাতে তার সঙ্গীদের থেমে যেতে বলে একাই দেউড়ির

boierpathshala.blogspot.com

ভিতর প্রবেশ করল কুক্কুট। এ সময় তার হাতে ধরা চর্ম থলিটা বেজে ওঠাতে কাশ্যপ আর শ্বেততারা দুজনেই অনুমান করল বাজির সেই একশ রৌপ্য মুদ্রা সঙ্গে করেই এনেছে কুক্কুট। সে ভিতরে প্রবেশ করার পর ভিতর থেকে দেউড়ির খিল তুলে দিল কাশ্যপ। শ্বেততারা এরপর কুক্কুটকে বলল, 'শোন কুক্কুট, তোমার সঙ্গে আমি জুয়া খেলতে বসব না। তুমি যেমন প্রভু শ্যেনের প্রতিনিধি হিসাবে খেলতে এসেছ তেমনই আমার প্রতিনিধি হিসাবে খেলবে এই ব্রাহ্মণ কাশ্যপ।'

শ্বেততারার কথা শুনে কুক্কুট বিস্মিত হল ঠিকই, কিন্তু সে প্রতিবাদ করল না। কারণ সে মনে করল কাশ্যপের সঙ্গে খেললে তার জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কাশ্যপ তো শ্বেততারার কড়ি নিয়ে খেলবে না। গুণ নষ্ট হবার ভয়ে ও কড়ি কাউকে স্পর্শ করতে দেয় না শ্বেততারা। কাশ্যপের সঙ্গে খেলতে হবে শুনে মনে মনে খুশিই হল কুক্কুট। সে কাশ্যপের উদ্দেশে বলল, 'হ্যাঁ, চলো তবে খেলায় বসা যাক?'

শ্বেততারা কুক্কুটকে বলল, 'সামান্য সময় তুমি কাশ্যপের সঙ্গে এখানে অপেক্ষা করো, তারপর এসো। কক্ষের আলোগুলো আমি জ্বালিয়ে নিই। তারপর এসো।' কথাগুলো বলে শ্বেততারা চলে গেল প্রাসাদের দিকে।

কিছু সময়ের মধ্যেই কাশ্যপ কুক্কুটকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল সেই কক্ষে। শ্বেততারা তখন সেখানে নেই। আলো জ্বালিয়ে সে এই কক্ষ থেকেই সুড়ঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে। নীচে নেমে সুড়ঙ্গর মুখটা আবার বন্ধ করে দেওয়া যায়। ওপর থেকে দেখে কেউ বুঝতেই পারে না সুড়ঙ্গের অবস্থান। দেওয়ালের গায়ে গোঁজা বেশ কয়েকটা মশালের আলোতে আলোকিত কক্ষ। তার ঠিক মাঝখানে মেঝেতে খোদিত শ্বেততারার এই জুয়ার ছক। তার দু-পাশে দুটো রেশমের আসন পাতা। কড়ির ঘটটাও রাখা আছে সেখানে। কাশ্যপ আগেই সেটা সেখানে এনে রেখেছিল। আর দেরি না করে কাশ্যপ আর কুক্কুট ছকের দু-পাশে আসন গ্রহণ করল। হ্যাঁ, ঠিক এই ছকের দু-পাশে যেমন ভাবে রয়েছি আমরা..।

মুহূর্তের জন্য থামলেন মার্তণ্ড। মেঘ ডাকছে। মানববাবুর মনে হল তার ঘাড়ে এক বিন্দু জল পড়ল। বৃষ্টি শুরু হল বলে! ছকের দিকে তাকিয়ে মার্তণ্ড আবার শুরু করলেন—

খেলা শুরু হয়ে গেল কড়ি সাজিয়ে। সময় এগোতে লাগল। নির্জন প্রাসাদে এ কক্ষে বসে কড়ি খেলাতে নিমগ্ন হয়ে গেল কাশ্যপ আর কুক্কুট। খেলোয়াড় দুজনেই পাকা। খেলা প্রথমে স্বাভাবিক নিয়মে তার পক্ষতেই ছিল। হাসি ফুটে উঠছিল কুক্কুটের ধূর্ত ঠোঁটে। কিন্তু এর পরই খেলাটা যেন ঘুরতে শুরু করল। কালো কড়ি দিয়ে টপাটপ বেশ কয়েকটা কুক্কুটের সাদা কড়ি খেল কাশ্যপ। তার যেন কেমন মনে হতে লাগল সে নিজে চাল দিচ্ছে না। কালো কড়িগুলোই তাকে দিয়ে চাল দেওয়াচ্ছে! কুক্কুটের সাদা কড়িগুলো শেষ হয়ে যেতে লাগল। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যখন শেয়াল ডেকে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তে কুক্কুটের শেষ কড়িটা খেয়ে খেলা সাঙ্গ করল কাশ্যপ!

বিস্মিত কুক্কুট বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বর মতো চেয়ে রইল কাশ্যপের দিকে। কাশ্যপ ভেবেছিল এরপর এখনই হয়তো কুক্কুট ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করে বসবে তাকে। কিন্তু কুক্কুট সেই মুহূর্তে তেমন কিছু করল না। মুদ্রার থলিটা সে কাশ্যপের দিকে ছুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সদর দরজা খুলবে চলো। আমি এবার ফিরব।'

কাশ্যপ কুক্কুটকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে সদর দরজাতে উপস্থিত হল। দরজা খোলার পর কুক্কুট তার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কুক্কুট কি তবে পরাজয় স্বীকার করে নিল?

boierpathshala.blogspot.com

কুক্কুট চলে যাবার পর দোর বন্ধ করে কাশ্যপ দ্রুত ফিরে এল জুয়ার কক্ষে। কড়িগুলো ঘটে পুরে বাইরে বেরিয়ে প্রাসাদের দেওয়ালের গোপন একটা গহ্বরে সেগুলো রেখে আবার জুয়া খেলার কক্ষে ফিরে এল। সুড়ঙ্গের মুখ সরিয়ে সুড়ঙ্গ পথে একটা মশাল হাতে নেমে সে রওনা হল নদীর দিকে।

স্যাঁতস্যাঁতে সুড়ঙ্গ। ক'দিন ধরে প্রবল বর্ষণের ফলে ওপরের জল চুঁইয়ে নামছে ছাদ আর দেওয়ালের গায়ে। ভিজে মাটিতে শ্বেততারার পদচিহ্ন দেখতে পেল সে। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে কাশ্যপ এক সময় নদীতটে উঠে এল। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে বেশ হতাশ হল কাশ্যপ। বণিক রৈবতকের ময়ূরপঙ্খী সেখানে নেই। তার তো জলে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। তবে কি ব্যাপারটা কারো চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল? জায়গাটা মেরামত করে ময়ূরপঙ্খী নদীতে ভেসে পড়েছে?

ব্রাহ্মণ মার্তণ্ডর কথা এ পর্যন্ত শুনে মানববাবুর ছকের দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'কোন ব্যাপারটা ধরা পড়ার কথা বলছেন?'

মার্তণ্ড বললেন, 'আগের দিন রাতে শ্বেততারা আর বনিক রৈবতকের কথা শুনে কাশ্যপ অনুমান করেছিল যে তাকে ফেলে শ্বেততারা আর রৈবতক চলে যেতে পারে। তাই ময়ূরপঙ্খীতে কাশ্যপ একটা কারসাজি করেছিল। শ্বেততারা আর রৈবতকের সঙ্গে ময়ূরপঙ্খীতে যাবার সময় গোপনে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল ধাতু গলাবার সেই 'ভীষণ অম্ল'। তার কয়েক ফোঁটা সে ঢেলে দিয়ে এসেছিল খোলের মেঝেতে। সে ভেবেছিল খোলের ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করে ভারী হয়ে আটকে যাবে ময়ূরপঙ্খী। ময়ূরপঙ্খী হয়তো ডুববে না কিন্তু জলেও ভাসতে পারবে না।

ময়ূরপঙ্খীটা না দেখতে পেয়ে বেশ হতাশ হল কাশ্যপ। পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে নিল সে। প্রাসাদে ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি বিচার করে সে প্রাসাদেই রয়ে যাবে অথবা কড়ির ঘট আর মুদ্রার থলি নিয়ে ওই সুড়ঙ্গ পথেই প্রাসাদ ছেড়ে পালাবে। এ কথা ভেবে নিয়ে আবার সে সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করল। জল জমতে শুরু করেছে সুড়ঙ্গের মেঝেতে। সেই কর্দমাক্ত সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে কাশ্যপ আবার এসে উপস্থিত হল শ্বেততারার প্রাসাদে। সুড়ঙ্গের মুখ সরিয়ে জুয়া খেলার কক্ষে উঠে এল কাশ্যপ। কুক্কুটের মুদ্রার থলিটা সেখানেই ছিল। সেটা উঠিয়ে নিয়ে সে যখন বাইরে বেরিয়ে কড়ির ঘটটা আনতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় মড়মড় করে সদর দরজা ভেঙে পড়ার আর অনেক লোকের হিংস্র চিৎকার শুনতে পেল। কুক্কুট তার দলবল নিয়ে হাজির। ব্যাপারটা বোঝামাত্রই কাশ্যপ আবার সেই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। তার মুখটাও সে টেনে দিল। ওপর থেকে ভেসে আসা নানা শব্দ শুনে কাশ্যপ অনুমান করতে পারল কুক্কুটের বাহিনী তছনছ করছে শ্বেততারার প্রাসাদ। এক সময় কুক্কুট তেমন কিছু মূল্যবান জিনিস খুঁজে না পেয়ে শ্বেততারা বা কাশ্যপকে না পেয়ে ছাদের কড়িবরগাতে আগুন ধরিয়ে দিল। কাশ্যপ সুড়ঙ্গ পথে পালাতে উদ্যত হল, কিন্তু তার আর পালানো হল না। কড়িবরগাতে আগুন লাগাতে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল শ্বেততারার প্রাসাদ। আর সেই অভিঘাতে সুড়ঙ্গেরও একটা অংশ ধসে পড়ল। ওপর ও নীচে দুটো পথই বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে বেরোতে পারল না কাশ্যপ। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথাই সত্যি হল। যুগ যুগ ধরে এখানেই আটকে পড়ে রইল কাশ্যপ। তার আর মুক্তি ঘটল না। ধ্বংস স্তূপের আড়ালে চাপা পড়ে গেল কাশ্যপ আর এই কড়িগুলো।

—একথা বলেই একটা মোক্ষম চালে মানববাবুর শেষ কড়িটা খেয়ে নিয়ে মার্তণ্ড উৎফুল্ল ভাবে বলে উঠল, 'আছে! আছে! শ্বেততারার কড়ির গুণ হাজার বছর পরও নষ্ট হয়নি। তাই আমি জিতে গেলাম।'

boierpathshala.blogspot.com

মানববাবু বললেন, 'এ কড়িগুলো তো ঠিক সে অর্থে শ্বেততারার কড়ি নয়! শ্বেততারা তার কড়িগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।'

মার্তণ্ড কড়িগুলো ঘটে ভরতে ভরতে বললেন, 'না, এগুলোই শ্বেততারার আসল কড়ি। শ্বেততারা তার কড়ি নিয়ে যেতে পারেনি। কুক্কুটের সঙ্গে খেলার আগের দিন রাতে শ্বেততারা আর রৈবতকের কথা শোনার পর কাশ্যপ আর একটা কাণ্ড করেছিল গোপনে। শ্বেততারা তাকে যে কড়িগুলো দিয়েছিল সেগুলো নিয়ে শ্বেততারার কক্ষে প্রবেশ করে শ্বেততারার থলি থেকে আসল কড়িগুলো নিয়ে সেখানে শ্বেততারা দেওয়া কড়িগুলো রেখে এসেছিল। পরদিন কুক্কুটের সঙ্গে শ্বেততারার আসল কড়িগুলো নিয়ে খেলতে বসার কারণেই জয়লাভ করেছিল কাশ্যপ। শ্বেততারা ময়ূরপঙ্খীতে উঠেছিল নকল কড়ি নিয়ে।'

সত্যিই বৃষ্টি পড়তে শুরু করল এবার। তার সঙ্গে মেঘের গর্জন। কড়িগুলো ঘটে ভরে, আর সেই প্রাচীন মুদ্রাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মার্তণ্ড। উঠে দাঁড়ালেন মানববাবুও। ঘরের মতো আস্তানাটাতে গিয়ে ঢুকতে হবে। নইলে ভিজে যাবেন দুজনেই। মার্তণ্ডকে নিয়ে সেদিকে এগোতে এগোতে মানববাবু বললেন, 'বেশ লাগল আপনার কথা। শ্বেততারার শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল? সে কি বণিক রৈবতকের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল?'

মার্তণ্ড বলল, 'না, সে বা বণিক কেউ আর কোথাও ফিরতে পারেনি। সেই 'ভীষণ অম্ল' ছিদ্র করেছিল নাওয়ের তলদেশে। যে-কোনও কারণেই হোক তার ভিতর দিয়ে প্রথম অবস্থাতে তেমন জল প্রবেশ করেনি খোলে। কিন্তু ময়ূরপঙ্খী স্রোতে ভেসে পড়তেই হু-হু করে জল প্রবেশ করে খোলে। তারপর জলের চাপে খোল ফেটে যায়। প্রবল বর্ষণের মধ্যে কর্ণসুবর্ণর সীমানা অতিক্রম করার আগেই শ্বেততারা আর রৈবতককে নিয়ে সলিল সমাধি ঘটে ময়ূরপঙ্খীর।'

মানববাবু বললেন, 'বেশ লাগল আপনার কাহিনি। কিন্তু কোথা থেকে এ কাহিনি পাঠ করেছেন বলুন তো? উৎসটা জানতে পারলে ভবিষ্যতে আমার কাজের সুবিধা হতে পারে।'

প্রশ্নটা শুনে মার্তণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'পড়ব বা শুনব কেন? এ তো আমারই জীবন কাহিনি।'

এই অদ্ভুত কথা শুনে মানববাবুও অবাক হয়ে বললেন, 'এ কথার মানে?'

আধো অন্ধকারে মার্তণ্ডর ঠোঁটের কোণে যেন একটা হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ আমারই জীবন কথা। এ কাহিনির কিছুই মিথ্যা নয়। আমার পুরো নাম মার্তণ্ড কাশ্যপ। আমার গোত্র হল কাশ্যপ। সে যুগে ব্রাহ্মণদের কর্ণসুবর্ণতে গোত্র ধরে সম্বোধন করা হত। সে জন্যই আমিও আমার কথাতে "কাশ্যপ" শব্দটাই নাম হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম।'

কথাটা শুনে মানববাবু বললেন, 'কী যা তা বলছেন! আপনার তামাক কাঠিতে কোনও মাদক মেশানো ছিল নাকি? চলুন তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যাই। ভিজে যাচ্ছি।'

মার্তণ্ড এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। হঠাৎই পিছন ফিরে চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'সে আসছে! শ্বেততারা আবার হাজার বছর পর তার কড়ি ফেরত নিতে আসছে! আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

মানববাবু অজান্তেই বলে ফেললেন, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?'

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু ঠিক সেই সময় মার্তণ্ড আঙুল তুলে বলে উঠলেন, 'ওই তো ওই যে শ্বেততারা আসছে।'

মার্তণ্ড যে দিকে আঙুল তুলে দেখালেন সেদিকে তাকিয়ে মানববাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন। সত্যিই ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে প্রবল বর্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে এক ছায়ামূর্তি—নারীমূর্তি!

মানববাবু তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। সেই নারী মূর্তি এসে দাঁড়াল কড়ির ছকটা যেখানে আঁকা আছে, মানববাবু এতক্ষণ মার্তণ্ডর সঙ্গে যেখানে বসে খেলছিলেন ঠিক সেই স্থানে। মার্তণ্ড তাকে দেখে বলে উঠলেন, 'তুমি এসেছ শ্বেততারা! আমি কত জন্ম ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। আমি জানতাম কর্ণসুবর্ণর এই কড়ি তোমাকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনবে।'—এই বলে কড়ির ঘটটা নিয়ে মার্তণ্ড কাশ্যপ এগোতে লাগলেন তার দিকে। আর সেই নারী মূর্তি তার একটা হাত প্রসারিত করল সামনের দিকে, হয়তো বা কড়ির ঘটটা ফিরিয়ে নেবার জন্যই। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পরপর বিদ্যুৎচমকে আকাশ ফালা ফালা হয়ে বাজের প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে উঠলে লাগল চার দিক। উপর্যুপরি বিদ্যুৎচমকে মানববাবু স্পষ্ট দেখতে পেলেন সেই অতি সুন্দর যৌবনবতী নারীকে। মাথার চুল তার চুড়ো করে বাঁধা, গলায় সাতনরি হার, বাহুতে বাজুবন্ধ, পায়ে মল। বক্ষ থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো শুভ্র বস্ত্র। ঠিক যেন সুদূর অতীত থেকে আসা কোনও অপ্সরা। তার সিক্ত বক্ষের ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে সুডৌল স্তন, নাভিকুন্দ। কদলী কাণ্ডের মতো মসৃণ উরু বেয়ে নামছে বৃষ্টির বারি। যৌনতার প্রতিমূর্তি এক নারী!

মার্তণ্ড গিয়ে দাঁড়াল সেই সুন্দরীর সামনে। মুর্হুমুর্হু কান ফাটানো বাজের গর্জন চারপাশে! এই আলোকিত হয়ে উঠছে চারদিক, পরমুহূর্তেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসছে। তারই মাঝে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি দুটো। যেন এই মিলনের জন্যই তারা হাজার হাজার বছর ধরে প্রতীক্ষায় ছিল।

প্রবল বর্ষণ আর বিদ্যুৎচমকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে আলিঙ্গন করল মূর্তি দুটো। কয়েক মুহূর্ত সে ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল তারা। যেন প্রস্তরীভূত যুগল মূর্তি। জল নামছে তাদের শরীর বেয়ে। কিন্তু এরপরই হঠাৎ মার্তণ্ড যেন চিৎকার করে বললেন, 'ওই দ্যাখো মনে হয় কুক্কুট তার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের ধরতে আসছে। শ্বেততারা আমাদের পালাতে হবে!'

মানববাবু এবার খেয়াল করলেন ব্যাপারটা! অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে বিন্দু বিন্দু আলো সত্যিই যেন ধেয়ে আসছে শ্বেততারার প্রাসাদের দিকে! হতভম্ব হয়ে গেলেন মানববাবু! সত্যিই কি তবে বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে থাকার পর জেগে উঠেছে আঁধারে ঘেরা এই কর্ণসুবর্ণ। সত্যি কি ওই আলোকবিন্দুগুলো রাজা শ্যেনের বাহিনী? ধরতে আসছে মার্তণ্ড আর শ্বেততারাকে? ক্রমশ এগিয়ে আসছে আলোকবিন্দুগুলো! প্রবল এক আতঙ্ক যেন পেয়ে বসল মানববাবুকে।

আর এরপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আকাশ থেকে একটা নীল আলোক শিখা নেমে এল সেই যুগল মূর্তির ওপর। তাদেরকে আবৃত করে সেই আলোকস্তম্ভ পাক খেতে শুরু করল। সেই আলোক স্তম্ভর মধ্যে হারিয়ে গেলেন মার্তণ্ড আর শ্বেততারা। আর তার পরই সেই আলোক স্তম্ভ যেন তাদের দুজনকে নিয়ে হারিয়ে গেল মাটির গভীরে। বাজের প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল মানববাবুর পায়ের তলার মাটি, চারপাশে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ! কিন্তু আলোক বিন্দুগুলো তখনও এগিয়ে আসছে। অতীতের অন্ধকার থেকে উঠে আসা ওই হিংস্র বাহিনী কি মার্তণ্ড আর শ্বেততারাকে না পেয়ে ছেড়ে

boierpathshala.blogspot.com

দেবে মানববাবুকে? আতঙ্কিত মানববাবু প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে ছুটলেন দেওয়াল ঘেরা মাথায় ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া ঘরের মতো তার থাকার জায়গাটাতে। মানববাবু অবশেষে ঢুকে পড়লেন সেখানে। তেলের বাতিটা তখনও জ্বলছে। আলোটা যেন মৃদু ভরসা দিল মানববাবুকে। কিন্তু বাইরে থেকে অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে এল মানববাবুর কানে। এসে পড়েছে তারা!

১২

লোকগুলো এসে পড়ল মানববাবুর ঘরের সামনে। জনা পনেরো লোক। বাইকে একটু থমকে দাঁড়াবার পর দু-তিনজন প্রবেশ করল মানববাবুর ঘরে। মানববাবু ক্যাম্প খাটে বসে। তার মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করে একজন বলল, 'ভয় পাবেন না স্যার। আমরা একজনকে খুঁজতে এসেছি।'

মানববাবু কথাটা শুনে ভালো করে তাকালেন লোকগুলোর দিকে। না তারা কেউ সেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণর অন্ধকার জগতের বাসিন্দা নয়, স্থানীয় গ্রামবাসী। যে লোকটা কথা বলল তাকেও চিনতে পারলেন মানববাবু। লোকটাকে একবার তিনি এখানে মাটি খোঁড়ার কাজ দিয়েছিলেন। লোকগুলোর হাতে টর্চ আছে। তবে এই টর্চের আলোগুলোকেই এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু ধাতস্থ হয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'কাকে খুঁজতে এসেছ তোমরা?'

লোকটা জবাব দিল, 'মাঝবয়সি একজন লোক স্যার। মাথায় টিকি, গলাতে পৈতে আছে। আমাদের গ্রামের স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাই। নাম মধুসূদন বিদ্যাবিনোদ।'

কথাটা শুনে মানববাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এমন একজন এসেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তো তার নাম বললেন, 'মার্তণ্ড—মার্তণ্ড কাশ্যপ।'

মানববাবুর কথা শুনে একজন গ্রামবাসী বলল, 'এখানে এসেছিলেন! আমরা তবে ঠিকই অনুমান করেছিলাম। পণ্ডিতমশাইয়ের মাথাটা একদম গেছে। হ্যাঁ, এখন তিনি ওই নামেই নিজের পরিচয় দেন—মার্তণ্ড কাশ্যপ।'

মানববাবু জানতে চাইলেন, 'ভদ্রলোক কি অসুস্থ?'

লোকটা বলল, 'অসুস্থ মানে মাথার গন্ডগোল। ওনার সম্ভবত আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। বছর পাঁচেক আগে এসে কাজ নিয়েছিলেন গ্রামের স্কুলে। নিরীহ লোক। বিকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে মাঝে মাঝে চলে আসতেন এখানে। কিন্তু একদিন হঠাৎই কেন জানি মাথাটা বিগড়ে গেল তার। তিনি বলতে লাগলেন তার নাম নাকি মার্তণ্ড কাশ্যপ! তিনি নাকি হাজার বছর আগে কর্ণসুবর্ণতে এসেছিলেন, এখানে নাকি একটা প্রাসাদ ছিল যেখানে তিনি থাকতেন এসব নানা কথা। মাঝে-মাঝেই তিনি চলে আসতেন এখানে আর কিছুতেই বাড়ি ফিরতে চাইতেন না। ডাক্তার দেখিয়েও ওনার মাথা ঠিক হল না। পাগলামী বেশি বাড়লে ওকে আমরা ঘরে আটকে রাখি কোনও বিপদ হবে বলে। ক'দিন ধরেই ওর মাথাটা আবারও বড্ড বেশি খারাপ যাচ্ছে। আজ সকাল থেকেই পণ্ডিত মশাই চিৎকার করছিলেন, "কড়ি পাওয়া গেছে! কড়ি পাওয়া গেছে! আমাকে প্রাসাদে যেতে হবে" বলে। তাই তাকে ঘরে আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা নামার পর কীভাবে যেন বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দরজা খুলে। ওর কেউ নেই। নিরীহ ভদ্র মানুষ। গ্রামের সবাই পণ্ডিত মশাইকে ভালোবাসে। তাই এই বর্ষা মাথায় নিয়েও তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।'

boierpathshala.blogspot.com

মানববাবু লোকটার কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। একটানা কথাগুলো বলে লোকটা জানতে চাইল, 'পণ্ডিত মশাই এখন কোথায় জানেন?'

মানববাবুর একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'একটু আগে পর্যন্ত তিনি বাইরে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তারপর হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না।' মানববাবু বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি যা দেখেছেন তা লোকগুলোকে বলা ঠিক হবে কিনা। হয়তো যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন পুরোটাই তার কল্পনা। গ্রামের লোকদের কথাগুলো বললে তাকেও তারা পাগল ভাবতে পারে! হয়তো তাকে গল্প শুনিয়ে কড়ির ঘট নিয়ে কোথাও উধাও গেছেন খ্যাপাটে লোকটা।

মানববাবুর কথা শুনে একজন লোক তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'চল তবে খুঁজি তাকে। আশেপাশেই কোথাও তিনি আছেন মনে হয়।'

তার কথায় অপর একজন বলল, 'চল বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। তবে যা বৃষ্টি হচ্ছে আর বাজ পড়ছে তাতে ভোরের আলো না ফুটলে এই সাপখোপের আড্ডায় আর তাকে খোঁজা যাবে না। পণ্ডিত মশাইয়ের কোনও বিপদ না হলেই বাঁচি।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষাতে রইল লোকগুলো। মানববাবু চুপ করে বসে রইলেন। তার মাথার ভিতর কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তিনি যা দেখেছেন তা যদি চোখের ভুলও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে কড়ি খুঁজে পেয়েছেন তা মধুসূদন বিদ্যাবিনোদ জানলেন কীভাবে?

রাত কেটে গেল। পাখির ডাকে ভোরের আলো ফুটল এক সময়। আলো ফোটার বেশ কিছু সময় পর বাইরে বেরিয়ে এলেন মানববাবু। সকালের আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে কর্ণসুবর্ণর প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ওপর। লোকগুলো তার আনাচেকানাচে খোঁজা শুরু করেছে তাদের পণ্ডিতমশাইকে। মানববাবু ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ঠিক সেই জায়গাতে, যেখানে ছকটা আঁকা আছে। বৃষ্টিতে ধুয়ে সকালের সূর্যকিরণে ছকটা আরও বেশি স্পষ্ট। মানববাবু দেখলেন ছকটার গায়েই মাটির ওপর লম্বাটে একটা পোড়া দাগ। মেঝের ওপর বাজি পোড়ালে যেমন দাগ হয় তেমন একটা দাগ, আর মাটিও অনেকটা ফেটে গেছে। গত রাতে এখানে সত্যিই বাজ পড়েছিল। আকাশ থেকে নেমে আসা ওই নীল আলোক শিখা তবে মিথ্যা ছিল না!

আর এরপরই মানববাবু আরও একটা জিনিস খেয়াল করলেন—সম্ভবত বাজের প্রচণ্ড অভিঘাতেই মাটিতে আঁকা ছকটা চারদিকে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে যেন একটু ওপর দিকে উঠে এসেছে! ব্যাপারটা দেখেই মানববাবু কয়েকজন লোককে ডাকলেন। তিনি যা অনুমান করেছিলেন তা সত্যি। পোড়া মাটির তৈরি বেশ বড় একটা টালি বসানো ছিল মাটিতে। যার ঠিক মাঝখানে আঁকা আছে কড়ির জুয়ার ছকটা। ধরাধরি করে সেই টালিটা সরাতেই হাজার বছর পর সূর্যালোক প্রবেশ করল সেই প্রাচীন সুড়ঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন লোক নিয়ে মানববাবু প্রবেশ করলেন সেই সুড়ঙ্গে। দেখেই বোঝা যায় বেশ লম্বা সুড়ঙ্গ ছিল সেটা। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই মাটি ধসে বন্ধ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। ভাগীরথী নদী এখন এ জায়গা থেকে অনেকটা দূরে সরে গেলেও এই বন্ধ সুড়ঙ্গের মুখের দিকেই ভাগীরথীর অবস্থান। মানববাবুদের পায়ের নিচের কাদামাটি হাজার বছর পর আজ পাথরের রূপ নিয়েছে। মাথার ওপর থেকে বজ্রপাতের ফলে ফাটল বেয়ে আলো ঢুকছে ভিতরে।

boierpathshala.blogspot.com

মানববাবু দেখতে পেলেন কিছুটা তফাতে সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে আছে পণ্ডিতমশাইয়ের দেহ! তিনি এখানে ঢুকলেন কীভাবে? লোকজন সমেত মানববাবু গিয়ে দাঁড়ালেন সেই মরদেহের সামনে। না সে দেহে বাজ পড়ে পুড়ে যাবার কোনও চিহ্ন নেই। মানববাবুর দিকেই যেন চোখ খুলে তাকিয়ে আছেন মধুসূদন বিদ্যাবিনোদ নামের কোনও গ্রাম্য সংস্কৃত শিক্ষক অথবা কোনও এক জন্মের শ্বেততারার জুয়ার আড্ডার ব্রাহ্মণ মার্তণ্ড কাশ্যপ। ঠোঁটের কোণে তার যেন একটা আবছা হাসি লেগে আছে। পরিতৃপ্তি অথবা কৌতুকের হাসি। কড়ির ঘটটা সেখানে না থাকলেও দেহটার চারপাশে ছড়িয়ে আছে অনেক রৌপ্যমুদ্রা। কুক্কুটের দেওয়া সেই একশ রৌপ্যমুদ্রা? আর এরপর আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল মানববাবুর। ছাদের ফাটল বেয়ে একটা আলোকরেখা লম্বালম্বি ভাবে সুড়ঙ্গের মেঝেতে এসে পড়েছে। সেই আলোতে মানববাবু দেখতে পেলেন সেখানে মেঝের ওপর জেগে আছে ছোট আকৃতির প্রস্তরীভূত পায়ের ছাপ। সে ছাপগুলো এগিয়েছে সুড়ঙ্গ যেদিকে ধসে পড়েছে সেদিকে। শ্বেততারার পায়ের ছাপ? হাজার বছর পর তার কড়ির টানে ফিরে এসে কাশ্যপকে তৃপ্ত করে শ্বেততারা হয়তো আবার তার কড়ি নিয়ে এ পথেই ফিরে গেছে মাটির গভীরে সেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণতে।

boierpathshala.blogspot.com